নানক সিং

জুন, ১৯৪৯

ডিসট্রিব্যুটার
সায়েন্টিফিক বুক এজেন্সি
২২ রাজা উডমান্ট স্ট্রীট
কলকাতা

ডাইরেক্টর, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-৫, গ্রীণ পার্ক, নিউ দিল্লী-১৬ দ্বারা প্রকাশিত এবং জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড [মুদ্রণ বিভাগে অবিনাশ প্রেস] ১১৯ লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩ হইতে শ্রীসুরজিৎচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রস্তাবনা

বিশাল দেশ এই ভারত। সাংস্কৃতিক দৃষ্টিতে অভিন্ন হলেও একটি শক্তিশালী প্রগতিশীল রাষ্ট্ররূপে একে গড়ে তুলতে হলে একতার সূত্রগুলিকে আরও সুদৃঢ় করে তোলা প্রয়োজন।

বহু ভাষার দেশ এই ভারতবর্ষ। প্রত্যেক প্রদেশের ভাষা বিভিন্ন। পৃথিবীর অন্য সব দেশের চাইতে আমাদের দেশের ভাষার সংখ্যা বেশি। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, প্রতিবেশী প্রদেশগুলির ভাষা শেখবার বা জানবার ঔৎসুক্য আমাদের খুবই কম। অন্যান্য প্রদেশের সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক সম্পদের বিষয়ে জ্ঞান তো আরও সীমিত। ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, জার্মান ইত্যাদি য়ুরোপীয় ভাষার সাহিত্য ও সমাজের বিষয়ে আমরা যতটুকু খোঁজ-খবর রাখি, এদেশের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য সম্বন্ধে সেটুকুও জানি না।

দেশের ভাবাত্মক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে তোলার জন্য আমাদের বিভিন্ন ভাষার উৎকৃষ্ট সাহিত্য-প্রচেষ্টার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা নিতান্ত জরুরি। সাহিত্যের মাধ্যমেই অন্যান্য প্রদেশের জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার এবং 'সাংস্কৃতিক' চিন্তার সঙ্গে ভালোভাবে পরিচয় ঘটবে।

এ এক অদ্ভুত বিরোধাভাস চোখে পড়ে। পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে বহু রাষ্ট্র। প্রত্যেক রাষ্ট্রই স্বাধীন। তাদের ভাষাও পৃথক পৃথক। তবু সেখানকার মানুষ একে অন্যের সাহিত্য ও চিন্তাধারার যত সূক্ষ্ম বিশদ জ্ঞান রাখেন, আমরা নিজেদের ভাষাগুলির ততখানি রাখি না।

য়ুরোপের সব ভাষায় শ্রেষ্ঠ বইগুলি প্রকাশের অনতিবিলম্বে অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ হয়ে যায়। অথচ ভারত এক অভিন্ন রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও এক-অন্যের ভাষায় কী ঘটছে, তা জানার আগ্রহ আমাদের নেই। অবশ্য এই পরিস্থিতি পালটাতে শুরু করেছে যদিও খুবই মন্থর গতিতে।

শেষ পর্ব

সিপাহীজী! এই বদমায়েসটাকে ধরে রাখ। কথাটা বলে টিকিট-বাবু অন্যান্য যাত্রীদের টিকিট দেখতে লাগলেন। তখন সন্ধ্যা সাতটা। লোকেরা এক-এক করে টিকিট দেখিয়ে গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। সিপাহীজী যাত্রীর একটা হাত জোরে ধরে তাকে ফটকের এক পাশে দাঁড় করিয়ে দিল। এই সময় যাত্রীটির লম্বা কোটের ছেঁড়া পকেট থেকে দলা-পাকানো কাগজের একটা বাণ্ডিল মাটিতে পড়ে গেল। সে সঙ্গে সঙ্গে বাণ্ডিলটি কুড়িয়ে নিল।

মুসাফির এক নবীন যুবক। সঙ্গে কোন মালপত্র নেই। দেখে মনে হয় জাতিতে শিখ। বয়স বছর আঠারো। মুখে এখনও গোঁফ-দাড়ির রেখাই ওঠেনি। জামার কলারের দিকটা ছেঁড়া। কালো লম্বা কোটটারও ওই দশা। কোটের অনেক জায়গায় তালিমারা। বোতামের ঘরগুলো ফেটে চওড়া হয়ে গিয়েছে। দেখে মনে হয়, মোটা সাদা সুতো দিয়ে কয়েকবার ঘরগুলো সেলাই করা হয়েছে। কোটে একটিও বোতাম নেই। সম্ভবত ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচবার জন্য বোতামের ঘর সুতো দিয়ে বেঁধে কাজ চালিয়ে নেওয়া হয়েছে। কোটের একটি পকেট তো একেবারেই ছেঁড়া। আর-একটি একটু আস্ত। মুসাফিরের সুডৌল গৌর দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন দারিদ্র্য, নৈরাশ্য আর লজ্জার প্রতিমূর্তি।

সিপাহীজীর হাতের স্পর্শে যাত্রীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে কেঁপে উঠল। তার সামনে দিয়ে শত শত যাত্রী টিকিট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু টিকিটবাবু তো আর কারও দিকে অমন শ্যেন দৃষ্টিতে তাকাননি যেমন কটমট করে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলেন। বহুলোকের জ্বলন্ত দৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্য যাত্রীটি দু-কদম এগিয়ে ফটকের দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে রইল। এর ফলে সম্ভবত সিপাহীর মনে ধারণা হল, মুসাফির বোধ হয় পালাবার অছিলা খুঁজছে। সিপাহীজী অমনি তার দিকে চোখ পাকিয়ে ধমক দিয়ে উঠল, কী রে ব্যাটা,

কোথায় যাচ্ছিস? নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়া, নয়তো মেরে চামড়া খুলে নেব!

যাত্রীটি কোন কথা না বলে ফের আগের জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে রইল। প্রায় পৌনে একঘণ্টা বাদে যখন আর-সব যাত্রী চলে গেল, তখন টিকিটবাবু ওর দিকে মন দিলেন। কর্কশ কণ্ঠে বললেন, দে রে, এক টাকা দশ আনা দে। টিকিটবাবু কিছু বলার আগেই যাত্রীটি কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে আঙুল দিয়ে কী যেন খুজতে লাগল। তার কাছে ছিল পুরনো সাদা তামার একটি মুদ্রা। এই সময় তার অবস্থাটা এমন একটি লোকের মত, তৃষ্ণায় যার গলার ছাতি ফেটে যাচ্ছে আর তার সামনে রয়েছে ছোট ঘটিতে সামান্য নোনা জল। ওর পকেটে খালি একটা অচল সিকিই সম্বল। যাত্রী খুব মিনতি মাখা স্বরে ভয়ে ভয়ে বলল, বাবুজি, আমাকে দয়া করুন। আমি ভীষণ গরিব। অনেক চেষ্টা করেও আমি টিকিটের পয়সা জোটাতে পারিনি। এই জন্যেই আমাকে বিনা টিকিটে আসতে হয়েছে। টিকিটবাবু বিদ্রূপের হাসি হেসে বললেন, টিকিট কেনার পয়সা ছিল না! গাড়ি তোর বাবার—না? মাগনা ট্রেন চড়ার সময় জেলের ডাল-রুটি খেতে হবে এই খেয়াল ছিল না?

সিপাহীজী পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, টিকিটবাবু, আপনি ভাবছেন এর কাছে পয়সা নেই! আমার মনে হচ্ছে যদি এর পকেট সার্চ করে দেখেন তাহলে বোঝা যাবে এ ব্যাটা সত্যি সত্যি গরিব, না জোচ্চোর। টিকিটবাবু সিপাহীজীর কথায় সায় দিয়ে বললেন, আমি জানিনা নাকি। এই-সব লোকের এটাই তো পেশা। বিনা টিকিটে গাড়ি চড়া। আর টিকিট চেকার দেখলেই গুলতাপ্পি মেরে আস্তে আস্তে সরে পড়া।

কথাটা বলেই টিকিটবাবু আবার যাত্রীর দিকে চেয়ে ভ্রূকুটি হানলেন—কী রে, পয়সা দিবি না চালান করে দেব?

ভয়ে যাত্রীর রক্ত যেন হিম হয়ে গেল। দ্রুত ওর মুখের রঙ বিবর্ণ হতে শুরু করল। দু-তিনবার কী একটা বলার চেষ্টা করেও যেন বলতে পারল না। শেষ পর্যন্ত কোন রকমে সাহস করে বলে

ফেলল, বাবুসাহেব, আমি চোর-জোচ্চোর না। বিশ্বাস করুন। আমি এক হতভাগ্য গরিব। সত্যিই, আমি বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়ে অপরাধ করেছি। এর জন্য যেখানে আপনি আমাকে নিয়ে যেতে চান নিয়ে চলুন। কিন্তু ভগবানের দোহাই, এইরকম করে গালি-গালাজ করে আমার বুকে আর ছুরি মারবেন না।

বলতে বলতে যাত্রী একেবারে কেঁদে ফেলল। চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে নেমে এল অশ্রুধারা।

বিনাটিকিটের যাত্রীদের কাছ থেকে এই ধরনের কথা শুনতে টিকিটবাবু অভ্যস্ত। এমন-কি, কখনও কখনও তারা এর চেয়েও আরও করুণ দৃশ্যের অবতারণা করে থাকে। কিন্তু টিকিটবাবুর চোখ যখন যাত্রীটির চোখের ওপর গিয়ে পড়ল তখন তিনি সত্যিই যেন বিচলিত হলেন। যাত্রীটির বড় বড় চোখ দুটি থেকে যেন রক্ত ঝরে পড়ছে। ক্রোধে আর ঘৃণায় তার ঠোঁট দুটি কাঁপছে। ফর্সা দেহের সর্বাঙ্গ লাল হয়ে উঠেছে।

বোধ হয় সিপাহীজীর হৃদয় টিকিটবাবুর থেকে কঠিন ছিল। যাত্রীর করুণ কথাগুলি তাকে কোনক্রমে বিচলিতই করল না। কিন্তু ওই দুঃখী মানুষটির ওই চারটি কথাতেই টিকিটবাবুর মনটা নরম হয়ে গেল। মনে মনে আফসোস হল তাঁর, এই দুঃখী লোকটিকে কেন এতক্ষণ ওই নির্মম কথাগুলি শোনালেন। উনি অনেকক্ষণ ধরে এক দৃষ্টিতে মুসাফিরের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ওই দুটি জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টি তাঁর মনের মধ্যে এক গভীর রেখাপাত করল।

যাত্রীটির কাছে কাগজের যে বাণ্ডিলটি ছিল সে কখনও সেটি বগলের নীচে রাখছিল, কখনও-বা সেটি ঢুকিয়ে রাখছিল কোটের পকেটে। আবার একবার ভাবল আর-একটা পকেটের মত এ পকেটটিও না ছিঁড়ে যায়, এই মনে করে বাণ্ডিলটি সে পকেট থেকে বার করে খুব সাবধানে হাতে করে ধরে রাখল।

—আমার সঙ্গে চল। টিকিটবাবু মুসাফিরকে বললেন। তারপর গেটের চার্জ আর-একজন টিকিটবাবুকে বুঝিয়ে দিয়ে যাত্রীটিকে সঙ্গে নিয়ে স্টেশনের বাইরে চললেন।

যাত্রীর মনে ততক্ষণে দুর্ভাবনা অনেকখানি কেটে গেছে। তার বিশ্বাস হয়েছে, টিকিটবাবু আর তাকে স্টেশনমাস্টার বা পুলিশের কাছে নিয়ে যাবেন না। সে অবাক হয়ে দেখল যে টিকিটবাবু স্টেশনের বাইরে খোলামাঠে সবুজ ঘাসের ওপর গিয়ে বসলেন। তাকেও পাশে বসার জন্য ইঙ্গিত করলেন।

টিকিটবাবু আবার একবার যাত্রীটির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন। তারপর যাত্রীটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথা থেকে আসছ ?

—আজ্ঞে, লাহোর থেকে।

—বাড়ি কোথায় ?

—অমৃতসরে।

—বড় আজব কথা তো ! অমৃতসর থেকে আসছ অথচ পকেটে দশ আনাও নেই ? কী কাজ কর ?

প্রশ্নটির সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে যাত্রীটির মনে হল একটু অসুবিধা হল। একটু ভেবে নিয়ে সে জবাব দিল, আজ্ঞে, আমি কিছুই করি না।

টিকিটবাবুর আরও অবাক হবার পালা।—কিছুই কর না ? তাহলে চলে কি করে ? টিকিটবাবু এবার একটু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতেই তার দিকে তাকালেন। কিন্তু তাঁর সন্দেহের কোন কারণ ছিল না। যাত্রীর চোখে এমন একটা আকর্ষণী শক্তি ছিল যা টিকিটবাবুকে মুগ্ধ না করে পারেনি।

যাত্রী বলল, কী আর বলব, কীভাবে চলে ! কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আসলে কী জানেন বাবুজী, মৃত্যুর মত বড় বালাই আর নেই। মরণকে লোকে কী ভয়টাই না করে। ভগবান লোককে, বিশেষ করে আমার মত লোককে গরিব-দুঃখী করে সৃষ্টি করেছেন। আমার সব-কিছু শেষ হয়ে গিয়েছে। অপমান আর অত্যাচার সহ্য করেও আমি বেঁচে থাকতে চাইছি। এভাবে বেঁচে থাকার কোন মানেই হয় না। বলতে বলতে যাত্রীর গলা ধরে এল।

যাত্রী আর দু-একটি কথা বলতেই টিকিটবাবুর হৃদয় গলে গেল। যাত্রীকে তিনি আশ্বস্ত করে বললেন, সর্দারজী, বিশ্বাস

হারিয়ো না। আমার মনে হচ্ছে তুমি খুব কষ্টের মধ্যে আছ। আমার যতখানি সাধ্য তোমাকে সাহায্য করব।

যাত্রীটি কোন্ এক গভীর চিন্তায় আবার মগ্ন হয়ে পড়ল। টিকিটবাবুর কথার কোন উত্তর না দিয়ে সে আবার ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল, স্যর, আপনি আমার জন্য যা করলেন আমি তার যোগ্য নই। আপনার উচিত ছিল আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া। বিকেল হওয়ার আগেই আমি নিজেকে হাজতের মধ্যে দেখতাম। সেটাই আমার পক্ষে ভাল হত। আমার জন্য এটাই আপনার করা উচিত ছিল।

যাত্রী কী বলতে চায় তা বোঝার জন্য টিকিটবাবু তার মুখের দিকে তাকালেন। মুহূর্তের জন্য তাঁর মনে হল, যাত্রীটি পাগল, ওর মতিস্থির নেই। তিনি তাই আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার জন্য এই করা উচিত ছিল, মানেটা কি? কী বলতে চাও তুমি? মুসাফির তার হাতের কাগজের বাণ্ডিলটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, তা হলে আমার এই উপন্যাসের শেষ পর্বটি পুরো হয়ে যেত।

টিকিটবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, ভাই, কী বলতে চাইছ। একটু ভাল করে বুঝিয়ে বল, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

যাত্রী বলল, আমি এই শহরের 'ভাওতাওয়ালে দরওয়াজা' এলাকায় এক ভাঙা বাড়িতে থাকি। ঘর ভাড়া দিতে হয় মাসে আট আনা। কিন্তু এই আট আনা আমার কাছে আট টাকা দেওয়ার সামিল। আমি একজন সামান্য লেখক। লেখা আমার পেশা নয়, কিছুদিন হল আমার সাহিত্যিক হবার শখ হয়েছে। সম্প্রতি আমি কয়েকটি বই লিখেছি। প্রকাশকরা তা ছেপেছেনও। এ ছাড়া কিছু কিছু পত্র-পত্রিকাতেও আমার গল্প বেরিয়েছে। পাঠকেরা অনেকেই গল্পগুলো পড়ে প্রশংসা করেছেন। কিন্তু খালি মুখের প্রশংসার কী দাম? লিখে সামান্যই টাকা পাই। এতে কিছুই হয় না। একটু থেমে যাত্রী আবার বলতে শুরু করল, বাবুসাহেব, কিছুদিন হল আমি এই লেখাটা শুরু করেছি। যাত্রী এবার তার হাতের পাণ্ডুলিপির দিকে টিকিটবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করল।—আমি

যখন এই লেখাটি শুরু করি তখন আমি একেবারে নিঃস্ব। কেউ আমাকে ধার দিতেও সাহস করত না। এই তো পরশু দিনেরই কথা, লিখতে লিখতে কাগজ ফুরিয়ে গেল। মহা মুশকিলে পড়লাম। উপন্যাসের শেষ পর্বটি লেখা তখনও বাকী। আমি না খেয়ে, জামা-কাপড় না পরে থাকতে পারি, কিন্তু কাগজ ছাড়া আমি কীভাবে বেঁচে থাকব? আমি সামান্য কিছু কাগজের জন্য দিনভোর ঘুরে বেড়িয়েছি। কিন্তু কেউ আমাকে চার আনা পয়সাও ধার দেয়নি। কাগজও দেয়নি।

আমি বাজারে যাচ্ছিলাম। দেখলাম এক ডাস্টবিনে কিছু ময়লা কাগজ পড়ে রয়েছে। বোধহয় কোন ইস্কুলের ছেলে তার খাতার কিছু বাজে কাগজ ফেলে দিয়ে থাকবে। আমি ওই কাগজগুলো তুলে দেখি, প্রত্যেকটাই নোংরা জল লেগে ভিজে গিয়েছে। পাতাগুলির এক পিঠে লেখা, অন্য পিঠ সাদা। যেদিকটা সাদা জলে ভেজার ফলে সেদিকটাতেও উলটো পিঠের কালির চোপসানো দাগ ফুটে উঠেছে। আমি কাগজগুলো তুলে নিয়ে বাড়ি গেলাম। তারপর সেগুলো উনুনের আঁচে শুকিয়ে নিলাম। আমার কাছে ওইটাই মস্ত বড় সৌভাগ্যের বিষয় বলতে পারেন।

ওই কাগজে আমি একনাগাড়ে ছয়-সাত ঘণ্টা লিখে গেলাম। পরের দিন আর লেখার মত কোন কাগজ ছিল না। তখন উপন্যাসটি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তার শেষপর্বের সামান্য কিছু অংশ লেখা বাকী ছিল। আমি উপন্যাসটি বিক্রি করার জন্য খুব উদ্বিগ্ন ছিলাম। আমি চাইছিলাম, উপন্যাসটি বিক্রি করে যদি কিছু টাকা পেয়ে যাই তাহলে আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হবে।

—কী এই প্রতিজ্ঞা? আমি তা নিজেই জানি না। আমার মনে হয়েছিল এই লেখাটি আমার আগের সব লেখাগুলি থেকে উৎকৃষ্ট। তাই ইচ্ছে ছিল লাহোরে গিয়ে এটি কোন অভিজাত প্রকাশককে ছাপবার জন্য দেব। কিন্তু বিনা পয়সায় আমার পক্ষে লাহোর যাওয়া কলকাতা যাওয়ার মতনই।

কাল কোনরকমে একটা টাকা জোগাড় করেছিলাম। কিন্তু যে

লোকটি আমাকে টাকা দিয়েছিল সে জুয়াড়ীদের মহাজন। এক টাকা দিয়ে সে দুটাকার রসিদ লিখিয়ে নেয়।

আজ সকাল থেকে আমার পেটে কিছু পড়েনি। এই অসমাপ্ত উপন্যাসটি নিয়ে আমি লাহোর গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, প্রকাশকের সঙ্গে ছাপবার কথাবার্তা পাকা হয়ে যাবে আর তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে কাগজ কিনব। তারপর কোন খোলা মাঠে বসে উপন্যাসটি শেষ করব। তারপর খাওয়াদাওয়া করব।

রেলের টিকিট নিয়ে আমি লাহোর পৌঁছলাম। ওখানে কয়েকজন প্রকাশকের সঙ্গে দেখা করলাম। আমার ইচ্ছাটা ছিল এই যে প্রকাশকের কাছে পাণ্ডুলিপিটি দেখাব। তাকে একেবারে আগা-গোড়া পাণ্ডুলিপিটি পড়ে শোনাব। কারণ, প্রকাশকের মনে তা হলে উপন্যাসটি রেখাপাত করবে আর আমারও কিছু ভাল প্রাপ্তিযোগ ঘটবে। কিন্তু তারা আমার নোংরা পাণ্ডুলিপিটি দেখেই নাক সিঁটকোতে লাগল। কেউ কেউ বলল, বড় জোর দশ-পনের টাকা দিতে পারি। এই টাকা পেলে আমার কোন কাজই হবে না।

মোদ্দা কথাটা হল এই, আমি সারাদিন ধরে প্রকাশকের দরজায় দরজায় ধরনা দিলাম, কিন্তু কেউ আমার বই কিনতে রাজি হল না। এবার অমৃতসরে কী করে ফিরে যাব তাই নিয়ে চিন্তা হল। ক্ষিদেয় আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিল। ঐ সময় আমার কাছে একটি মাত্র সিকি সম্বল। আমি একটি দোকানে গিয়ে চার আনার তণ্ডুর রুটি কিনে খেলাম। যখন দাম দিতে গেলাম তখন আমার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সিকিটি অচল। দোকানদার সিকিটি আমার মুখের ওপর ছুঁড়ে মারল। ওই দোকানে আরও কিছু লোক খাবার খাচ্ছিল। তারা আমার প্রতি কোন সহানুভূতি তো দেখালই না, উপরন্তু তারা যা-তা বলে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে লাগল।

দোকানদার বেশ কিছুক্ষণ ধরে গালিগালাজ করল। আমার কিন্তু কোন উপায় ছিল না। আমার পকেটে একটি সিল্কের রুমাল ছিল। এর দাম আমার কাছে কতখানি? সে আমি আপনাকে বোঝাতে পারব না। বলতে বলতে যাত্রীর গলার স্বর ধরে এল। আমি

সারাজীবনের উপার্জন থেকে যা কিছু সঞ্চয় করতে পেরেছি এই রুমালটাই তার শেষ চিহ্ন। নিজের বুকে পাথর বেঁধে রুমালটাই দোকানদারকে দিয়ে দিলাম। রুমালটা দেবার সময় চোখের সামনে এক সুন্দর ছবি ভেসে উঠল। আমার মনে হচ্ছিল কে যেন জলভরা চোখে আমায় বার বার সুধোচ্ছে, নীচ, তোমার রক্তও কি সাদা হয়ে গিয়েছে ?

দুহাতে বুক চেপে আমি সোজা স্টেশনের দিকে দৌড়লাম। টিকিট না কেটেই উঠে বসলাম ট্রেনে। গাড়িতে বসে বসেই নোংরা খবরের কাগজের ওপরেই আমার উপন্যাসের শেষ পর্ব লিখতে শুরু করে দিলাম। কিন্তু শেষ করতে পারলাম না। যখন এখানে স্টেশনে নামলাম তখনই আপনার হাতে পড়লাম।

জনাব, এইজন্যেই আপনাকে আমি বলেছিলাম, আমাকে যদি জেলে পাঠান তবে উপন্যাসের শেষ পর্ব লেখা আমি সম্পূর্ণ করতে পারি। কারণ আমার এই উপন্যাসের নাম 'সাদা রক্ত'। এই উপন্যাসে যত চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে, দু-একজনের ছাড়া সকলের রক্তই সাদা। আপনিই আমার এ উপন্যাসের শেষ চরিত্র। যদি আপনার রক্ত সাদা হত তাহলে এই উপন্যাসটি হত এক বিরাট ট্র্যাজেডি। উপন্যাসের শেষ কী হবে এটা এখন আমাকে আবার চিন্তা করতে হবে।

যাত্রীটির উপন্যাসের শেষ পর্বই যখন এত দরদভরা তখন উপন্যাসের অন্যান্য পর্বগুলি না জানি কেমন হবে ? এই-সব কথা ভাবতে ভাবতে টিকিটবাবু আনমনা হয়ে গেলেন। শ্রদ্ধা, সহানুভূতি ও স্নেহের দৃষ্টিতে টিকিটবাবু যাত্রীটির দিকে আর একবার তাকিয়ে দেখলেন। তার হাতে চুমু খেয়ে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে বললেন, সর্দারজী, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি জানতাম না, আপনি এত বড় একজন মানুষ। আসুন, আজ এই গরিবের কোয়ার্টার্সে রাতটা কাটান। যদি কোন অসুবিধা না হয় তা হলে উপন্যাসটিও দয়া করে আমাকে শুনিয়ে দেবেন। আমার উপন্যাস পড়ার ভীষণ শখ। মনে হয়, আমি নিজেই আপনার লেখাটি ছাপার ব্যবস্থা করে দিতে পারব।

এখানকার বেশ কয়েকজন প্রকাশক আমার পরিচিত।

যাত্রী কোন জবাব দিল না। নিঃশব্দে সে টিকিটবাবুকে অনুসরণ করল। টিকিটবাবুও আর কোন প্রশ্ন করলেন না। কিছুক্ষণ পরে যাত্রী টিকিটবাবুর সঙ্গে তার কোয়ার্টার্সে পৌঁছল।

বাড়ি পৌঁছেই টিকিটবাবু চাকরকে অতিথির জন্য রাতের খাবার ব্যবস্থা করতে বললেন। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর তুজনে শোবার ঘরে ঢুকলেন। টিকিটবাবু যাত্রীকে বিছানায় বসার জন্য ইসারা করলেন। বললেন, সর্দারজী, বসুন। আগে আপনার উপন্যাসটি শোনান।

রাত ন'টা বেজে গিয়েছিল। যাত্রী এবার দলা-পাকানো ময়লা কাগজের বাণ্ডিলটি খুলল। খুলতেই কয়েকটি টুকরো পাতা মেঝের এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ল। যাত্রী তাড়াতাড়ি উঠে কাগজগুলি কুড়িয়ে পৃষ্ঠা মেলাতে লাগল। যখন পৃষ্ঠা মেলানো হয়ে গেল, তখন উপন্যাসের টাইটেল পাতাটি নিয়ে সে বিছানার ওপর রাখল। টাইটেল পাতাটির দিকে নজর পড়তেই টিকিটবাবু এমন করে উঠে দাঁড়ালেন, যেমন মাঝে মাঝে ওপরওয়ালা কোন অফিসার সামনে এলে তিনি উঠে দাঁড়ান। টাইটেলে লেখা ছিল :

সাদা রক্ত

রচনা

গুপ্তেশ্বর।

গুপ্তেশ্বর নামটির সঙ্গে টিকিটবাবু মজ্জায় মজ্জায় পরিচিত। গুপ্তেশ্বরের প্রতিটি বই তিনি দারুণ শ্রদ্ধা-ভালবাসার সঙ্গে এতদিন পড়ে এসেছেন। গুপ্তেশ্বরের প্রতিটি লেখা পড়ে তিনি এতদিন কত শান্তি ও সুখ অনুভব করেছেন। গুপ্তেশ্বরের বই তিনি ধর্মগ্রন্থের মত কাপড়ে জড়িয়ে রাখতেন।

সেই গুপ্তেশ্বর কি ইনিই? আমি কি সত্যিই সেই মহাপুরুষের দর্শন লাভ করছি যার প্রত্যেকটি বাক্য আমার কাজে আকাশবাণীর চেয়ে কম নয়। এত বড় একজন মহান মানুষের আজ এই অবস্থা! এই ধরনের অনেক প্রশ্ন তাঁর মাথার মধ্যে জট পাকাচ্ছিল।

টিকিটবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে মাটিতে বসে পড়লেন। দু-হাত দিয়ে যাত্রীটির পা জড়িয়ে ধরে তিনি প্রশ্ন করলেন, আপনিই কি সেই গুপ্তেশ্বর? আপনিই কি সেই মহাপুরুষ, যিনি আমার প্রতিটি রোমকূপে মিশে রয়েছেন? এই কথা বলতে বলতে টিকিটবাবু আলমারি থেকে কাপড়ে বাঁধা একটি মোড়ক বার করলেন। মোড়কটি তাঁর সামনে খুলে বললেন, দেখুন তো, এই বইগুলো কি সব আপনারই লেখা?

ওই মোড়কের ভেতর গুপ্তেশ্বরের এ পর্যন্ত প্রকাশিত সমস্ত বই-ই ছিল। এ ছাড়া পত্র-পত্রিকায় তাঁর এ-পর্যন্ত প্রকাশিত প্রত্যেকটি রচনার কাটিংও রাখা ছিল। কিন্তু এই প্রশংসা যাত্রীর মনে কোন প্রতিক্রিয়ারই সৃষ্টি করল না। যেমন অন্যান্য লেখকের বেলা হয়ে থাকে, সে আগের মতই গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলল, হাঁ, এই-সব বইগুলি ঈশ্বরেরই কৃপা।

টিকিটবাবু অর্থাৎ শ্যামদাস তাঁর অন্তরের সমস্ত শ্রদ্ধাভক্তি গুপ্তেশ্বরের চরণে নিবেদন করতে চেয়েছিলেন। গদগদ কণ্ঠে তিনি বললেন, গুপ্তেশ্বরবাবু, আমি আজ সত্যিই বড় ভাগ্যবান। আমি আজ সেই মানুষের দেখা পেলাম যার নাম আমি এতদিন মনে মনে জপ করতাম। আপনি আমার মুক্তিদাতা। কি করে বলি, আপনি আমার কত উপকার করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। কয়েক বছর আগে আমার জীবন ছিল কুকুরের জীবন। দুনিয়ার যত রকম খারাপ জিনিস থাকতে পারে তা সবই আমার মধ্যে ছিল। কিন্তু যখন থেকে আমি আপনার লেখা পড়তে শুরু করলাম, আমি নিজেই অনুভব করলাম, আমার জীবন ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। আমি খুঁজে খুঁজে আপনার প্রতিটি বই জোগাড় করলাম। যে-সব পত্রিকায় আপনার লেখা বার হত, সেই-সব পত্রিকা আনাতে শুরু করলাম। আপনার লেখা যে কত আধ্যাত্মিক, কত দরদ-ভরা তার প্রভাবে আমার গোটা জীবনধারাটাই বদলে গেল। অনেকবার আমি আপনার জীবন দর্শন অনুসারে নিজের জীবন গড়বার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আপনার দর্শন এত উঁচু যে আমি কখনও তার নাগাল পাইনি।

আমি অনেকবার আপনার খোঁজ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আপনি কোথায় থাকেন কেউ বলতে পারেনি। সকলেই বলেছে এই অজ্ঞাতপরিচয় লেখক কোথায় থাকে কেউ জানে না।

আপনি যে-ঘরে বসে আছেন, এই ঘরে মাতাল আর জুয়াড়ীদের সব সময় ভিড় থাকত। আমি এই-সব লোকদেরই পাণ্ডা ছিলাম। এ ছাড়া আমি যে কত পাপ আর কুকর্ম করেছি তা মনে আসলেই··· ।

গুপ্তেশ্বরের খুব দুঃখ হল শ্যামদাসবাবুর অবস্থা দেখে। এত বড় একটা অপরাধী এত তাড়াতাড়ি নিজেকে শুধরে নিয়েছে, এই কথা মনে করে শ্যামদাসবাবুর প্রতি তার মন সহানুভূতি আর ভালবাসায় ভরে উঠল। সে শ্যামদাসবাবুকে ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিল। বলল, আপনি আমার শ্রদ্ধেয়। আপনার মত ভাগ্যবান লোককে দেখে আমি খুশি হয়েছি। এটা সবচেয়ে বড় কথা, যে-পাপ থেকে সহজে পরিত্রাণ পাওয়া মুশকিল, সেই পাপ থেকে আপনি বেরিয়ে এসেছেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তিনি আপনাকে এত বড় দয়া করেছেন।

শ্যামদাসবাবুর মন খুশিতে ভরে উঠল। কিন্তু এই সময় তাঁর মনে হল, এই পুণ্যাত্মা লোকটিকে তিনি কত অপমান করেছেন। লজ্জায় তিনি মাটির সঙ্গে মিশে গেলেন।

শ্যামদাসবাবু গুপ্তেশ্বরের পা জড়িয়ে ধরে বললেন, আমাকে শাস্তি দিন। আমি আজ মহা অপরাধ করেছি। নিজের পা দুটি শ্যামদাসের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গুপ্তেশ্বর বলল, শ্যামদাসবাবু, আপনি আমার থেকে সব দিক দিয়ে অনেক বড়। এইভাবে আমাকে আর নরকের ভাগী করবেন না। আপনি আমার বাবার বয়সী।

শ্যামবাবু বললেন, ঠিক কথা। কিন্তু সেই শ্রেষ্ঠ যিনি জ্ঞানী। শ্যামদাসবাবু অনুরোধ করলেন, কথা পরে হবে, আগে উপন্যাস শোনান। গুপ্তেশ্বর বলল, শোনাচ্ছি। কিন্তু বইটা খুব বড়। আমার ভয় হচ্ছে শুনতে শুনতে আপনি অধৈর্য হয়ে পড়বেন।

কী বললেন ? অধৈর্য হয়ে পড়ব ? যতক্ষণ না আপনার উপন্যাসটা পুরো শুনছি, ততক্ষণ জলস্পর্শ করাও আমার পক্ষে অপরাধ। যদি অবশ্য আপনি না ক্লান্ত হয়ে পড়েন।

আজকের রাতটুকু তাহলে আপনাকে জাগতে হবে। এই বই শেষ করতে অন্তত কম করে দশ ঘণ্টা সময় লাগে।

—যদি দশদিন ধরেও শোনান, তাহলেও ক্লান্ত হব না।

— আচ্ছা, তাহলে শুনুন।

শ্যামবাবু টেবিল ল্যাম্পটি গুপ্তেশ্বরের দিকে সরিয়ে দিয়ে বললেন, তাহলে শুরু করুন।

গুপ্তেশ্বর টাইটেল পেজটি টেবিলের একপাশে সরিয়ে রেখে দিয়ে উপন্যাসটি শুরু করল।

॥ ১ ॥

এক অন্ধকার রাত। তাল-পাতা দিয়ে ছাওয়া এক জীর্ণ কুটীরে বসে এক বেদনাহত দুঃখী যুবতী ক্লান্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছিল। পাতাঝরার ঋতুতে শুকনো ঝরা পাতা যেমন একটুখানির জন্য অরণ্যের নির্জনতা ভাঙে, তারপর মুহূর্তেই গোটা বন যেমন নিস্তব্ধ হয়ে যায়, তেমনি ওই যুবতীর দীর্ঘ নিশ্বাসও সেই ভয়ানক অন্ধকার নির্জন রাতে সামান্য একটু শব্দ তুলেই আবার পরমুহূর্তে মিলিয়ে যাচ্ছিল।

একে তো নির্জন আঁধার। তার ওপর কুটীরটি গ্রাম থেকে কিছু দূরে। যুবতী সেখানে একাকিনী। আশেপাশে কেউ নেই। মনে হচ্ছিল, কিছু দূরে আর-একটি কুটীর আছে। কুটীরের পাশে কুয়া। দিনের বেলা সেখানে মজুররা বসে হুঁকা-তামাক খায়। যুবতীর বয়স আঠারোর বেশি নয়। কাঁসার চকচকে মাজা বাসনও রান্নাঘরের ধোঁয়ায় রাখলে কালো হয়ে যায়, তেমনি যুবতীর সৌন্দর্যও সংসারের দুঃখ-দুর্দশার কালো ছায়াতে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। তার চোখের কোণে কালি, এলোমেলো চুল, পরনের জীর্ণ শাড়ি দেখে মনে হয় তার এই যুবতী বয়সেই তাকে অনেক ঝড়-ঝাপটা সহ্য করতে হয়েছে।

অমাবস্যার তমিস্রা রাত্রি। তার ওপর মাঘ মাস। ভীষণ শীতের রাত্রি। ঝড়ের শোঁ শোঁ আওয়াজ ও শুকনো গাছের কর্কশ শব্দ মিলে যুবতীর দুঃখ যেন বাড়িয়ে তুলেছে। ঠাণ্ডায় সে কাঁপছিল। তার মনের মধ্যে জ্বলছে এক আগুন। সে আগুন কাঠ বা কয়লার আগুন নয় যে একটু বাইরের বাতাসেই সে আগুন নিবে যায়।

সুখের দিনের স্মৃতির মত রাতের আয়ুও ধীরে ধীরে ফুরিয়ে আসছিল। কিন্তু ভবিষ্যৎ দুঃখের সম্ভাবনার মত ঠাণ্ডা ও ঝড় বেড়েই চলল। যখন তার শরীরের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল, বাহ্যিক চেতনা লুপ্ত হয়ে গেল, তখন সে গোবর-নিকানো মাটির ওপর পড়ে গেল। ওর অবস্থা দেখে আকাশের ঝিকিমিকি তারাগুলো চোখ বন্ধ করে ফেলল। আকাশের মেঘেরা অস্থির হয়ে যেন কান্নায় ভেঙে পড়ল।

ঝড় ও বৃষ্টিতে তুফান ছুটল। সেই যুবতী তখনও সেই অবস্থায় পড়ে। ঝড়ের এক ঝাপটা লেগে কুটীরের চালের একটি অংশ উড়িয়ে নিয়ে গেল। কুটীরের চাল থেকে কিছু ডালপালা যুবতীর মাথায় এসে পড়ল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের দিনের বন্ধুর মত ডালপালা-গুলি কখন যে উড়ে চলে গেল তা কেউ বলতে পারে না। এখন ওই দুঃখী যুবতীর মাথার ওপর খোলা আকাশ ছাড়া আর কিছুই নেই।

শিলাবৃষ্টির ছাঁট মোটা তীরের ফলার মত তার অর্ধমৃতদেহের ওপর এসে পড়ছিল। তার শুকনো লম্বা চুলের গুচ্ছ বর্ষার জলে ভিজে অপরাধীর হৃদয়ের মত শক্ত হয়ে গিয়েছিল। ওর অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল কোন নির্দয় ব্যক্তি যেন তার ওপর সপাসপ চাবুক লাগাচ্ছে।

অর্ধমৃতা সেই অবলা নারী খোলা মাঠেই পড়েছিল।

॥ ২ ॥

যুবতীর জ্ঞান ধীরে ধীরে ফিরে আসতে শুরু করল। দেহে কিছুটা উত্তাপ পরিলক্ষিত হল। নিজের ভিতরে কিছু শক্তি সঞ্চয় করল সে। চোখের পলক একটু একটু করে কাঁপতে লাগল। সে

চোখ মেলল ধীরে ধীরে। ওর মনে হল আশেপাশের অস্পষ্ট পৃথিবীটা যেন ঘুরছে। কোন জিনিস তখনও স্পষ্ট ঠাহর করতে পারছিল না। অজান্তে তার হাত মাথার পিছন দিকটায় চলে গেল। অনুভব করল জায়গাটায় প্রচণ্ড ব্যথা। মনে হল মাথার চুল কিছুটা রক্তে ভিজে গিয়েছে। মাথায় কে যেন ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছে।

ধীরে ধীরে ওর সব মনে পড়ল। কীভাবে ও অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, বুঝতে পারল। সঙ্গে সঙ্গে কিছু ঘটনার কথাও মনে পড়ল। মুখ থেকে শুধু একটি কথা অজান্তে বেরিয়ে এল, হায়! তারপর আবার সে জ্ঞান হারাল। কিন্তু এবার আর সে বেশিক্ষণ অচৈতন্য থাকল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার সে জ্ঞান ফিরে পেল। চৌকিতে ভর দিয়ে বিছানা ছেড়ে ওঠার জন্য চেষ্টা করল সে।

কে যেন ওর হাত ধরে মিষ্টি গলায় বলল, না, বিবিজি, এখন উঠবেন না।

কথাগুলো যে বলল, যুবতীর চোখ পড়ল তার দিকে। তাকে চেনবার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছিল না, কোথায় ওই মহিলাকে আগে দেখেছে। ঠিক এই সময় আবার সেই মহিলা বলল, বাছা, খোদাকে ধন্যবাদ দাও। তিনিই তোমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। তোমার অবস্থা দেখে আমি তো খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। আল্লা জানেন, কী হবে।

রোগিণী খুব ভাল করে কথাগুলো শুনল। মহিলার কথার মধ্যে 'খোদাকে ধন্যবাদ' 'আল্লা' এই শব্দ শুনে সে মনে মনে ভাবল, আমি কি তা হলে কোন মুসলমানের বাড়িতে আছি? এই কথা ভেবে সে একটু বিচলিত বোধ করল। হয়তো সে আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলত। কিন্তু মনে হল এই মহিলা তার মাথার কাছে বসে। চোখ দিয়ে তাঁর টপটপ করে জল পড়ছে। রোগিণীর মাথা নিজের কোলের ওপর রেখে সে বার বার তার মুখ চুম্বন করে বলছে, মা, তুমি ভয় পেয়ো না, চিন্তার কোন কারণ নেই। এই তো তুমি ভাল হয়ে উঠছ।

অসুস্থ যুবতীর সঙ্গে সঙ্গে একটি পুরোনো ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। ছোটবেলায় তার একবার ম্যালেরিয়া হয়েছিল। তার মা সে সময় কাছে ছিল না। বাইরে কোথায় কাজে বেরিয়ে গিয়েছিল। বাড়ি ফিবে ঠিক এমনি করে মেয়ের মাথার কাছে বসে, তার মাথা নিজের কোলে রেখে চুম্বন করেছিল। ঠিক এমনি স্নেহের সুরেই সেদিন কথা বলেছিল মা। এর কিছুক্ষণ পরেই তার জ্বর ছেড়ে যায়। এক এক করে তার সব কথাই মনে পড়তে লাগল। এই ঘর, এই দেওয়াল, এখানকার প্রত্যেকটি জিনিস ঠিক হুবহু তার বাড়ির মত। মনে হল, সে যেন এখন আট বছরের খুকিটি। আর তার মা, তার দিকে মমতা-ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। কিছু-ক্ষণের জন্য ভুলে যাওয়া মায়ের স্মৃতি তার বার বার মনে পড়তে লাগল। সমস্ত দুঃখ-বেদনা ভুলে গিয়ে মায়ের প্রতি এক অপরিসীম ভালবাসায় তার সর্ব শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

শোওয়া অবস্থাতেই মাথাটা একটু পিছন দিকে ঘুরিয়ে সে তার শিয়রের মহিলার দিকে তাকাল। হাত দুটো বাড়িয়ে সে মহিলাকে জড়িয়ে ধরে বলল, মা, তুমি আমাকে ছেড়ে এতদিন কোথায় ছিলে মা? আবার তুমি আমাকে তোমার কাছে নিয়ে নাও! মা, তুমি তো মরে গিয়েছিলে না? লোকেরা তো তাই বলে! কিছুক্ষণ একটু ভেবে যুবতী আবার বলতে শুরু করল, হ্যাঁ, আমি তো নিজের চোখেই দেখেছি, বাবা নিজে তোমার চিতায় আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। তুমি আমাকেও…। এই কথা বলতে গিয়ে মায়ের প্রতি ভালবাসার আবেগে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। সে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কেঁদে উঠল।

শিয়রের মহিলাও নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না। রোগিণীকে তিনি কোলে টেনে বুকে জড়িয়ে বললেন, মা, আমি বরাবরের জন্য তোমার কাছে থাকব। কখনও তোমাকে ছেড়ে যাব না। খোদা —পরমেশ্বর তোমায় ভাল করে দিন।

রোগিণীর অবস্থা এখন অনেক ভাল। সে ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখল ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র আর ওই রমণী, যাকে সে এতক্ষণ

নিজের মা বলে মনে করে এসেছে, সম্পূর্ণ অপরিচিত। যে ঘরটিকে সে নিজের ঘর বলে ভাবছিল তা একজন মুসলমানের। এতক্ষণ আজেবাজে কথা বলার জন্য সে মনে মনে লজ্জিত হল। বিচলিত হয়ে বলল, আমি কোথায়? তৃষ্ণায় ওর গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। এক গ্লাস জল চাইল। বৃদ্ধা মহিলা যুবতীকে তাড়াতাড়ি খাটে শুইয়ে দিল। বলল, তুমি শোও মা, আমি এখুনি জল নিয়ে আসছি। এই কথা বলে সে তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে চলে গেল।

রোগিণী শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল, এরা তো মুসলমান। এদের হাতে কি করে জল খাব? না, কিছুতেই খাব না।

ঠিক এই সময় বৃদ্ধা মহিলা ঘরে ঢুকল। সঙ্গে এক হিন্দু ছেলে। হাতে গেলাস।

জল খেয়ে যুবতী বেশ সুস্থ বোধ করল। আবার জিজ্ঞাসা করল, আমি এখানে কী করে এলাম? আমি তো··· ।

বৃদ্ধা কথার মাঝখানেই বলে উঠল, মা, আমি বলছি তুমি অত উতলা হোয়ো না। এ বাড়িকে নিজের বাড়ি বলেই মনে কর। হ্যাঁ, আমরা মুসলমান। কিন্তু তোমার ধর্মে কোন আঘাত লাগবে না।

বৃদ্ধা বলল, আমি আর আমার ছেলে আজই আম্বালা থেকে এসেছি। আমার বড় ছেলে ওখানে কনট্র্যাকটরি করে। ভোর চারটের সময় আমরা ট্রেন থেকে নেমে স্টেশন থেকে একটা টাঙ্গা নিলাম। মাইল দেড়েক আসার পর রিহানাওয়ালা গ্রামের বাইরে আমাদের কোচম্যান তোমাকে পথের ধারে পড়ে থাকতে দেখে। তোমার তখন কোন জ্ঞান ছিল না। প্রথমে ভেবেছিলাম, তুমি মরেই গেছ। কিন্তু আমার ছেলে কিছু কিছু ডাক্তারি জানত। ও তোমার নাড়ী পরীক্ষা করে বলে, মা, এর বুকের ওপর হাত রেখে দেখ, এখনও প্রাণ ধুকপুক করছে। আমি হাত রেখে দেখলাম, হ্যাঁ সত্যিই তো। ধীরে ধীরে প্রাণ বইছে, বুক ধুকপুক করছে। ছেলে বলল, চল মা, একে নিয়ে গ্রামবাসীদের কাছে তুলে দিয়ে আসি। এই অসহায় মেয়েটি এখানেই না মরে যায়। আমরা এদিক-ওদিক খোঁজ করলাম। কিন্তু কোন মানুষজন চোখে পড়ল না। ওই সময়

আবার টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আমরা চাইছিলাম কোন লোকের দেখা পেলে তোমাকে তাদের হাতে তুলে দিয়ে চলে যাব। আবার ভাবলাম, গ্রামে গিয়ে খবর দিয়ে আসি। কিন্তু তারপরেই মনে হল এই ভীষণ ঠাণ্ডার দিনে কেউ হয়তো বাড়ি থেকে বেরই হবে না। তার ওপর তুমি এই অবস্থায় পড়ে ছিলে। পুলিশের ভয় তো আছেই। শেষ পর্যন্ত আমার ছেলের কথামত তোমাকে ওই টাঙ্গাতে উঠিয়ে বাড়ি নিয়ে আসি। বাড়ি পৌঁছেই ডাক্তারকে খবর পাঠালাম। তোমার ভিজে কাপড় বদলে দিলাম। গায়ে গরম সেঁক করলাম। এর মধ্যে ডাক্তারবাবু এসে গেলেন। ডাক্তার বেচারা ঘণ্টা দুয়েক ধরে তোমায় পরীক্ষা করলেন, ওষুধপত্র দিলেন। ভগবান ওঁর ভাল করুন। তোমার মাথার পিছনটায় ক্ষত হয়ে গিয়েছিল। রক্তে তোমার চুল ভিজে গিয়েছিল। তোমার ক্ষত-স্থান সেলাই করে ডাক্তারবাবু ব্যানডেজ বেঁধে দিলেন। তুমি সারারাত বেহুঁশ পড়েছিলে। ভগবানের দয়ায় তোমার এখন জ্ঞান ফিরে এসেছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে বৃদ্ধা আবার বলল, মা, তুমি সব-কিছুই তো শুনলে। অদৃষ্টের কোন্ পরিহাসে তোমার এমনটি হল? কোন্ শয়তান তোমার এমন অবস্থা করল? আচ্ছা মা, প্রথমে তোমায় জিজ্ঞাসা করি, তোমার নাম কী? কী নামে তোমায় ডাকব?

রোগিণী শুয়ে শুয়ে বৃদ্ধার কথা শুনছিল। তার মুখের চেহারার ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন হচ্ছে। কখনও তার মুখে ক্রোধের রেখা ফুটে উঠছে, কখনও প্রবল ঘৃণা ও ঈর্ষায় তার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হচ্ছে। কখনও এই মহিলার প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার হৃদয়-মন প্রসন্নতায় ভরে উঠছে।

বৃদ্ধার কথার সে জবাব দিল না। বৃদ্ধা আবার জিজ্ঞাসা করল, মা, তুমি চিন্তা কোরো না। বিপদ সকলের জীবনেই কোন-না-কোন সময় আসে। ভাগ্যের কাছে কারও জোর খাটে না। ও হ্যাঁ, তোমার নামটা কী?

যুবতী তার দোপাট্টার কোণ দিয়ে চোখ মুছে বলল, গুরদেই।

বৃদ্ধা আবার বলল, আচ্ছা গুরদেই, নিজের কথা তো সব শুনলে এখন বল, তুমি কোথায় থাক। আমার ছেলে গফুর খুব উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে। ও বলছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওর বাড়ির ঠিকানা জোগাড় করে ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি। মা, দিনকাল বড় খারাপ। যদি কারও উপকার কর, কেউ প্রশংসা করবে না। কিন্তু কিছু খারাপ করলেই লোকে বদনাম দেবে।

গুরদেই পরম নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, মা, আপনি আমার প্রতি অনেক অনুগ্রহ দেখিয়েছেন। কিন্তু আপনি আমার জন্য এত উপকার যদি না করতেন বোধ হয় সেটাই সবচেয়ে ভাল হত। আমি সব রকম দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি পেতাম। কী জানি, আমার ভাগ্যে আর কত দুর্ভোগ লেখা আছে। বলতে বলতে যুবতীর চোখ ভিজে উঠল।

যুবতীর দুঃখের কথা শুনে বৃদ্ধার হৃদয় ফেটে যাচ্ছিল। বৃদ্ধা যুবতীর মাথাটা বুকে জড়িয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। মনের সব জ্বালা-যন্ত্রণা প্রকাশ করে গুরদেই বেশ হালকা অনুভব করল। ও বলল, আমার বাপের বাড়ি বয়রাবাল গ্রামে। আমার যখন দশ বছর বয়স তখন মা মারা যান। আমার আর কোন ভাইবোন ছিল না। বাবাই আমার জীবনের সব-কিছু ছিলেন। কিন্তু তাতে আমার কোন লাভ হয়নি।

বাবা বদখেয়ালের বশে কোন কাজকর্মই করতেন না। যতদিন মা বেঁচে ছিলেন, বাবার সঙ্গে খিটিমিটি লেগেই থাকত। মা যদি তাঁকে মদ খেতে বারণ করতেন, বাবা তাঁকে মারধোর করতেন। সারাজীবন জ্বলেপুড়ে মা একদিন এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন।

মা মারা যাওয়ার পর বাবার অসংযমের মাত্রাটা আরও বেড়ে গেল। দিনরাত তিনি মদে ডুবে থাকতেন। ইয়ার-বন্ধুরাও সব সময় তাঁকে ছায়ার মত ঘিরে থাকত। বাবার সব-কিছু সম্পদ যখন নিঃশেষ হয়ে গেল, তখন ইয়ার-বন্ধুরা একদিন অদৃশ্য হল, আর তাদের দেখা পাওয়া গেল না। এদিকে বাড়িতে মেয়ের বয়স যে হু হু করে বেড়ে

চলেছে সেদিকে বাবার কোন খেয়ালই ছিল না। তখন আমি পনের বছরে পা দিয়েছি।

বৃদ্ধা বলল, অতখানি বয়স পর্যন্ত তোমার কোন বিয়ের কথাবার্তাই হয়নি?

মা আমার বিয়ের জন্য এক জায়গায় পাকা কথা বলে গিয়েছিলেন। বাবা সম্বন্ধটা ভেঙে দেন।

বৃদ্ধা বলল, কেন বল তো?

—কী আর বলব। যত মুখ তত কথা। যখন মা বেঁচে ছিলেন, কেউ আমাদের সম্বন্ধে কথা বলতে সাহস করত না। কিন্তু মা যেই চোখ বুঁজলেন পাঁচজনে পাঁচকথা বলতে শুরু করল।

ছেলের বাড়ির লোকেরা যখন জানতে পারল, মেয়ে লেখাপড়া জানে না, তখন তারা বিয়ে ভেঙে দিল। কেউ কেউ অবশ্য বলে যে, বাবা পাত্রপক্ষের কাছ থেকে পণ চেয়েছিলেন।

বৃদ্ধা বলল, আচ্ছা মা, তোমার বাবা তোমাকে লেখাপড়া শেখাননি কেন? তোমাদের হিন্দুদের মধ্যে তো ছেলেমেয়েকে পেট থেকে পড়লেই ইস্কুলে পাঠানো হয়।

—আমার বাবা একটু অন্য ধাঁচের লোক ছিলেন। আমার লেখাপড়া শেখার খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু বাবা আমার সে ইচ্ছায় আমল দেননি। উনি বলতেন, মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিপথে চলে যায়। আরও বলতেন, আমাদের সাতপুরুষে কেউ যখন লেখাপড়া করেনি, তখন বংশের ধারাটা আমি কেন ভাঙতে যাব?

—আচ্ছা, তারপর?

তারপর আর কি! প্রথমে সম্বন্ধ ভেঙে গেল। তারপর পুরনো ইয়ার-বন্ধুরা বাবার ওপর কিছুদিন ভর করল। গাঁটের কড়ি খরচ করে তারা বাবাকে মদ খাওয়াতে লাগল।

তার মানে?

—এর অর্থ হল, তারা বাবাকে ব'লে এমন-এক জায়গায় আমার বিয়ের সম্বন্ধ করছিল যেখানে প্রথমটায় বিয়ে দিতে বাবা রাজি হননি। কিন্তু ভাগ্যের কাছে কার আর জোর চলে? ওরা বাবাকে

রাজি করিয়ে ফেলল। আমার বদলে বাবা শ্বশুরবাড়ি থেকে করকরে দুহাজার টাকা গুণে নিলেন।

কিছুদিন পরে আমার বিয়ে হল। আমার দুঃখের গল্প এখান থেকেই শুরু। আমার স্বামীর বয়স বাবার থেকেও বড় ছিল। এই তো গত বছরেই তার এক নাতির পৈতে হয়েছে। কাসি আর হাঁপানি রোগে তার চেহারাটাই কেমন পালটে গিয়েছিল।

ছেলের বউ ও নাতি-নাতনিতে তার বাড়ি ভরতি। টাকা-পয়সা ছিল অঢেল।

বৃদ্ধা বলল, কিন্তু মা, তোমার বাবা তো ভুল করেছিলেনই। কিন্তু তোমাদের আত্মীয়স্বজনেরা কেউ একবার বলল না, মেয়েটিকে কেন এভাবে জলে ফেলে দিচ্ছ ? তারা তো এর প্রতিবাদ করতে পারত ?

আমাদের আত্মীয়স্বজনের কথা আর বলবেন না। আমার আত্মীয়রাই তো আমার এই অবস্থার জন্য দায়ী। যে বদ বন্ধুকে বাবা সবচেয়ে বেশি খাতির করতেন সে তো আমাদের আত্মীয়-স্বজনেরই মধ্যে। উনি এর মধ্যে না থাকলে এত সব কিছু হতই না। মা, সে অনেক কথা। যদি আপনাকে এক-এক করে প্রত্যেকটি আত্মীয়স্বজনের কথা বলতে শুরু করি, তা হলে অনেক সময় লেগে যাবে। আমার আত্মীয়স্বজন যদি আমার পিছনে না লাগত তা হলে কি আজ আমার এই অবস্থা হত।

মাটিতে হাত ঠেকিয়ে, কান ছুঁয়ে বৃদ্ধা বলল, তোবা ! আচ্ছা মা, এরপর কি হল ?

—যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই হল। বিয়ের পর এক বছরও পার হল না, আমার সব খেলা ফুরলো। তার হাঁপানি এত বেড়ে গেল যে তার চোটেই একদিন সে অক্কা পেয়ে গেল। আর আমার দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করে আমি কাঁদতে বসলাম।

দুর্ভাগ্য আমার পিছু ছাড়ল না। আমার যে অবস্থা ছিল, তাই যদি বরাবর থাকত তা হলে অন্য দুঃখী লোকের মতও অন্তত জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু আমি বোধ হয় গত জন্মে অনেক পাপ করেছিলাম। আমার দুই সৎ ছেলের মধ্যে যে ছোট তার বিয়ে

হয়নি। সে ইস্কুলে পড়ত। ও আমার কোন ব্যাপারে থাকত না। কিন্তু বড় ছেলে ও তার বউ স্বামী বেঁচে থাকার সময় থেকেই আমার ওপর দাঁত কিড়মিড় করেই ছিল। তারা আমাকে সব সময় শাসাত।

এদিকে আমারও ভীষণ জেদ ছিল। আমাকে কেউ চোখ রাঙালে তাকেও দু-কথা শুনিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত আমি শান্তি পেতাম না। যদি আমার পেটে একটু বিদ্যে থাকত তা হলে হয়তো অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে কিছু করতাম। কিন্তু আমার ভাগ্যই যে খারাপ।

বাড়িতে সবসময়ই সকলে আমার দোষ নিয়ে আলোচনা করত। সব সময়ই তারা আমার খুঁত কাড়ত। কেউ আমার সঙ্গে ভাল মুখে কথা বলত না। কথা বলার আগে একচোট গালাগালি দিয়ে রাগের ঝাল মেটাত। কিন্তু আমার বড় ছেলে করমচাঁদ প্রায়ই বউয়ের কথায় আমাকে দু-চার ঘা বসিয়ে দিত।

আমি রাগে দিন কয়েক একনাগাড়ে খাওয়া বন্ধ করে দিতাম। কিন্তু আমাকে খেতে বলবেই বা কে। শেষে খিদের জ্বালায় টিকতে না পেরে আমি খেয়ে নিতাম।

এই ভাবে দুঃখের দিন কাটতে লাগল। আরও কিছুদিন পরে একদিন বাবার অসুখের খবর পেলাম। আমি বাপের বাড়ি যাব বলে তৈরি হলাম।

আমি বেরুব বলে প্রস্তুত হচ্ছি, এমন সময় করমচাঁদ এসে একগাল হেসে, বাবা কেমন আছে জিজ্ঞাসা করল। বলল, বাড়িতে রোজ রোজ যে অশান্তি হচ্ছে সেটা আর ভাল লাগছে না। তুমি যদি চাও তা হলে পাঁচজনকে ডেকে বাড়িটা ভাগ করে নিই।

আমি ওর কথা মেনে নিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে ও চার-পাঁচজনকে নিয়ে এল। তার মধ্যে গ্রামের একজন পণ্ডিতও ছিলেন। একটি কাগজে কী সব লিখে তারা আমাকে টিপসই দিতে বলল। কাগজে কী লিখেছে সেটা শোনাল, বাড়িতে সম্পত্তি ও নগদে মিলিয়ে মোট ষাট হাজার টাকার জিনিসপত্র রয়েছে বলে ধার্য করা হয়েছে। তার মধ্যে কুড়ি হাজার টাকা করে গুরদেই ও করমচাঁদকে দেওয়া হবে। নাবালক ছোট ছেলের জন্য বাকী বিশ হাজার টাকা জমা

রাখা হবে। এ ছাড়া গুরুদেই ও করমচাঁদের বউয়ের যা গহনা আছে তার তিনটা ভাগ হবে। দুভাগ এরা দুজন পাবে আর বাকী ভাগের গহনা ছোট ছেলের বিয়ের জন্য রেখে দেওয়া হবে।

এই কাগজে তারা আমার টিপ ছাপ নিয়ে নিল। উপস্থিত লোকেরা সাক্ষ্য দিল। ওদের কথাতে আমার গায়ে যে-সব গহনা ছিল খুলে দিলাম। ওরা আমাকে বলল, তুমি বাপের বাড়ি থেকে ঘুরে এস, ততদিনে গহনার দামপত্র কত হবে তা ঠিক হয়ে যাবে। আর তোমার সম্পত্তির ভাগও তখন তুমি পেয়ে যাবে।

আমি ওইদিন বিকেলে বাপের বাড়ি রওয়ানা হয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি বাবা বসে বসে পা মালিশ করছেন। ওঁর কাছে একটা কানাকড়িও ছিল না। সমস্ত কিছুই বন্ধু-বান্ধব নিঃশেষ করে দিয়েছিল। পরের দিন বাবা মারা গেলেন। তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করে আমি শ্বশুরবাড়ি ফিরে গেলাম। কারণ আমার সম্পত্তির ভাগটা তো নিতে হবে।

কাল সন্ধ্যাবেলা আমি শ্বশুরবাড়ি ফিরে আসি। টিপটিপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল। ঝড় বইছিল। ঠাণ্ডায় আমি ঠকঠক করে কাঁপছিলাম। শ্বশুরবাড়িতে ফিরে দেখলাম, সারা বাড়ির লোকের চেহারাই যেন বদলে গেছে। আমার ঘরের তালা ভেঙে বাক্সগুলো বার করে নেওয়া হয়েছে। এই দেখে আমি তো ভিরমি খাবার দাখিল। করমচাঁদের বউকে জিজ্ঞাসা করলাম। তা সে মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল, এ-সব জিনিসে তোর আর দরকার কী! তুই যেখান থেকে এসেছিস, সেখানে চলে যা।

মনে হল আমি যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। আমি ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলাম। পাড়ার লোক জমে গেল। করমচাঁদও এল। সঙ্গে জনকয়েক মাতব্বর গোছের লোক। আমি কাঁদতে কাঁদতে তাদের সব কথা বললাম। করমচাঁদের বউ তখন সিন্দুক থেকে কাগজগুলো বার করল। ওই কাগজেই আমি টিপ ছাপ দিয়েছিলাম। ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন এসে কাগজটি পড়ল, তাতে লেখা: আমি আমার স্বামীর সম্পত্তির তৃতীয় ভাগ নিয়ে তীর্থযাত্রায় বার

হচ্ছি। আর এ বাড়ির সঙ্গে আমার আর কোন সম্বন্ধ রইল না।

এই কথা শুনে আমার সারা দেহ জ্বলে উঠল। কিন্তু কেই-বা আমার কথা শুনবে। বাড়ির লোক, এমন-কি, উপস্থিত পাড়ার লোকেরাও আমাকে গালাগালি দিতে লাগল। তারপর তারা এক-এক করে চলে গেল। আমিও গালাগালি ও চেঁচামেচি শুরু করলাম। ঘরের তিনজন রাগে পাগলের মত আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

শেষে আমি যখন বললাম, আমি এখানেই ধরনা দিয়ে পড়ে থাকব, তখন সমস্ত লোকের রাগ আরও চড়ে গেল। ওরা পঞ্চায়েতের লোকজনকেও হাত করেছিল। তাই এক রকম নির্ভয়ে আমাকে মারতে শুরু করল। করমচাঁদের বউ একটা রুটি বেলা বেলুন দিয়ে আমাকে পিটোতে লাগল। আমি জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। ওদের বোধ হয় আমার অবস্থা দেখে ভয় হল। আমার মুখে কাপড় বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে আমাকে মাঠের এক-ধারে ফেলে দিল।

সে সময় প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল। যখন জ্ঞান ফিরে এল, দেখলাম কাপড়চোপড় রক্ত আর বৃষ্টিতে ভেজা। আমি অনেক কষ্ট করে উঠে চলতে শুরু করলাম। কোন রকমে গিয়ে দু-তিনজন প্রতি-বেশীর দরজায় কড়া নাড়লাম, কিন্তু কেউ দরজা খুলল না।

এই সময় আমার মনে হল, আমি বেঁচে থেকে কী করব। এই সময় কুয়োয় ঝাঁপ দিয়ে মরাই ছিল আমার কাছে সবচেয়ে সহজ। আমি গ্রাম থেকে দূরে এক কুয়োর দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। অন্ধকার রাত। আকাশে বিজলীর চমক। সঙ্গে প্রচণ্ড বৃষ্টি। কুয়োটা বেশ দূরে। ঝড়ের প্রচণ্ড বেগ আমাকে যেন উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অন্য দিকে প্রচণ্ড বৃষ্টি আমাকে সামনে এগোতে দিচ্ছে না। এই অবস্থায় এক-পা এগোনোও কঠিন। তা ছাড়া অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না যে কুয়োটা কোন্‌দিকে।

কখনও কখনও যখন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল তখন তার আলোয় রাস্তা অনুমান করে করে আমি চলতে লাগলাম। কিন্তু এমনই আমার দুর্ভাগ্য যেদিকে আমি যাচ্ছিলাম সেদিকে হাওয়ার এমন বেগ,

বৃষ্টির এমন গতি যে আমি এক পাও এগোতে পারছিলাম না। বার বার পিছিয়ে আসতে হচ্ছিল।

এরপরে আমি ঐ জীর্ণ কুটীরের ভিতর গিয়ে জ্ঞান হারালাম। যখন দ্বিতীয়বার হুঁশ এল তখন দেখি আপনার এখানে আমি শুয়ে আছি।

গুরদেইয়ের দুঃখের কাহিনী শুনে বৃদ্ধার হৃদয় বিগলিত হল।

॥ ৩ ॥

পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণের নাম এই গ্রামের বাচ্চা ছেলেরাও জানে। বিশেষ করে গ্রামের তরুণ যুবকেরা তাঁকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করে। তাদের কেউ কেউ বলে, পণ্ডিতজী হাতেমতাই বা রাজা বিক্রমাদিত্যেরই আর-এক অবতার। পণ্ডিতজী সকলের মঙ্গল চিন্তা করেন। যখন কারও কোন মামলা-মকদ্দমা কিংবা ঝগড়াঝাঁটি হয়, তখন লোকে পণ্ডিতজীর কাছেই ছুটে যায়। কেউ যদি পণ্ডিতজীর কাছে নাও আসে পণ্ডিতজী নিজেই তার কাছে ছুটে যান। নিজে থেকেই তাদের মধ্যে মধ্যস্থতার চেষ্টা করেন।

পণ্ডিতজীর কাছে যারা উপকৃত তারা লোকের কাছে বলে থাকে, পণ্ডিতজীর অসীম ক্ষমতা। তিনি অলৌকিক শক্তির অধিকারী। কিন্তু ওঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব যে তাঁকে কোন কাজকর্ম করতে হয় না। নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা নিয়ে মাথা ঘামাতেও হয় না। কিন্তু তাঁর ঘরে 'নয় নিধি' আর 'বারো সিদ্ধি' বাঁধা। পণ্ডিতজী তাঁর তরুণ বয়সে নিজের স্ত্রীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কারণ তিনি মনে করতেন, তাঁর স্ত্রী দুষ্ট এবং নীচ প্রকৃতির। স্ত্রীর এইটুকু দোষ ছিল যে তিনি তাঁর বাড়ির অর্ধেক খাবারদাবার গরিব-দুঃখীদের বিলিয়ে দিতেন। আরও দোষ ছিল যে, একজন পণ্ডিতের পত্নী হওয়া সত্ত্বেও যজমানদের কাছ থেকে নানান ফন্দিফিকির করে বেশ-কিছু আদায় করতে পারতেন না। পণ্ডিতজী মনে করতেন তাঁর

স্ত্রীর আচার-আচরণ পুরোপুরি শূদ্রাণীর মত। কারও কোন সামান্য কষ্ট দেখলেই ছোটলোকদের মত সে সেবা করার জন্য ছুটে যেত। পণ্ডিতজী শেষ পর্যন্ত একদিন দৈববলে জানতে পারলেন, তাঁর বউ গত জন্মে একজন শূদ্রাণী ছিলেন। সেইদিন থেকেই তিনি স্ত্রীর সঙ্গে অসহযোগ শুরু করলেন। তারপর থেকে আর তাঁর মুখদর্শন পর্যন্ত করেননি। বাক্‌চাতুর্যে পণ্ডিতজী বড় নিপুণ। জীবনভোর লেখাপড়া করেও লোকে যে জ্ঞান অর্জন করতে পারে না, পণ্ডিতজী একবর্ণ ক-খ না পড়ে, কোন বইপত্র না ছুঁয়েও সেই জ্ঞান অর্জন করে সর্বজ্ঞ হয়ে গিয়েছিলেন। কার সাধ্য শাস্ত্রজ্ঞানে তাঁকে কাত করে? অবিদ্যার অন্ধকারের দরুন যে দৈবগুণকে লোকে ভুলে গিয়েছিল, পণ্ডিতজীর ইচ্ছা ছিল তাকে একেবারে গোড়া থেকে আবার প্রতিষ্ঠিত করবেন, তাঁর সে ইচ্ছা ফলবতী হতেও চলেছিল।

প্রমাণ হিসাবে খাস শিবের সহচর 'সিদ্ধি-ভবানীর' প্রচার করে বেড়াতেন। আর দেবতাদের চোদ্দ রত্ন মদকে সোমরস জ্ঞানে নিজেও পান করতেন, অন্যকেও সেবন করাতেন। তাঁর কাছে যে-সব লোক আসত তাদের বলতেন, জুয়াখেলাটা কুরু-পাণ্ডবের প্রিয় খেলা। এই বলে তাঁদের জুয়াখেলায় উৎসাহিত করতেন। এই রকম অসংখ্য পরোপকার পণ্ডিতজী নিজের জীবনে করেছিলেন।

সহরের ধনী যুবকদের মাঝে পণ্ডিতজী যখন উপস্থিত হয়ে ধর্ম ও রাজনীতির ওপরে আলোচনা করতেন, তখন শ্রোতারা আহা! আহা! করে উঠত।

আজ পাঠকদের পণ্ডিতজীর এমনিই এক সভা দর্শন করাচ্ছি।

রাত আটটা বেজে গিয়েছে। বেশ ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু পণ্ডিতজীর তেজ ও প্রতাপের সামনে এই ঠাণ্ডা কিছুই না। ঘরের মধ্যে অবশ্য বেশি ঠাণ্ডা ছিল না। কারণ সেখানে এক কোণে একটা উনুন জ্বলছিল। উনুনে মুরগী ও মাছ রান্না হচ্ছিল।

পণ্ডিতজীর সেবকদের দেহে ও প্রাণে ঠাণ্ডা গিয়েই পৌঁছতে পারে না, কারণ মদে তারা চুর হয়ে ছিল।

নটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই সেবকেরা নিজের নিজের জায়গায়

বসলেন। পণ্ডিতজীও নিজের আসনে সমাসীন হলেন। কিছুক্ষণ পরে সেবকেরা পণ্ডিতজীর সেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। একজন তাড়াতাড়ি একটা মদের বোতলের ছিপি খুলে শুভকর্ম শুরু করার জন্য অনুমতি চাইল।

পণ্ডিতজী সকলের দিকে একবার কৃপাদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, বন্ধুরা একটু অপেক্ষা কর। খাজা সাহেব এখনও এসে পৌঁছননি। মনে হচ্ছে, ওঁকে নেমন্তন্ন করা হয়নি। পিছন থেকে একজন বলে উঠল, না, গুরুজী, আমি নিজে দুবার ওঁর বাড়ি গিয়েছিলাম। উনি এখানে আসার জন্য তৈরিই ছিলেন। কিন্তু ঠিক সে সময় এক ভদ্রলোক ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এল। উনি গল্পে মশগুল হয়ে গেলেন। মনে হয় এখনও সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করছেন, এই জন্যই দেরি হচ্ছে, তা না হলে কি আর উনি আসতেন না— ঠিকই আসতেন।

এই সময় বাইরে বুটের মচমচ আওয়াজ শোনা গেল। পণ্ডিতজী তাড়াতাড়ি বললেন, এই যে উনি এসে গেছেন। তাড়াতাড়ি তিনি তাকে অভ্যর্থনার জন্য দৌড়ে দরজার কাছে গেলেন।

খাজা শের খাঁ সাহেব হলেন একজন পুলিশ সাব-ইনসপেকটর। তিন বছর ধরে তিনি এই এলাকার মর্যাদা বৃদ্ধি করে চলেছেন। তিনি ঢুকেই পণ্ডিতজীর সঙ্গে কোলাকুলি করলেন। তারপর দু-জনে নিজের নিজের জায়গায় গিয়ে বসলেন। পণ্ডিতজী এবার বললেন, কী ইনসপেক্টর সাহেব, এত দেরি হল যে? এদিকে আপনার জন্য অপেক্ষা করতে করতে আমার যে চোখ বুঁজে আসার অবস্থা। আর দু-মিনিট দেরি করলেই আজকের সভা ভেঙে দিতাম। আরে মশাই, জেনারেল ছাড়া সোলজারদের কি কোন দাম আছে?

নিজের প্রশংসা শুনে খাজা সাহেব বেশ ফুলে উঠলেন। নিজের পাগড়িটা ঠিক করতে করতে বললেন, বাঃ পণ্ডিত সাহেব, মাশা আল্লাহ! আপনি স্বয়ং হাজির হয়েছেন এটাই যথেষ্ট। আমি তো অনেকক্ষণ আগেই এসে যেতাম। কিন্তু এমন একটা ঝঞ্ঝাটে পড়ে গেলাম যে আসতে দেরি হয়ে গেল।

পণ্ডিতজী এবার খাজা সাহেবের কাছে সরে গিয়ে কানে কানে বললেন, কী, কোন নতুন মুরগী নাকি··· ? খাজা সাহেব মাথা থেকে পাগড়িটা খুলে এক সেবকের হাতে দিলেন। তারপর নিজের টাক মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, হ্যাঁ, খোদা একজন আসামী দিয়েছেন।

বলুন তো, ব্যাপারটা কী ? বেশ-কিছু আমদানি হল নাকি ?

ব্যাপারটা খুবই মামুলি।

—আচ্ছা। আমি ভাবলাম, বোধহয় কোন খুনটুনের কেস।

—তোবা, তোবা। পণ্ডিতজী, আমার কি আর এমনই বরাত ! ছ-মাসে ন-মাসে একটা মোটা মুরগী আসে। যদি রোজ রোজ এই রকম খুনের কেস আসত তা হলে তো আমি সোনার দোলনায় ঝুলতাম।

—কিছু না হলেও অন্তত চার-পাঁচশো টাকার আসামী তো হবেই।

—না-না। মাত্র দুশো টাকা।

—কেসটা কি ?

—কেস হল, পাশের সুলতানপুর গ্রামের জাঠেরা একটা ফেরি চালু করবে ঠিক করেছে।

পণ্ডিতমশাই নিজের গোঁফে তা দিতে দিতে বললেন, আচ্ছা, এখন তো সবে কথাবার্তা বলে গিয়েছে। যদি তাদের কাজ হয়ে যায় তা হলে নিশ্চয়ই আপনার দু হাত ভরে দেবে।

—হ্যাঁ, আমি তো এটাই আশা করছি।

—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। তিনি তো কোন-না-কোন ভাবে মানুষকে দিয়েই যান। খাজা সাহেব, ঈশ্বরের অসীম কৃপা। পাথরের নীচে যে-সব পোকা বাস করে তাদেরও তিনি ঠিক খাবার জুগিয়ে যান। (করমচাঁদ আর খাজা সাহেবের দিকে একটু চেয়ে) ও হ্যাঁ, আজকের এই বৈঠক কেন ডাকা হয়েছে আপনি নিশ্চয়ই জানেন। আমার যজমানই আজকের সব খরচখর্চা করেছে। বড় সজ্জন মানুষ আমার এই যজমানটি। এঁর পরলোকগত পিতার সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা

ছিল। ইনিও খুব দয়ালু ব্যক্তি। একটা হেঁচকি টেনে পণ্ডিতজী বলে ওঠেন, হরি ওঁম্।

খাজা সাহেব হেসে করমচাঁদের দিকে তাকালেন। করমচাঁদ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। ওকে ইসারায় বসতে বলে ইনসপেক্টর সাহেব বললেন, আচ্ছা উনিই তো একটা নারীঘটিত কেসের ব্যাপারে আমার কাছে এসেছিলেন না?

আচ্ছা পণ্ডিতজী, ওই যে মেয়েলোকটি যার কাছ থেকে সম্পত্তি লেখাপড়া করে নিয়ে পরে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হল সে এখন কোথায় কিছু জানেন কি?

পণ্ডিতজী মদের গেলাসটি ইনসপেক্টরের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, না, ঠিক জানি না। তবে শুনেছি, আজ সকালে একজন বোরখাপরা ভদ্রমহিলা তাকে টাঙ্গায় করে কোথায় নিয়ে গেছে। সঙ্গে একজন যুবকও ছিল।

খাজা সাহেব এক চুমুকে গেলাসটি শেষ করে বললেন, কী বললেন? মুসলমানের সঙ্গে গেছে? পণ্ডিতজী বললেন, হ্যাঁ মশাই, হ্যাঁ। এই সময় গ্রামের নম্বরদার জ্বলা সিং বলল, হ্যাঁ সাহেব। আমার ক্ষেতের পাশ দিয়েই তো টাঙ্গাটা গেল। আমি নিজের চোখে দেখেছি। খাজা সাহেব দু নম্বর গেলাস চড়িয়ে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, চুলোয় যাক। যা হয়েছে বেশ হয়েছে। এবার মন ভরে মজলিশটা উপভোগ করা যাক।

তারপর ঝটপট বোতল খোলা হতে লাগল আর গেলাস ভরতি করা হতে লাগল।

পণ্ডিতজী একটুকরো মাছ থেকে কাঁটা বার করতে করতে বললেন, খাজা সাহেব, আপনার বাবুর্চি বেশ পাকা কারিগর। মাছটা দারুণ করেছে। মুখে দেওয়া মাত্র মিলিয়ে যাচ্ছে।

হ্যাঁ, লোকটা আমার কাছে পাঁচ বছর ধরে রয়েছে। ওর বাপও ছিল এক মস্ত বাবুর্চি। আসলে ও মাছ-মাংসটা বেশ ভাল রাঁধে কারণ মেজর বাটন সাহেবের বাবুর্চিখানায় চার বছর কাজ করেছে কিনা!

ধীরে ধীরে সকলেরই নেশা ধরছিল। নেশার ঝোঁকে সকলেই আবোলতাবোল বকতে শুরু করে দিল। পণ্ডিতজী একটু নড়েচড়ে সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, বন্ধুরা, খুবই সৌভাগ্যের বিষয় যে আজ আমরা সকলে একসঙ্গে মিলিত হতে পেরেছি। আর এক প্রেম ও ভালবাসার রাজ্যে এসে পড়েছি। সত্যি কথা বলতে কি, আমি যখন হিন্দু-মুসলমানদের একসঙ্গে বসে খানাপিনা করতে দেখি, তখন আমার মন খুশিতে গদগদ হয়ে ওঠে। ঈশ্বর করুন, সারা ভারতে যেন এমন একটা মৈত্রীভাব গড়ে ওঠে।

খাজা সাহেব বললেন, পণ্ডিতজী, খোদার কসম। এ-সব মদেরই কেরামতি। লোকে বলে, মদ খেলে মতিভ্রম হয়। কিন্তু ব্যাটারা কি করে জানবে, যে এই মদ খেলেই মানুষের মধ্যে প্রেম ও ভালবাসা জেগে ওঠে। পণ্ডিত মশাই বললেন, খাজা সাহেব, ওরা বন্ধুত্বর অর্থই জানে না। ও হ্যাঁ খাজা সাহেব, আপনি একবার আপনার এক বিশেষ ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেছিলেন। আজ আপনাকে এক নতুন উপহার দিচ্ছি।

—কী বলুন তো ?

—ওই যে ঘরে তৈরি মদ। তারপর প্যারা সিং-এর দিকে তাকিয়ে পণ্ডিতজী বললেন, নম্বরদার মালটা নিয়ে আয় তো। রোজই ভাবি খাজা সাহেবকে একবার মালটা চাখাব। নে, তাড়াতাড়ি কর বাবা।

প্যারা সিং-এর পাশে বসেছিল তার ভাগ্নে ধর্না সিং। তার কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে প্যারা সিং বলল, এই ধর্না যা তো, মাসীকে গিয়ে বলবি, ভুষির ঘরের দরজা খুলে চারপায়ের নীচে একটা ছোট ঘড়া আছে। ওটা যেন তোকে বার করে দেয়। ঘড়ার মুখটা আটা দিয়ে বন্ধ করা। দেখিস আবার ঠোক্কর লাগাসনে। যা বাবা, বাঘের বাচ্চার মত এক দৌড়ে গিয়ে নিয়ে আয় তো।

একটু পরে ধর্না ঘড়াটা নিয়ে এসে খাজা সাহেবের সামনে রাখল। খাজা সাহেব আগে থেকেই নেশায় চুর হয়ে ছিলেন। নতুন উপহারটি দেখে খুশিতে তিনি ডগমগ হয়ে উঠলেন। প্রথমেই একটা

আঙুল ডুবিয়ে মদটা একটু চেখে নিলেন। স্বাদটা ভালই লাগল। তারপর দুহাতে অঞ্জলি ভরে চুমুক দিতে লাগলেন। ফের খুশি খুশি মুখে বলে উঠলেন আহা, পণ্ডিতমশাই এ তো দারুণ জিনিস দেখছি।

—আমি কি আপনাকে মিথ্যা বলেছিলাম ?

—আপনি তো এর আগে কোনদিন এমন জিনিস খাওয়াননি ?

—আমার ভয় ছিল আপনি খাবেন কিনা।

—বাঃ পণ্ডিতজী। আমার কাছে ভয়! শপথ করে বলছি আপনাকে নিজের ভাইয়ের মত দেখি। আপনি আমাকে এই জিনিসই এখন থেকে খাওয়াবেন। মাইরি বলছি, দারুণ জিনিস।

রাত বারোটা পর্যন্ত মজলিশ সরগরম হয়ে রইল। মজলিশ যখন শেষ হল তখন কে কী অবস্থায় ছিল, কীভাবেই বা বাড়ি পৌঁছল তা কেউ জানে না।

॥ ৪ ॥

চারিদিকে রাত্রির অন্ধকার নেমে এসেছে। ঠিক এই সময় একটি টাঙ্গা গ্রামের রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছিল। টাঙ্গাটি পথের ধারে পাড়ার যুবকদের এক আড্ডাখানার সামনে এসে থামল। এক মুসলমান যুবক টাঙ্গা থেকে নেমে একজন পথচারীকে জিজ্ঞাসা করল, পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ সাহেবের বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন ?

পথিক জবাব দিল, এই সামনের বাড়ি। তারপর জিজ্ঞাসা করল ওঁকে কী দরকার ?

টাঙ্গায় উপবিষ্ট এক মহিলার দিকে তাকিয়ে যুবক উত্তর দিল, ওঁর সঙ্গে আমার খুব জরুরি দরকার আছে।

তারপর যুবক টাঙ্গা থেকে নেমে মহিলাকে বলল, আসুন বহিনজী, আপনাকে ওঁর বাড়িতে পৌঁছে দিই। মহিলা কোন কথা না বলে যুবকের পিছনে পিছনে চলতে লাগল। একটু পরেই দুজনে পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণের বাড়ির সামনে পৌঁছল। যুবক দরজার কড়া নাড়তেই

ভিতর থেকে রোগামতন একটি ছেলে এসে জিজ্ঞাসা করল, কাকে চাই ?

যুবক জবাব দিল, পণ্ডিত সাহেব বাড়ি আছেন ? ওঁর সঙ্গে একটু দরকার আছে।

—হ্যাঁ, বাড়ি আছেন। কিন্তু এই সময় উনি কারুর সঙ্গে দেখা করেন না। এখন উনি পূজা-আর্চায় ব্যস্ত।

—ঠিক আছে। আমরা নাহয় একটু অপেক্ষা করছি। আচ্ছা, কতক্ষণে ওঁর পূজো শেষ হবে মনে হয় ?

—তা ঘণ্টাখানেক তো লাগবেই।

—আচ্ছা ঠিক আছে। উনি অবসর হলে আমাদের কথা জানাবেন।

আচ্ছা ঠিক আছে। ছেলেটি ভিতরে চলে গেল। প্রায় পৌণে এক ঘণ্টা পরে পণ্ডিতজী বাইরে এলেন। যুবক দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে সেলাম করল।

এসেই পণ্ডিতজী বলে উঠলেন, দরজা থেকে একটু সরে দাঁড়াও। তোমার খেয়াল নেই যে এটা ব্রাহ্মণের বাড়ি।

যুবক নিজের ভুলের জন্য লজ্জা পেল। বলল, মাপ করবেন, সত্যিই আমার বড় ভুল হয়ে গেছে।

যুবক সঙ্গের মহিলাকে দেখে বলল, এই বিবিজি কাল ভোরবেলা গ্রামের বাইরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে ছিলেন। এঁকে আমি ও আমার মা আমাদের গ্রামে নিয়ে যাই। কেননা, সে সময় আশেপাশে কেউ ছিল না। ওঁর অবস্থাও খুব খারাপ ছিল। আল্লার দয়ায় ইনি এখন ভালই আছেন। ইনি আমাদের জানান, যে ইনি লালা মিঠামলের স্ত্রী। বাকীটা ওঁর কাছ থেকেই শুনে নেবেন। যেমন করেই হোক এঁকে আপনি এঁর বাড়ি পৌঁছে দেবেন। সম্পত্তির ওয়ারিশদের সঙ্গেও একটা মিটমাটের ব্যবস্থা করে দেবেন। যদি আপনি এঁর উপকার করেন তা হলে বুঝব আপনার অসীম দয়া।

যুবক ওই মহিলার দিকে তাকিয়ে বলল, বোন, আপনি নিজের মুখেই সব-কিছু পণ্ডিতজীকে বলুন।

যুবকের কথা শুনে পণ্ডিতজী রাগে লাল হয়ে উঠলেন। উনি যুবককে বললেন, ছোকরা তোমার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে তুমি একজন শিক্ষিত লোক। কিন্তু যা বলছ তাতে মনে হচ্ছে, তুমি একেবারে গোমুখ্যু।

যুবক একটু থতমত খেয়ে বলল, পণ্ডিত মশাই, আপনার মত মহাজ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছে আমি সত্যিই অশিক্ষিত। কিন্তু আমি এফ. এ. পাস করেছি। যদি অজান্তে কোন আজেবাজে কথা মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়ে থাকে, তবে তার জন্য মাফ চাইছি।

পণ্ডিতজী হেসে বললেন, ব্যস, আমি বুঝে ফেলেছি। এই ইংরাজী ভাষাটার জন্যই দেশটা উচ্ছন্নে গেল। যদি ইংরাজী না পড়তে তা হলে একজন হিন্দু কন্যাকে বোন বলে ডাকতে সাহস করতে না। নিজের পাশে টাঙ্গায় বসিয়ে, বাড়ি নিয়ে গিয়ে তুলে এ বেচারার জীবনটাও ভ্রষ্ট করতে সাহস পেতে না।

পণ্ডিতজীর কথাগুলো শুনে যুবক একেবারে হকচকিয়ে গেল। ভাবল, আমি এঁকে কী জবাব দেব? কিছুক্ষণ ভেবেচিন্তে সে বলল, আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি আমার প্রতিটি ভুলের জন্য ক্ষমা চাইছি। আপনি দয়া করে এই অভাগিনী মেয়েটিকে এর বাড়িতে পৌঁছে দিন। এর মুখ থেকে আমরা যা-কিছু শুনেছি তাতে আমাদের ধারণা এঁর ওপর অনেক অত্যাচার হয়েছে।

পণ্ডিতজী ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠলেন, না, এ এখন হিন্দুধর্ম থেকে পতিত। একটু চিন্তা করে আঙুল দিয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে বললেন, একে কোন রকমেই···এর অবস্থা দেখে আমার তো যথেষ্টই দয়া হচ্ছে। আমি কাল যখন শুনলাম, এর সৎ ছেলেরা একে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছে তখন থেকে আমি অন্ন জল গ্রহণ করিনি।

তারপর গুরদেইয়ের দিকে তাকিয়ে পণ্ডিতজী বললেন, যা মা, তুই ভেতরে গিয়ে বোস। আমি ওই বদমায়েসগুলোকে ডেকে এখনই সব ব্যবস্থা করছি। তুই কোন চিন্তা করিসনি। একটা হেঁচকি টেনে পণ্ডিতজী বলে উঠলেন, হরি—ও—ম্।

রাগের বদলে পণ্ডিতজীকে দয়ালু হতে দেখে যুবকের চোখে জল এসে গেল। যুবক বিভোর হয়ে পণ্ডিতজীর পা ছুঁয়ে বলল, পণ্ডিতজী, আপনি সত্যিই দেবতুল্য! আমি—

আর-কিছু বলার আগেই পণ্ডিতজী দু-চার পা পিছনে সরে গিয়ে বললেন, উঁহু উঁহু, পা ছুঁয়ো না। তা হলে এই ঠাণ্ডার মধ্যে আবার স্নান করতে যেতে হবে।

যুবক নিজের আচরণে নিজেই লজ্জিত হল। দূর থেকে হাত জোড় করে ঝুঁকে পণ্ডিতজীকে নমস্কার করল। তারপর পিছনে সরে গেল। যাবার সময় গুরদেইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, আচ্ছা, তা হলে ···। সঙ্গে সঙ্গে তার আগের ভুলের কথা মনে পড়ে গেল। আর কিছু না বলে টাঙ্গায় গিয়ে বসল।

কোচম্যান ঘোড়ার পিঠে এক চাবুক বসাতেই রাস্তা দিয়ে টাঙ্গা জোরে ছুটতে লাগল। যতক্ষণ না টাঙ্গা দৃষ্টির বাইরে চলে গেল, গুরদেই সকৃতজ্ঞ দৃষ্টি নিয়ে সেদিকেই তাকিয়ে ছিল।

গুরুদেই বাড়ির ভেতরে চলে গেল। সামনের ঘরের বাঁ দিকে পণ্ডিতজীর পূজার আসন। পণ্ডিতজী পুজোর জন্য ওদিকে যাবার সময় গুরদেইকে বললেন, মা, তুই সামনের পিঁড়িতে বোস। আমি পুজো পাঠ সেরে একটু পরেই আসছি। হরি ওম্।

গুরদেই আড়ষ্ট হয়ে এক কোণে মাটিতেই বসে পড়ল। পণ্ডিতজী পূজা পাঠে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। প্রথমে উনি সন্ধ্যার স্তব পড়তে লাগলেন। ফের গোমুখী হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে মালা জপ করতে লাগলেন। এরপর, ওঁর ধ্যান ভাঙল। উনি উঠে কী একটা মন্ত্র জপ করতে করতে গুরদেইর কাছে উঠে এলেন তারপর খাটের ওপর বসলেন। বললেন, হ্যাঁ মা, বল্, তুই কি বলতে চাস?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, অন্যমনস্ক ভাবে একটা কাঠি দিয়ে মাটি খুঁটতে খুঁটতে গুরদেই খুব ধীরে ধীরে বলল, আপনার কাছে আর কী লুকোবো।

পণ্ডিতজী একটা হেঁচকি তুলে টেনে টেনে সুর করে বলে উঠলেন, হরি—ও—ম্। তারপর পেটে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, হ্যাঁ,

আমাকে রাজারাম (পণ্ডিতজীর চাকর) কাল রাত্তিরেই বলছিল, করমচাঁদ তোকে মারধোর করে ঘর থেকে বার করে দিয়েছে। আমি পুজো-পাঠ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। ওকে জিজ্ঞাসা করারও ফুরসৎ পাইনি। হরি—ওম্।

গুরদেই একটু ঝাঁঝালো সুরেই বলে ওঠে, মনে হয়, আপনার স্মরণ নেই— আমাকে যখন করমচাঁদ মারধোর করে তখন তো আপনি ওখানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। করমচাঁদের কানে কানে কী বলছিলেন।

পণ্ডিতজী আঙুল দিয়ে কান চুলকোতে লাগলেন। যেন কোন্ ভুলে যাওয়া স্মৃতি মনে করার চেষ্টা করছেন।

তারপর বলে উঠলেন, আরে হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক, মনে পড়েছে। শিব শিব। এই দেখ, আমার একদম স্মরণশক্তি কমে গেছে। রাতে রুটি খাই না কী খাই তাও মনে করতে পারি না। ঠিক আছে। ওই সময় আমি পূজা-পাঠের জিনিসপত্র নিয়ে আসছিলাম। তোমাদের বাড়ির কাছে যেই এসেছি অমনি শুনলাম এক কান্নার আওয়াজ। অধম করমচাঁদের কানে কানে বলেছিলাম, এই অবলা মেয়েটার ওপর এত অত্যাচার কোরো না। সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা করে এর ভাগ একে দিয়ে দাও। কিন্তু ওই বদমায়েসটা কাউকেই কেয়ার করে না। আচ্ছা, তারপর ও কী করল?

গুরুদেই পণ্ডিতজীর কাছে পূর্বাপর সমস্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি করল। আবদুল গফুর ও তার মায়ের উদারতা ও উপকারের কথা শুনে পণ্ডিতজী রাগে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে বললেন, তুই ওদের মতলব বুঝতে পারিসনি। ওরা তোর জাত মেরে দিয়েছে। জানি না তোর সঙ্গে আরও কী শয়তানি করার ওদের মতলব ছিল। আমি কাল যখনই শুনলাম যে ওই গ্রামের কোন্ মুসলমান তোকে অজ্ঞান অবস্থায় উঠিয়ে নিয়ে গেছে তখনই আমার প্রাণটা উতলা হয়ে উঠল। এক হিন্দু কন্যার ওপর ম্লেচ্ছদের এতখানি অত্যাচার! আমি তখনই আমার এক চাকরকে ঘোড়ার গাড়ি করে পাঠিয়ে দিলাম। যাবার সময় তাকে বলে দিলাম সে যেন

ওই মুসলমানকে বলে যে মেয়েটিকে যেন এক্ষুনি আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। নয়তো সারা গ্রামের লোক গিয়ে এর একটা বিহিত করবে। ব্যস, ওই কথা শুনেই ওই বদমায়েসগুলো তোমাকে চুপি চুপি এখানে রেখে গেছে। হেচকি টেনে পণ্ডিতজী আবার বলে উঠলেন, হরি—ও—ম্।

এই কথা শুনে গুরদেইয়ের সর্বশরীর যেন জ্বলে উঠল। কি একটা কথা বলতে গিয়ে সে থেমে গেল। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, পণ্ডিতজী, ওকে তো আমিই বলেছিলাম।

—কী বলেছিলে?

—এই কথা যে, আমাকে আমার বাড়ি না পাঠিয়ে পণ্ডিতজীর বাড়ি পাঠিয়ে দাও। আমি ভেবেছিলাম যে আপনি করমচাঁদকে বোঝালে সে আপনার কথা মেনে নেবে।

—ঠিক আছে। ঠিক আছে। তুইও বলেছিলি। আর আমিও খবর পাঠিয়েছিলাম। এই অবস্থায় তোকে না পাঠিয়ে কি ওদের কোন উপায় ছিল?

আচ্ছা ঠিক আছে, যা হয়েছে হয়েছে। এখন বল্, তুই কী চাস?

—পণ্ডিতজী, আমাকে আমার সম্পত্তির ভাগটা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিন।

—কিন্তু তুই যদি আগের মতন বাড়িতে একসঙ্গেই থাকিস, তা হলে ক্ষতিটা কি?

—ওরা আমাকে একদণ্ডও ওখানে তিষ্ঠতে দেবে না।

কিছু চিন্তা করে পণ্ডিতজী আবার বললেন, আচ্ছা, তুই ওপরে বসার ঘরে গিয়ে বোস। আমি এক্ষুনি ওকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

গুরদেই মাথা নিচু করে ওপরের ঘরে উঠে গেল। পণ্ডিতজী রামনাম লেখা নামাবলীটা কাঁধে জড়িয়ে খড়ম পায়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

॥ ৫ ॥

একটু পরে লালা করমচাঁদের বাড়িতে এক সভা বসল। এই সভার মধ্যমণি হলেন, আমাদের পণ্ডিতজী মহারাজ।

দিত্যামল চৌধুরী সাহেব হুঁকোয় একটা টান দিয়ে একটু কেশে বললেন, হ্যাঁ ভাই করমচাঁদ, ওই মামলাটার কী হল? করমচাঁদ পাগড়িটা ঠিক করতে করতে বলল, চৌধুরীমশাই, মামলার দফারফা তো আপনার সামনেই হয়ে গেল। আজ পণ্ডিতমশাই আবার নতুন খবর এনেছেন। এটাও শুনে নিন।

এর মধ্যে পণ্ডিতজী লম্বা একটা ঢেকুর তুলে হরি ওম্ বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। তারপর বললেন, চৌধুরীমশাই, কী আর বলব! বলার আর কীই-বা আছে! এখন তো ঘোর কলি। আমি তো রোজ দুবেলাই ভগবানের কাছে হাতজোড় করে বলি, প্রভু এতখানি বয়স পর্যন্ত তো শান্তিতে ধর্মকর্ম করে কাটালাম। যেন এই-সব অনাচার অনাসৃষ্টি দেখার আগেই ভগবান আমাকে দুনিয়া থেকে ছুটি দিয়ে দেন। কিন্তু জানি না, ভাগ্যে কী লেখা আছে। ঢেকুর তুলে হরি—ও—ম্ বলে কথাটা শেষ করলেন।

সবাই নতুন খবর শোনবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। সোরগোল উঠল, বলুন, বলুন।

পণ্ডিতজী একটু রাগত স্বরে বললেন, আরে ভাই, আমি কী বলব! এ-সব তোমাদের পাপেরই প্রতিফল! দিন দিন তোমরা ধর্মকর্ম থেকে দূরে সরে যাচ্ছ। পুজো-পাঠে মন দিচ্ছ না। কুকর্মে লিপ্ত থাকছ। এই অবস্থায় পৃথিবীতে এমন অনাচার-অত্যাচার হবে না তো কী হবে? শিব শিব শিব!

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পণ্ডিতজী করমচাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ও ভাই ভালমানুষের পো, আমি একবার নয় হাজার বার তোমাকে বলেছি ওই নীচ মেয়েমানুষটাকে মাথায় তুলো না। ওকে একটু চোখে চোখে রাখ। শেষ পর্যন্ত যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই হল তো। ওই কুলটা মুসলমানের ঘরে গিয়ে উঠেছে। ঈশ্বর সাক্ষী, যখন থেকে কথাটা কানে এল, তখন থেকে প্রাণটা শুকিয়ে উঠেছে।

আমরা যেখানে রয়েছি সেখানে এত বড় একটা কাণ্ড ঘটল কী করে। আমাদের নিজেদের ওপরেই এজন্য ধিক্কার দেওয়া উচিত। হরি ওম্।

সমাজের প্রতি পণ্ডিতমশাইয়ের এই দয়া ও উদারতা দেখে সভায় সকলে সমস্বরে বলে উঠলেন, ধন্য, ধন্য!

এরপর পণ্ডিতজী করমচাঁদ ও মোহনলালের দিকে তাকিয়ে বললেন, আজকালকার ছেলে-ছোকরাদের বুদ্ধিশুদ্ধি একদম নেই। যা মুখে আসে তাই বলে ফেলে। যত-সব মূর্খের দল। আর তুমি যদি আগে আমায় একবার জিজ্ঞাসা করে নিতে তা হলে ক্ষতিটা কী ছিল? এই ব্রাহ্মণ তো আর তোমার শত্রু নয়। তোমার পূর্বপুরুষের নুন খেয়েই আমি বেঁচে আছি। যদি কোন ভাল বুদ্ধি নাও দিতে পারি, খারাপ বুদ্ধি দেব না। আচ্ছা ভাই, এই-সব ঝগড়ার মধ্যে গিয়ে আমার লাভ কী! তোমাদের যা মনে আসে তাই কর, আমি শুধূ শুধূ এর মধ্যে মাথা গলাতে যাই কেন! বলতে বলতে পণ্ডিতজী হাঁটুতে হাত রেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর বাইরে যাবার জন্য তৈরি হলেন।

এই দেখে সভার সকলেই বিচলিত হয়ে উঠল। সকলে পণ্ডিত-মশাইকে ঘিরে দাঁড়াল। সমস্বরে সকলে মিনতি করতে লাগল, না মহারাজ, বসুন মহারাজ, কথাটা শুনুন, রেগে যাচ্ছেন কেন? কেউ কেউ পণ্ডিত মশাইয়ের পায়ে মাথা কুটতে লাগল। কেউ পণ্ডিতমশাইয়ের হাতের ছড়িটা নিয়ে তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়াল। উপায় না দেখে পণ্ডিতজী বসে পড়লেন। করমচাঁদ গলবস্ত্র হয়ে পণ্ডিতজীর পায়ে পড়ল। বিড়বিড় করে বলে উঠল,. মহারাজ আমাদের ইজ্জৎ আপনার হাতে। আজকের ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি করে যান। তা না হলে আমাদের আত্মীয়স্বজন আর আমাকে টিঁকতে দেবে না।

পাশের থেকে একজন তাড়াতাড়ি বলে উঠল, হ্যাঁ মহারাজ, এ বেচারার বড় বদনাম হচ্ছে।

সভার লোকজনের মধ্যে মুনশী দেবীদয়ালের ছেলে মোহনলালও বসে ছিল। কিছুদিন হল ও ডি. এ. বি. কলেজ ছেড়ে বাড়ি চলে

এসেছে। সে বলল, পণ্ডিতমশাই, সত্যি এটা উপকারের কাজ। আপনার মত মহাপুরুষের অসীম কৃপার ফলেই একমাত্র এই ধরনের একটা বিশ্রী সমস্যার সমাধান হতে পারে। আপনি যদি নিজে উদ্যোগী হন তা হলে ওই মহিলা আবার ফিরে আসতে পারে।

—কী বললে? সে কী? ফিরে আসতে পারে?

পণ্ডিতমশাই পঞ্চায়েতের দিকে তাকালেন। তারপর করমচাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই মূর্খের বুদ্ধিটা একবার দেখেছ। আর্যরা কি তোকে এই শিক্ষা দিয়েছে। বাবা, যত বড় মুখ তত বড়ই তো কথা বলা উচিত। বড়দের মধ্যে কথা বলার তোর কী দরকার?

এরপর সকলেই মোহনলালকে ধিক্কার দিতে লাগল। মোহনলাল আর থাকতে পারল না। সে বলে উঠল, মাপ করবেন পণ্ডিতমশাই, আমি তো কোন খারাপ কথা বলিনি। ওকে যদি আবার বাড়িতে ফিরিয়ে নেওয়া হয় তা হলে ক্ষতিটা কী? বেচারা বালবিধবা। যদি করমচাঁদ ওর দেখাশোনা না করতে পারে তা হলে একজন সুপাত্র দেখে—

এইবার পণ্ডিতজীর রাগ চারগুণ হয়ে গেল। উনি রাগের চোটে কথার মাঝখানেই বলে উঠলেন, ব্যস ব্যস হয়েছে। এই রকম ম্লেচ্ছ ভাষা আর দুবার মুখ থেকে বার কোরো না। ভাই সাবান দিয়ে চান করালেই কি গাধা কখনও গোরু হয়। হিন্দুধর্মে বিধবা-বিবাহের কথা ব'লে এই পবিত্রজাতিকে কলঙ্কিত করার সাহস তোমার কী করে হল?

পণ্ডিতমশায় দুহাতে মাথা চাপড়ে বলে উঠলেন, ভাই-সব, অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। এই আর্য সমাজীরা তো ভারতবর্ষের সর্বনাশ করে দিল। হরি ওম্।

মোহনলাল আবার বলল, আচ্ছা মহারাজ, আপনার কথামত গাধা যদি গোরু না হতে পারে তা হলে গোরু কি গাধা হতে পারে।

এই সময় বেশ কিছু লোক রেগেমেগে মোহনলালকে নিয়ে পড়ল। তাকে চুপ করিয়ে দিয়েই ওরা শান্ত হল।

লালা কানাইয়ালাল বলল, ছেলেরা, এখানেই ক্ষান্ত দাও। বেশি

কথা বলা তোমাদের শোভা পায় না। একজন ভালমানুষের বিধবা সম্বন্ধে এরকম আজেবাজে কথা বলতে তোমাদের লজ্জা হওয়া উচিত। আর তোকেও বলি মোহনলাল, তুই তো লেখাপড়া শিখেছিস। তোরা কি এইটা জানিস না আমাদের শাস্ত্রে কী বিধান দেওয়া আছে? তারপর পণ্ডিতমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, ঠিক আছে পণ্ডিতমশাই, আপনি নিজের কাজ করে যান। এদের কথায় কান দেবেন না। আচ্ছা বলুন, এর কী ব্যবস্থা করা যায়।

করমচাঁদ বলল, পঞ্চায়েতের মাতব্বর মশাইরা, আমার এক নিবেদন আছে। ও যদি নিজের ইজ্জত বাঁচিয়ে এখানে থাকতে চাইত তা হলে কি আমাদের বাড়িতে কোন জিনিসের অভাব ছিল! কিন্তু আমি তো বেশ কিছুদিন ধরেই দেখতে পারছিলাম, ওর মতিগতি সুবিধের না। ও যতদিন থাকতে চেয়েছে আমার কাছেই ছিল। যা চেয়েছে তাই করেছে। আমরা মনে মনে ভাবলাম, আমাদের আর করার কী আছে। যেমন কর্ম করবে তেমন ফলভোগ করবে। ও তো আমাদের পূর্বপুরুষের ইজ্জত নিয়ে এখন খেলা করছে। আপনারাই বলুন, এ-সব কথা কি কাউকে বলা যায়? আমি অনেক কিছু বরদাস্ত করেছি। বলুন, আর আমার কী করার ছিল? ওকে শুধু দড়ি দিয়ে বেঁধেই রাখিনি। আপনারা জানেন এর পরে ও নিজের মুখে চুনকালি মাখিয়ে বাড়ি থেকে চলে যায়।

চারদিক থেকে আওয়াজ উঠল, ঠিক হয়েছে। ঠিক হয়েছে। এ বেচারার প্রাণ একেবারে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। অথচ এ ওই মেয়েছেলেটির জন্য যা করেছে তা নিজের পেটের ছেলেও করে না। মেয়েটির কপালই মন্দ, এরজন্য কাউকে দোষ দেওয়া যায় না।

পণ্ডিতমশাই একটু ভেবে বললেন, এবার কী করা যায়।

বাবা রাধা সিং মাথার পাগড়িটা একটু পিছনে হটিয়ে বলল, কী আর করবেন! যে ধর্মচ্যুত হয়েছে, গ্রাম ত্যাগ করে গেছে, বাড়ি থেকে বেড়িয়ে গেছে, অমন নীচ প্রকৃতির মেয়েমানুষের জন্য আর কী করা যেতে পারে। ও যেখানে আছে সেখানেই থাকতে দিন। ও নিজের কর্মফল নিজেই ভোগ করবে।

সকলে সমস্বরে বলে উঠল, বাবাজী লাখ কথার এক কথা বলেছেন।

পণ্ডিতমশাই বললেন, ওই কুলটাটা যেখানে আছে সেখানেই পড়ে থাকুক— আমিও এর পক্ষপাতী। আর এ ছাড়া কীই-বা করা যেতে পারে। আচ্ছা ভাই, করমচাঁদ, তোমার কী ইচ্ছা তাই বল! হরি ওম্।

করমচাঁদ হাতজোড় করে বেশ খুশিতে বলে উঠল, মহারাজ, আপনার যা মত আমারও তাই মত। আপনি আমাদের থেকে অনেক বড়। ও আর কখনও এ বাড়ির ছায়া মাড়াতে পারবে না। মহারাজ, গাছ থেকে পড়া ফুল আর ভাঙা মন এ দুটো জোড়া দেওয়া অসম্ভব ব্যাপার।

করমচাঁদকে সকলেই সমর্থন জানাল। সকলে পণ্ডিতজীর উদারতা আর করমচাঁদের বুদ্ধির বড়াই করতে করতে উঠে চলে গেল। পণ্ডিতজী, হরি ওম্ ব'লে সবশেষে নিজের জায়গা ছেড়ে উঠলেন।

করমচাঁদ যাবার সময় পণ্ডিতজীর হাতের মুঠোয় চুপচাপ কিছু রুপোর মুদ্রা গুঁজে দিয়ে বললে, মহারাজ আমার ওপর একটু দয়া দৃষ্টি রাখবেন।

পণ্ডিতজী ভরা মুঠিটা পকেটে ঢোকাবার চেষ্টা করলেন। আর-একটি হাত দিয়ে করমচাঁদের কাঁধ ধরে বললেন, হ্যাঁ, সত্যি আমি যে কথা বলেছিলাম···।

হ্যাঁ, পণ্ডিতমশাই, আমি তক্ষুনি খাজা সাহেবের কাছে গিয়েছিলাম। প্রথমে তো উনি রাজি হননি! তারপর রাজি হলেন।

—ভালই হল। কিন্তু কত লাগল?

—পঞ্চাশ টাকা নগদ দিয়ে এসেছিলাম। আর বলেছিলাম মামলা মিটলে বাকী পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দেব।

—তার মানে কাজটা ভাল ভাবেই হয়ে গেল?

—হ্যাঁ পণ্ডিতমশাই, সবই আপনারই দয়া। তা না হলে···।

এরপর পণ্ডিতমশাই আশীর্বাদ বিতরণ করে ছড়ির খটখট আওয়াজ তুলে বাড়ির দিকে চললেন। বাড়ি ঢোকার আগে তিনি কার

কার বাড়িতে গেলেন আর তাদের সঙ্গে কী কথাবার্তা বললেন, তা ঈশ্বরই জানেন।

॥ ৬ ॥

গুরদেই চিন্তার সমুদ্রে ভাসছিল। পণ্ডিতজী ঠিক এই সময় ঘরে ঢুকলেন। এ-কথা সে-কথার পর পণ্ডিতজী বললেন, মা, তোর জন্য আজ সারা শহর ঘুরেছি। পঞ্চায়েত ডেকেছি। যার মুখ কখনও দেখতে চাইনি, তার চরণ দর্শন করতে হয়েছে। কিন্তু ভগবানই জানেন, তিনি এদের কীভাবে বুদ্ধিনাশ করেছেন। ওরা আমার একটি কথাও শোনে না। হরি ওম্। গুরদেই শ্রদ্ধার সঙ্গে পণ্ডিত-মশাইয়ের পায়ে হাত দিয়ে বলল, পণ্ডিতমশাই, আমার মত হত-ভাগিনীর কষ্ট আপনি যদি দূর না করেন তা হলে আর কে করবে।

—কিন্তু মা, আমার মনের ইচ্ছে তো সফল হবে না বলে মনে হচ্ছে।

—কেন পণ্ডিতমশাই ?

করমচাঁদ তো কোন কথাই শুনছে না। ও বলছে তুই নাকি ওদের সব লেখাপড়া করে দিয়েছিস ? করমচাঁদ এও বলছে যে তুই ওদের কোন ক্ষতি করতে পারবি না।

গুরদেই নিরাশার হিমশীতল নিশ্বাস নিয়ে বলল, আত্মীয়-স্বজনরা কি বলল ?

—মা, আত্মীয়-স্বজনদের আর কীই-বা করার আছে। ওঁদের দিয়ে কি জবরদস্তি করে কিছু করানো যেতে পারে ? একি সরকারী আদালত, যে যা ইচ্ছা তাই করে নাও।

—এখন আমি কী করব পণ্ডিতমশাই।

কিছুক্ষণ ভেবে পণ্ডিতজী বললেন, কী যে বলি মা, কিছুই বুঝতে পারছি না। সমস্যাটা বড় জট পাকিয়ে গিয়েছে। কেস করলেও মনে হয় কিছু লাভ হবে না। আর এর জন্য টাকাপয়সাও দরকার।

—কত খরচ হবে ?

—কম পক্ষে তিনশো টাকা তো চাই-ই চাই।

নিজের হাতের বালার দিকে তাকিয়ে গুরদেই বলল, এর দাম কত হবে পণ্ডিতমশাই ?

পণ্ডিতজী লুব্ধ দৃষ্টিতে বালার দিকে তাকিয়ে বললেন, তা বিক্রি করলে মনে হয় দেড়শো দুশো টাকা পাওয়া যাবে।

গুরদেই নিরাশ হয়ে গেল।

পণ্ডিতজী সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, মা, তুই কিছু চিন্তা করিস না ; যত টাকা কম পড়বে আমি নিজের কাছ থেকেই দিয়ে দেব।

গুরদেই হাত থেকে বালাজোড়া খুলে পণ্ডিতজীর পায়ের সামনে রেখে দিল। তাঁর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে বলল, আমি এখন আপনার আশ্রয়ে রয়েছি। আপনিই আমাকে উদ্ধার করতে পারেন।

পণ্ডিতজী ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, মা ভগবানই তোকে সাহায্য করবেন। আমি আজ থেকে এই কেসের দায়দায়িত্ব নিজের মাথায় নিচ্ছি। তুই বিশ্বাস রাখ, ভগবানের দয়ায় তুই এই কেসে জিতবিই জিতবি। হরি ওম্। হ্যাঁ আর-একটা কথা শোন্, তুই, যদি এখানেই থাকিস, তা হলে হয়তো কেসটা বিগড়ে যেতে পারে।

কিন্তু পণ্ডিতমশাই, আমি যাব কোথায় ? যদি আপনি বলেন, তা হলে আমি বাপের বাড়ি চলে যাচ্ছি। কিন্তু ওখানেও তো আমার কেউ নেই। হ্যাঁ, মাথা গোঁজবার মত একটা বাড়ি আছে যদিও।

—না, মা, তুই কোন চিন্তা করিস না। শিয়ালকোটে আমার এক বন্ধু থাকে। তুই যদি চাস তো তার কাছেই আমি তোকে পাঠাতে পারি।

—মহারাজ, আমি আপনার আশ্রয়ে আছি। আপনি যেরকম বলবেন, আমি সেইরকমই করব।

পণ্ডিতজী বালা দুটো উঠিয়ে পকেটে রেখে বললেন, মা, আমি এগুলোর ব্যবস্থা করে আসি। তুই খাওয়াদাওয়া করে বিশ্রাম নে। কোনরকম চিন্তা করিস না।

—মহারাজ, আপনারা থাকতে আমার আর চিন্তাই বা কি। আপনি তো নিজেই আমাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছেন। আপনার উপকারের ঋণ আমি কখনও শোধ করতে পারব না।

পণ্ডিতজী, হরি ওম্ ব'লে নীচে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে একটা ছেলে গুরুদেইয়ের জন্য থালায় করে খাবার নিয়ে এল। সামান্য কিছু খেয়ে সে চারপাইয়ের ওপর শুয়ে পড়ল।

চিন্তায় বেশ কিছুক্ষণ ওর ঘুম এল না। সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজে সে বার বার উঠে বসছিল। এর মধ্যে পণ্ডিতজী একজন স্বাস্থ্যবান যুবককে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। গুরদেইকে বললেন, মা, আমার মত হল, আমার এই বন্ধুর সঙ্গে শিয়ালকোট চলে যা। তোর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ইনিই করবেন। তোর কোন অসুবিধে হবে না।

গুরদেই কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে পণ্ডিতজীর দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার উপকার কখনও ভুলব না। সে যাবার জন্য তৈরি হতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে সে ওই স্বাস্থ্যবান যুবকের সঙ্গে রেলগাড়িতে উঠে যাত্রা করল।

॥ ৭ ॥

গুরদেই শিয়ালকোট পৌঁছল। শিয়ালকোটে পৌঁছবার কিছু-দিনের মধ্যেই তার জীবন-নাটকে নতুন দৃশ্যের অবতারণা। যে পণ্ডিতজীকে দেবতা জ্ঞানে পুজো করত সেই পণ্ডিতমশাই ছিলেন ভেতরে ভেতরে এক কাল সাপ। তিনি গুরদেইয়ের গহনাগাঁটিগুলো আত্মসাৎ করে ফেললেন। তারপর তারাচাঁদ নামে এক যুবকের কাছে গুরদেইকে বিক্রি করে দিলেন। যে লোক তাকে শিয়াল-কোটে নিয়ে এসেছিল সে পণ্ডিতজীর লোক। সব বুঝতে পেরে গুরদেই তার দুর্ভাগ্যের জন্য কপাল চাপড়াতে লাগল। ও আর কীই-বা করবে। তারাচাঁদ তাঁকে এমন জিনিসের লোভ দেখাল যে লোভে পড়ে গুরদেই সব-কিছু খুইয়ে নিঃস্ব হয়ে বসল।

তারাচাঁদ সামান্য লেখাপড়া জানত। এক সরকারী অফিসে সে কেরানীর কাজ করত। মাইনে পেত ত্রিশ টাকা।

গুরদেইকে ও বলেছিল তার বাড়ি গুজরাওয়ালেতে। কিন্তু বাপের দুর্ব্যবহারের জন্য আর বাড়ি যায় না। দেশে বহু টাকার সম্পত্তি পড়ে রয়েছে। কিন্তু এই মিথ্যে কথাটা বেশি দিন চাপা রাখা গেল না।

কিছুদিন পরেই তারাচাঁদের সব কু-কীর্তির কাহিনী চারিদিকে ফাঁস হয়ে গেল। একদিন তারাচাঁদের মায়ের লেখা একটি চিঠি গুর-দেইয়ের হাতে পড়ল। তারাচাঁদ তখন বাড়ি ছিল না। গুরুদেই লোক দিয়ে চিঠিটা পড়িয়ে নিল। মা লিখেছে, 'বাবা, আমি বহু পরিশ্রম করিয়া নিজের পেট কোনরকমে চালাইতেছি। তুমি আমাকে একটি পয়সাও পাঠাও না। শুনিলাম, তুমি কোন এক মেয়েমানুষকে ভাগাইয়া লইয়া আসিয়াছ। বাবা এই-সব কথা কিন্তু মোটেই ভাল নয়।'

চিঠিতে আরও অনেক কিছু লেখা ছিল। কিন্তু গুরদেই আর-কিছু শুনতে পারল না। তার মাথা ঘুরতে লাগল। বাপের বাড়ি কিংবা শ্বশুরবাড়ি, কোথাও তার জায়গা নেই। তার ওপর সে একেবারে মুখ্যু— পেটে একদম বিদ্যে নেই। অন্যলোকের কথা শুনেই এতদিন চলে এসেছে— ভাল-মন্দ বিচার করেনি।

শেষ পর্যন্ত গুরদেইয়ের মনে হল, এই অবস্থায় তার আর এখানে থাকা একদম উচিত নয়। কোথাও-না-কোথাও তার এক টুকরো রুটি জুটেই যাবে। কিন্তু ও তখন বোঝেনি, দুর্ভাগ্য তার পিছু নিয়েছে। তার নিষ্কৃতি নাই।

দুর্ভাগ্যই বলা যেতে পারে—সরকারী অফিসে ছাটাই হল। তারা-চাঁদের কাজও গেল ওই সঙ্গে। এদিকে গুরদেই অসুস্থ। সে চারপাইয়ের ওপরে শয্যাশায়ী।

যে গুরদেইয়ের প্রেমে কিছুদিন আগে পর্যন্ত তারাচাঁদ পাগল ছিল, সেই গুরদেই এখন তারাচাঁদের দু-চোখের বিষ। কিন্তু তারাচাঁদ গুরদেইয়ের জন্য কোন ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করল না।

প্রতিদিনই দু-জনের মধ্যে তুমুল ঝগড়া বাধতে লাগল।

এখন গুরদেই চুপচাপই থাকে। ওর আর কিছুই ভাল লাগে না। ওর মনে হত লাগল, কপালে না জানি আরও কত দুঃখ লেখা আছে। যার বর্তমানই অন্ধকার তার আবার ভবিষ্যৎই বা কি? এই ভেবে সে কেঁপে কেঁপে উঠত। গুরদেই ভাবতে লাগল পাপের এই বোঝা নিয়ে সে কোথায় যাবে। জীবনের বাকী দিনগুলো কোথায় কীভাবে কাটাবে? অন্ধকার হৃদয়ের ভেতর থেকে একটি মাত্র জবাব সে যেন পাচ্ছিল কোথাও কিছু আশা নেই।

শেষ পর্যন্ত সেদিনটি এল। যে দিনটিকে ও সবচেয়ে বেশি ভয় করে আসছিল। প্রচণ্ড জ্বরের কষ্টে ও চোখ খুলতে পারল না। ওই অবস্থায় সে বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকল। কিন্তু তবু তার জ্বর কমার লক্ষণ দেখা গেল না।

একদিন রাতে সে পিপাসায় ছটফট করছিল। কিন্তু জল দেবার কেউ ছিল না। তারাচাঁদ বহুদিন এ বাড়িতে আর ঢোকে না। ওর এখানে ফেরবারও কোন আশা ছিল না। বাড়ি থেকে বেরোবার আগে ও বলে গিয়েছিল, আমার জন্য তোকে ভাবতে হবে না। তুই মরিস আর বাঁচিস এ-সব নিয়ে আমিও আর মাথা ঘামাব না। আমি তো আর কোন হাসপাতাল খুলে রাখিনি। নিজেই বলে না খেয়ে মরছি, তোকে আমি কি করে দেখি। আমি আর-কোথাও গিয়ে নিজের দুটো রুটির সংস্থান করে নিতে পারব। তোকে নিয়ে তো আর দুর্ভোগ পোহাতে হবে না।

গুরদেই যখন অচৈতন্য হয়ে পড়ে ছিল, ঠিক সেই সময় তারাচাঁদ বাড়ির দামি জিনিসপত্রগুলো নিয়ে বাড়ি ছেড়ে সরে পড়ল।

সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, গুরদেই যে পাড়ায় থাকত সেখানে কাছে-পিঠে আর কোন হিন্দুর বাড়ি ছিল না।

জ্ঞান ফেরার পর গুরদেই চারপাই থেকে কোনরকমে উঠল। পিপাসায় সে তখন অর্ধমৃত। কোন রকমে জলের ঘড়ার দিকে সে হাত বাড়াল। কিন্তু তাতে জল ছিল না।

গেলাসে সামান্য নোংরা জল পড়ে ছিল। গুরদেই সেই নোংরা

গেলাস মুখে তুলল। কিছুটা জল মুখ বেয়ে উপছে পড়ল।
কিন্তু তার দেহ তখন এত তুর্বল যে সে আর উঠতে পারল না। আবার সে জ্ঞান হারাল। ভগবান জানেন, কতক্ষণ সে এমন অবস্থায় পড়ে ছিল।

॥ ৮ ॥

আশ্বিনের রোদ-ঝলমলে এক সকালে রোডু কলন্দর বাঁদর-খেলা দেখিয়ে বাড়ি ফিরল। ওর ঝোলার ভেতর রয়েছে তু-চার টুকরো রুটি ও কিছু আটা। একটা ছেঁড়া কম্বল, মাটির তুটো কাপ। তুটি থালা। একটি ঝোলা। এই তার মোটমাট সম্পত্তি। আত্মীয়-স্বজন বলতে ওই বাঁদরগুলো ছাড়া ওর আর তুনিয়ায় কেউ ছিল না। ও যখন খুব ছোট তখন ওর মা-বাবা একসঙ্গে প্লেগে মারা যায়। ওর একটি চোখ কাণা— তাই বিয়েও করতে পারেনি।

রোডুর বয়স ষাটের ওপরে, কিন্তু সাংসারিক মায়া-মমতা কী তা ও এখনও জানে না। যখন কেউ জিজ্ঞাসা করে—রোডু তুমি কি কাউকে ভালবাস, তখন সে কথাটার মানে বুঝতে পারে না। উত্তরে ও শুধু হাসে। ওর বিশ্বাস মানুষ জন্মায় তারপর একদিন মরে যায়। এই তুয়ের মধ্যে আর কিছু নেই। হ্যাঁ, ভগবান ও নিজের গুরুর ওপর ওর অসীম শ্রদ্ধা। সে অচ্ছুত। নীচ বংশে তার জন্ম। কিন্তু তৎসত্ত্বেও নিজেকে সে একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু বলেই মনে করে।

রুটি ও আটার ঝোলাটা কাঁধ থেকে নামিয়ে নিজের জীর্ণ কুটীরের একটা পেরেকে সে টানিয়ে দিল। বাঁদরীটাকে বাঁধা ও খোলার তার কোন ঝামেলাই নেই। ও তার জীবন-সঙ্গিনী। রোডুর সঙ্গেও বাঁদরীটির গভীর ভাব। বাঁদরীটি বটগাছের শান্ত ছায়ায় শুয়ে পড়ল। রোডু আঙুল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। ঘামে ভেজা ছেঁড়া ফতুয়া ছেড়ে রোডুও শুয়ে পড়ল।

ঠাণ্ডা হাওয়ায় তার গায়ের ঘাম শুকিয়ে গেল। তারপর তার ভাঙা কাপে করে একটু জল নিল। থলের ভেতর হাতড়িয়ে গুড়ের টুকরোটা খুঁজতে লাগল। গুড়টাকে পাথর দিয়ে ভেঙে শরবত তৈরি করল সে। অর্ধেকের বেশি শরবত অন্য একটি কাপে ঢেলে বাঁদরীটিকে একবার দেখে নিল।

বাঁদরীটি এরই অপেক্ষায় ছিল। সে এক লাফে এগিয়ে গেল। তারপর নিমেষের মধ্যে কাপটা খালি করে আবার নিজের জায়গায় গিয়ে বসল।

কিছুক্ষণ পরে কয়েকটি কুকুর এসে ওই জায়গায় ভিড় জমাল। রোডু থলির থেকে কয়েকটি রুটির টুকরো বার করে কুকুরগুলোর দিকে ছুঁড়ে দিল। রুটি শেষ। থলিতে শুধু একটু আটা পড়ে রইল। রোডু এবার থলিটি পেরেকে টাঙিয়ে রেখে শুয়ে পড়ল।

ভেবেছিল, আজ ও দেরিতে রান্না চড়াবে। শোবার সঙ্গে সঙ্গে ও ঘুমিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে ও পাশ ফিরল। একটু চোখ খুলেই আবার শুয়ে পড়ল সে। এক মিনিট পরেই ও জেগে উঠে পড়ল। তারপর ও কিছু শোনার চেষ্টা করতে লাগল। বেশ স্পষ্ট আওয়াজ শুনতে পেল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল— আওয়াজ লক্ষ্য করে এগিয়ে চলল।

মনিবকে এই অবস্থায় দেখে বাঁদরীটাও তার পিছু নিল।

যেতে যেতে একটা ঝোপের কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল সে। আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছিল যেন কোন নবজাতক শিশুর কান্না। ঝুঁকে পড়ে ঝোপটা সে দেখতে লাগল। লাল রঙের কিছু একটা ওর চোখে পড়ল। ও এগিয়ে গেল। ছেঁড়া লাল রঙের কাপড়ে জড়ানো একটি শিশু। শিশুটি বেশ জোরে জোরে কেঁদে চলেছে।

বাচ্চাটির এই অবস্থা দেখে রোডুর হৃদয় গলে গেল। কিছু না ভেবে-চিন্তেই সে বাচ্চাটিকে কোলে উঠিয়ে নিল। বাইরে তখন বেশ পরিষ্কার আবহাওয়া কিন্তু অপরাহ্নের ঠাণ্ডা বাতাস লেগে বাচ্চাটি ঠকঠক করে কাঁপছিল। ঠোঁট দুটি বার বার লাল হয়ে উঠছিল।

রোডু এবার বেশ ঘাবড়ে গিয়ে ভাবতে লাগল, এই শিশুটিকে নিয়ে সে এখন কী করবে— কোথায় একে রাখবে। বাঁদররা বাচ্চা খুব ভালবাসে। বাঁদরীটি তাই রোডুর হাত থেকে বাচ্চাটিকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করছিল। রোডু বাঁদরীটাকে দূরে সরিয়ে দিল। তারপর কিছু নরম ঘাস জোগাড় করে বাচ্চাটিকে তার মধ্যে লুকিয়ে রাখল। ভাবল, বেড়ালের বাচ্চার মত এই ছোট্ট শিশুটির পেটে হয়তো কতদিন কিছু পড়েনি। ওর জন্য কিছুটা দুধ জোগাড় করা দরকার। বাচ্চাটিকে সযত্নে ওখানে রেখে সে একটা কাপ হাতে করে কিছুটা দুধ জোগাড় করতে গ্রামের দিকে চলল।

রাস্তায় চলতে চলতে ওর খেয়াল হল বাচ্চাটিকে ও একলা ছেড়ে এসেছে। বাঁদরের মত বদমায়েস জানোয়ার কাছেপিঠেই আছে। সত্যি খুব ভুল হয়ে গেছে। বাচ্চাটাকে তার সঙ্গে করে নিয়ে আসা উচিত ছিল। এতে ভয় পাবারই-বা কী আছে। আমাকে কেউ কিছু বলবেই বা কেন? কেউ যদি জিজ্ঞাসা করত, তা হলে না হয় সোজা বলতাম, আমার এক আত্মীয়র বাচ্চা।

ওর একবার মনে হল ফিরে যায়। কিন্তু বাচ্চার খিদের কথা মনে হতেই ওর পা আর পিছু হটল না। হাত জোড় করে, চোখ বন্ধ করে ও একবার শিব-পার্বতীকে স্মরণ করল। আবার নিজের পথ ধরল।

যদিও ও খুব তাড়াতাড়ি হাঁটছিল কিন্তু যেতে আসতে ওর পাক্কা আধ ঘণ্টা লেগে গেল। দুধ নিয়ে ফেরার সময় মনটা আশঙ্কায় দুর দুর করে উঠল। ও ভাবছিল ওর ভুলের জন্য ঈশ্বরের জীব এক ছোট্ট মানবশিশুর প্রাণটা না এতক্ষণে বেরিয়ে গিয়ে থাকে।

কুটিরে ফিরে রোডু রীতিমত চমকে গেল। বাঁদরীটি মায়ের মত বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে বসে। নরম ঘাসের চাপড়া এক পাশে ছড়ানো। বাচ্চাটির চোখ খোলা। এখন আর সে কাঁদছে না। বাঁদরীটি তার দেহের উত্তাপ দিয়ে তাকে বেশ চাঙ্গা করে তুলেছে। প্রভুকে সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে বাঁদরীটি তাড়াতাড়ি বাচ্চাটিকে কোল থেকে নামিয়ে মাটিতে শুইয়ে দিল। সন্ত্রস্ত দৃষ্টি মেলে এক পাশে গিয়ে বসল।

রোড়ু থলের ভেতর থেকে কিছুটা তুলো বার করল। তুলোটা দুধে ভিজিয়ে বাচ্চাটির মুখের ভেতর দিয়ে তাকে দুধ খাওয়াতে লাগল। দুধ খাবার সময় বাচ্চাটার চোখ বুঁজে এল। রোড়ু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

রাতে অন্যদিনের মতনই সে কোনরকমে পাথরের টুকরো দিয়ে উনুন তৈরি করে তিনটি রুটি করল। দুটো সে নিজে খেল আর একটি বাঁদরীটিকে দিল। একটা ছেঁড়া কাপড় দু-টুকরো করে একটা টুকরোর ওপর বাচ্চাটিকে শুইয়ে দিল। আর-একটি টুকরো তার গায়ে চাপা দিল। নিজে একটা ঘাসের চাপড়া মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়ল।

অন্ধকার রাতে রোড়ু ঘুমের ঘোরে যখন পাশ ফিরল তখন রোড়ু অনুভব করল বাচ্চাটা তার পাশে নেই। ধড়মড়িয়ে ও উঠে বসল। ছেঁড়া-কাপড়ের টুকরোটা উঠিয়ে দেখল, না, সত্যি, বাচ্চাটা ওখানে শুয়ে নেই। ও ভাবতে লাগল, বোধ হয় কোন জংলী জানোয়ার বাচ্চাটিকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে। রোড়ু ঠিক সেই সময় মুখ ফিরিয়ে দেখল, হ্যাঁ, সত্যি সত্যি বাচ্চাটি এক জংলী জানোয়ারের কাছেই রয়েছে। আর সেই জংলী জানোয়ার হল তার পোষমানা বাঁদরী। বাঁদরীটি— যার নাম লচ্ছো, তখন বাচ্চাটিকে নিয়ে রাত্রের দুধে-ভেজা তুলোটা দিয়ে দুধ খাওয়াবার চেষ্টা করছে। আর তার দুধ খাওয়াবার ভঙ্গিটা ঠিক সেইরকম, যেরকম করে সে রোজ বাচ্চাটিকে দুধ খাওয়ায়।

ভগবানের জীব এই জানোয়ারটির মজার আচরণ দেখে রোড়ু হেসে ফেলল। ও ভাবতে লাগল দীন-দুনিয়ার মালিকের কী অসীম দয়া। তিনি কত মহান। ভগবানই তো বাচ্চাটিকে তার মায়ের কাছ থেকে কেড়ে জানোয়ারের মাকে দিয়ে দিয়েছে।

রোড়ু এই প্রথম তার হৃদয়ে মায়া মমতার স্পর্শ পেল। আজ সর্বপ্রথম সে অনুভব করল, মায়া কী।

সময় এগিয়ে চলল। রোড়ু এখন সূর্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শোয় আর প্রহরে প্রহরে তার ঘুম ভেঙে যায়। যখন সুন্দরী ঘুম ভেঙে

উঠে বায়না করতে থাকে তখন রোড়ু তাকে কোলে করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পায়চারি করে আর গুনগুন করে ঘুমপাড়ানি গান গায়—

"সদকে সদকে সদ ভাইয়া … !
চঁওয়ে দীয়াঁ বুটিয়াঁ রব্ব লাইয়াঁ !

আগে এই ঘুমপাড়ানি গানটা অন্য কারও মুখে শুনলে তার হাসি আসত আর আজকাল এই গান গেয়ে সে নিজে কত আনন্দই না পায়।

'রাখে হরি মারে কে।' এই নিষ্পাপ শিশুটিকে কেউ নিশ্চয়ই জেনেশুনে মরণের হাতে সঁপে দিয়ে গিয়ে থাকবে। ভাগ্যক্রমে সে বেঁচে গেল। কারণ দুনিয়ার আলো দেখা তার অদৃষ্টে রয়েছে।

ভগবান বোধ হয় কারসাজি করে রোড়ুর মনে বাৎসল্য রসের প্রদীপখানি জ্বেলে দেবার জন্য এই শিশুটিকে তার কাছে পাঠিয়েছেন। আর এইজন্যই বোধ হয় শিশুটিকে এখনও মৃত্যু কেড়ে নিতে পারে নি।

বাচ্চা মেয়েটির চোখ দুটি ভারি সুন্দর। ওর চুল কালো, রেশমের মত নরম। ভগবান বোধ হয় নিজের হাতে করে ওকে গড়েছেন। ওর ওই রূপ দেখেই রোড়ু ওর নাম রেখেছিল— সুন্দরী।

বুড়ো রোড়ু নিজের অনেক পুরনো প্রশ্নের জবাব নিজের কাছেই পেয়ে যাচ্ছিল। রোড়ু এখন ঠাট্টা করে বলে, আরে ভাই, ছেলে-মেয়েদের জন্ম দিয়ে শুধু শুধু তাদের বোঝা কাঁধে নেবার কোন মানেই হয় না। মানুষ শুধু ভ্রমের বশে মায়া-মমতার জালে বাঁধা পড়ে। মায়া-মোহ যে কী তা আমার মাথায় একদমই ঢোকে না।

সেই বুড়ো রোড়ু, যে দুটো প্রাণীর পেট ভরাবার মত আটা জোগাড় করেই গাছের শীতল ছায়ায় পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ত, সে এখন ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরোয় আর রাত্রি অন্ধকার হলে তবে বাড়ি ফেরে। এখন তো আর ওর খালি আটা দিয়েই চলবে না— চাই পয়সাও।

কিছুদিনের মধ্যেই রোড়ু বেশ পয়সা জমিয়ে নিল। এই পয়সা দিয়ে ও ছোট্ট একটি চারপাই, কিছু কাপড়চোপড় আর দু-চারটে

খেলনা কিনে নিয়ে এল। আগে ওর যা আয় হত তাতেই ও সন্তুষ্ট থাকত। এখন ও লোকের কাছে হাত পেতে ভিক্ষে চায়: এই বাচ্চাটার জন্য একটা ছেঁড়া কাপড় দিন। বাবুজী, এই ছোট্ট শিশুটির জন্য একটু দুধ কিনব— দুটি পয়সা দিন।

রোড়ুর মনে সুন্দরীর জন্য এক অদ্ভুত ভালবাসা জন্মে গিয়েছিল। বাঁদরীটিও একটুখানির জন্যেও সুন্দরীকে নজরের বাইরে যেত দিত না।

প্রথম প্রথম রোড়ু ভেবেছিল বাচ্চাটির জন্য তার হয়তো অনেক অসুবিধে হবে, কিন্তু এখন সুন্দরীই ওর সব-কিছু। এখন ও সুন্দরীকে সঙ্গে নিয়েই খেলা দেখাতে বেরোত। আগে ওর কাছে একটাই বাঁদর ছিল। এখন সঙ্গে একটি ফুটফুটে বাচ্চা মেয়ে দেখে সকলেই ওকে কিছু-না-কিছু দিয়ে দিত। রোড়ু যখন কাঁদো কাঁদো মুখে বলত, বাবুমশাইরা, এই মেয়েটির জন্ম নেওয়ার পরই ওর মা মারা যায়, তখন স্বভাবতই লোকের মন নরম হয়ে উঠত।

সুন্দরী এবার দু-বছরে পা দিল। রোড়ুর যে জীর্ণ হতশ্রী কুটীরে কোনদিন আলো ঢুকত না সেই জীর্ণশীর্ণ কুটীর এখন সুন্দরীর রূপে সব সময় ঝলমল করে। ঈশ্বরের কী বিচিত্র মায়া! বাঁদরের সঙ্গে থেকে থেকে সুন্দরীও চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। সেও বাঁদরের মত লাফাত। কখনও কখনও সে নিজের হাত দুটো মাটিতে দিয়ে ভর করে পা দুটো উঁচুতে তুলে ব্যালেন্স করত। আবার কখনও কখনও বাঁশের ওপর ভর করে ওপরে ওঠার চেষ্টা করত। বাঁদরকে যা-কিছু করতে দেখত তারই অনুকরণ করার চেষ্টা করত।

সুন্দরীকে গরিব ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে খেলা করতে দেখে রোড়ুর মন খুশিতে ভরে ওঠে। সে দেখে সব ছেলে-মেয়েরাই সুন্দরীকে ভালবাসে। সুন্দরীকে ভগবান রূপের সঙ্গে বুদ্ধিও দিয়েছিলেন। অপরকে যা করতে দেখত সুন্দরী অমনি তা নকল করার চেষ্টা করত। যা-কিছু একবার শুনত অমনি সে বলত। রোড়ু এখন সুন্দরীর দেখা-শোনায় সব সময় ব্যস্ত থাকত। এতটুকু সময় পেত না।

রোড়ু যখন বাড়ি ফেরে সুন্দরীর জন্য কোন-না-কোন খেলনা নিয়ে আসে। আসলে এই রকম করা ওর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

যখনই কোন জিনিস নিয়ে ও কুটীরে ঢোকে তখন ওর আচার-আচরণে এক অদ্ভুত চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়। তার দেহমন জুড়ে থাকে কিছু পাবার আকাঙ্ক্ষা। যখন সে বাড়ি ফেরে সবচেয়ে ভাল লাগে সেই মুহূর্তটুকু। সুন্দরী ওকে দূর থেকে দেখেই দৌড়ে আসে। পা-দুটো জড়িয়ে চাদর ধরে টানাটানি করে। বলে, ও বাবা, আমার জিনিস দাও-না আমার হাতে। তারপর সে চেঁচামেচি করতে থাকে। রোড়ু চাদরের খুঁট থেকে খুলে মিষ্টির ঠোঙা বার করে সুন্দরীর হাতে তুলে দেয়। সুন্দরী ঠোঙাটা নিয়ে এক দৌড়ে তার বন্ধুদের দেখাতে চলে যায়।

আনন্দে ভরে ওঠে রোড়ুর মন। খুশিতে পাগল হয়ে যায় ও। ওই সময়টুকু সে এত সুখ ও আরাম অনুভব করে যে তার কাছে তখন রাজা মহারাজা কোন্ ছার।

ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে খেলার সময় সুন্দরীর নজরে পড়ত তাদের মায়েদের। যখন কোন ছেলে-মেয়ে নিজেদের মধ্যে মারপিট করত তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের মাকে ডাকত। বলত, দেখ মা, ও আমাকে মারছে। মা, ও আমাকে আমার পুতুল দিচ্ছে না।

সুন্দরী কিছুতেই এই 'মা' কথাটার মানে বুঝতে পারত না। ওর কাছে বাবা আর লচ্ছো নামে বাঁদরীটাই সব। কিন্তু সুন্দরী যখন দেখতে পায় মায়েরা নিজের ছেলে-মেয়েকে আদর করছে, ওদের চুল আঁচড়ে দিচ্ছে তখন সুন্দরীও মায়ের নাম করে চেঁচিয়ে ওঠে।

এক পূর্ণিমার রাত। বুড়ো রোড়ু কুটীরের বাইরে চট বিছিয়ে শুয়ে রয়েছে। সুন্দরী রোড়ুর কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে।

রোড়ু তাকে ঘুমপাড়ানি গান শোনাচ্ছিল। যেই একটা করে গান শেষ হয় সুন্দরী বলে ওঠে, বাবা, আর-একটা গান শোনাও। রোড়ু ওকে ভোলাবার চেষ্টা করে বলে ওঠে, আয় তোর সঙ্গে খেলা করি। তারপর দুজনেই হো হো করে হেসে ওঠে। সুন্দরীর হাসিতে রোড়ু যেন অমৃতের স্বাদ পায়।

ঠিক এই সময় দূর থেকে একটি বাচ্চা যেন তার মাকে ডাকল।

সুন্দরীর কানে সেই ডাক পৌঁছতে সে হাসি ভুলে গেল। নিজের দুটো হাত দিয়ে সে রোডুর চিবুক ধরে বলল, বাবা আমার মা কোথায় আছে ?

বেচারা বুড়ো রোডু এই ছোট্ট প্রশ্নের কোন জবাব খুঁজে পেল না। ওর মনটা বিচলিত হয়ে ওঠে। সুন্দরীর ছোট্ট গালে একটা চুমু খেয়ে সে বলল, তোর মা চলে গেছে। সুন্দরী আবার বলল, বল না বাবা, আমার মা কোথায় ?

—তোর মা অনেক দূ—রে চলে গেছে।

—বাবা, মা দূরে—

—হ্যাঁ মা, দূরে।

—বাবা—মা উপরে—

—হ্যাঁ, মা উপরে চলে গেছে—

—মা, চাঁদমামার কাছে আছে, তাই না বাবা ?

—হ্যাঁ, চাঁদমামার কাছে—

—বাবা, মাকে কি চিল সেখানে নিয়ে গেছে ?

—হ্যাঁ রে হ্যাঁ। চিলই তো নিয়ে গেছে।

কথা বলতে বলতে সুন্দরী একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল। রোডুরও এক সময় চোখ বুঁজে এল।

॥ ৯ ॥

দশ-বারো বছর পরে

দীওয়ানপুরের জীবাসিংহের ছেলে বচন সিং-এর মনেও বরাবর একটা সংকল্প ছিল। ও যখন ক্লাস টেন পাস করে খালসা কলেজে ঢোকে, তখন থেকেই ওর মনে এই সংকল্প জাগে। এই সংকল্পের ফলে এবং সেইসঙ্গে এক মহান ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে ওর জীবনধারার আমূল পরিবর্তন ঘটে।

বচন সিং-এর বয়স ১৮-১৯ বছর। বেশ কয়েক বছর অমৃতসরে নোংরা পরিবেশের মধ্যে কাটিয়েও ওর দেহ এখন গ্রামের মানুষের

মত শক্ত সমর্থ। তাগড়াই চেহারা। ভরাট মুখ। মোটা মাংসপেশী। এই-সব কারণে ওর চেহারাও বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। বচন সিং কবিতাও লিখত। মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতেও খুব পটু। স্কুলে পড়ার সময় বচন ছিল ইউনিয়নের একজন পাণ্ডা। ছাত্রদের জলসা, সভা-সমিতির ব্যাপারে ও ছিল সবার পুরোভাগে। বারোয়ারি সভাগুলোতেও বচনকে প্রাধান্য দেওয়া হত। আর বড় বড় মজলিশে ওর কবিতা শোনার জন্য লোকে উন্মুখ হয়ে বসে থাকত। এর কারণ এই নয় যে ওর কবিতার বিষয়বস্তু খুব উচ্চাঙ্গের। বরং খুবই সাধারণ ওর কবিতা। কিন্তু সুরেলা গলায় ও যখন কবিতা আবৃত্তি করত তখন সত্যিই ভাল শোনাত। এই-সব গুণের জন্য বচন যদি নিজের পিতলের জিনিস বিক্রি করত তা হলে সোনার দাম পেত। যখন কোন মজলিশে সে সুরেলা গলায় কবিতা আবৃত্তি শুরু করত সভার শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মত তা শুনত। যে সংকল্প বচন সিং-এর জীবনে এমন আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে তার ইতিহাস এই: ক্লাস টেন পাস করে বচন সিং খালসা কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভরতি হয়। সে সময় শহরে শহরে ও গ্রামে গ্রামে প্রায়ই গ্রাম উন্নয়ন নিয়ে সভা-সমিতি হত। গ্রামের প্রচলিত কুসংস্কারগুলি দূর করাই ছিল এই-সব সভা-সমিতির উদ্দেশ্য।

একদিন অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালা বাগে এই ধরনের এক সভা হচ্ছিল। প্রায় হাজার দশেক লোক সভায় জমায়েত হয়েছে।

সেক্রেটারি মঞ্চে উঠে দাঁড়িয়ে যেই বচন সিং-এর নাম ঘোষণা করলেন, অমনি শ্রোতাদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল। তারা সবাই হৈ-হৈ করে উঠল। বচন সিং মঞ্চে দাঁড়িয়ে স্বরচিত কবিতা পাঠ শুরু করতেই শ্রোতারা নীরব হয়ে গেল। ওকে সবাই অনুরোধ জানাল, আর একবার কবিতাটা পড়ার জন্য।

সভা শেষ হল। আজকের সাফল্যে বচন সিং খুব খুশি। ওর মনে হচ্ছে পা আর মাটিতে নেই। ও যেন পাখায় ভর দিয়ে আকাশে উড়ে চলেছে। ওর চারপাশে ভক্তরা ওকে ঘিরে ধরল।

ভিড় একটু পাতলা হয়ে এলে এক বৃদ্ধ ওর দিকে এগিয়ে এলেন।

মুখে সাদা রেশমের মত একমুখ দাড়ি। বয়স পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে। কিন্তু চেহারাটি সত্যিই দেখার মত। খদ্দরের সাদাসিধে পোশাকে তাঁকে কোন সন্ত পুরুষ বলে মনে হচ্ছিল।

বচন সিং-এর কাছে এসে সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক সস্নেহে বচনের হাত দুটো জড়িয়ে ধরে খুব স্নেহের সঙ্গে ওকে ভিড় থেকে সরিয়ে এক পাশে নিয়ে গেলেন। মাঠের ঘাসের ওপর বসতে বসতে বললেন, কাকাজী, আপনার কবিতাই আমাকে আপনার কাছে টেনে নিয়ে এসেছে।

বচন সিং ওঁর পাশে বসে জবাব দিল, বাবাজী, আপনি যে দয়া করে এসেছেন এতেই আমি ধন্য। আপনার এই কষ্টের জন্য আমি… ।

কথার মাঝখানেই ওই ভদ্রলোক বলে উঠলেন, আমি খুব একটা লেখাপড়া জানি না। এইজন্য আপনার কাছে কবিতাটার মানে জেনে নিতে চাই। ভদ্রলোকের হাতে ছিল এক টুকরো কাগজ। উনি সেটি পড়তে শুরু করে দিলেন—

তোমার চরণ ছুঁয়ে শপথ নিলাম, হে ভারতমাতা!
তোমার সেবায় ত্যজিব মোর প্রাণ।
পাড়ায় পাড়ায় গলিতে গলিতে ঘুরে,
দূর করিব যত আছে কুসংস্কার।

এই কবিতাটিই বচন সিং আজকের জলসায় পড়েছিল। কবিতাটি বেশ দীর্ঘ। কিন্তু এই বৃদ্ধ ভদ্রলোক কাগজে মাত্র দুটি চরণ লিখতে পেরেছিলেন। বচন সিং বলল, বাবাজী, এই চরণের অর্থ তো খুবই সোজা।

ভদ্রলোক বচন সিং-এর দিকে সস্নেহ উদার দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন, না, কাকাজী, সোজা নয়। বেশ কঠিন। আপনি আর-একবার ভেবে দেখুন।

বচন সিং বেশ ভাবনায় পড়ে গেল।

সেই ভদ্রলোক আবার বলে উঠলেন, কেন, আপনি কি এই শব্দটির মানে বোঝেন— তোমার চরণ ছুঁয়ে শপথ… ?

বচন সিং এবার আসল কথাটা বুঝতে পারল। ও আর-একবার

বৃদ্ধের দিকে তাকাল। কিন্তু এবার বৃদ্ধের জ্বলন্ত দৃষ্টির সামনে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারল না। বচন সিং নিরুত্তর হয়ে গেল।

ভদ্রলোক বচন সিং-এর কাঁধে হাত রেখে বললেন, যুবক, শপথ গ্রহণ করে কোন কাজ না করলে মনে রেখ সেটি বড় পাপ।

বচন সিং মাটির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

—কাকা! নিজের জীবনকে মানুষের সেবায় উৎসর্গ করার অর্থ শুধু বাহবা লোটা নয়।

বচন সিং-এর মাথা ভদ্রলোকের চরণে নত হয়ে পড়ল।

—যদি সত্যিই মন কিছু করতে চায় তা হলে আজেবাজে কথা না বলে কিছু-একটা করে দেখাও।— বচন সিং-এর পিঠে হাত রেখে বাবা এই কথাগুলি বললেন।

আজ সত্যি বচন সিং-এর চোখ খুলে গেল। সত্যিই তো এই কবিতাটির অর্থ বেশ কঠিন। এ পর্যন্ত বচন সিং এই ধরনের বড় বড় শব্দ দিয়ে লেখা কবিতা পাঠ করে জনসাধারণকে শুনিয়েছে আর প্রচুর বাহবা কুড়িয়ে এসেছে। খুশি মনে ভেবেছে এইভাবেই সে জনসাধারণের সেবা উপকার করছে। আজ বুঝতে পারল, এতদিন ধরে যা করেছে সব মিথ্যে, সব ধাপ্পা। এই জীবন ছাড়াও দ্বিতীয় কোন উন্নত জীবন থাকতে পারে। আজকের আগে সে কোনদিন তা অনুভব করে নি।

ওই কথাবার্তার পর ভদ্রলোক চলে গেলেন। কিন্তু যাবার আগে বচন সিং-এর মনে নতুন এক সংকল্পের বীজ বপন করে দিয়ে গেলেন। বচন সিং জিজ্ঞাসা করায় ভদ্রলোক তাঁর নাম ঠিকানা দিয়ে গিয়েছিলেন। ওঁর নাম দীদার সিং। উনি কিছুদিন ধরে অমৃতসরে আছেন।

এই দিন থেকে বচন সিং-এর জীবনে পরিবর্তন শুরু হল। যতদিন জ্ঞানী দীদার সিং অমৃতসরে ছিলেন বচন সিং প্রতিদিন তাঁর কাছে যেত। কয়েক মাস ধরে তাঁর সাহচর্যে বচন সিং এমন বদলে গেল যে আগের বচন সিং আর বর্তমান বচন সিং-এর মধ্যে এখন আকাশ-পাতাল ফারাক। কবিতা ও এখনও লেখে কিন্তু এই পৃথিবীর

কারও জন্য নয়—লেখে নিজের জন্যে। সেদিন জ্ঞানী দীদার সিং বার বার যে পঙ্‌ক্তিটি তাঁকে বলছিলেন, বচন সিং তা কখনও ভোলে নি—"তোমার চরণ ছুঁয়ে শপথ…"।

॥ ১০ ॥

এইবার গরমের ছুটিতে বচন সিং-এর বাড়ি যাবার একেবারে ইচ্ছে ছিল না। ইচ্ছা ছিল, ওর কবিতার আসল রূপ দেবার জন্য ও কোন একটা গাঁয়ে গিয়ে কিছুদিন কাটাবে। কিন্তু বাবার অসুখের চিঠি পেয়ে সে আর থাকতে পারল না। ছুটি হবার সঙ্গে সঙ্গে সে বাড়ির দিকে রওনা দিল।

ছেলের সাজ-পোশাক দেখে রাগে জীবা সিং-এর দেহ জ্বলে উঠল। কোথায় ওর স্যুট, বুট, কলার আর টাই আর কোথায় মোটা খদ্দরের কোর্তা, পায়জামা আর পায়ে বারো-আনা দামের জুতো!

অসুস্থ জীবা সিং ছেলেকে অনেক ধমকালেন, অনেক রাগারাগি করলেন। কিন্তু কী আর করবেন? একটা মাত্র ছেলে। মুখে বেশি কিছু বলার সাহস হল না। কে জানে রাগ করে হয়তো বাড়ি থেকে চলেই যাবে।

শেষ পর্যন্ত উনি ঠিক করলেন, বচন সিংকে পড়াশোনা ছাড়িয়ে বাড়ির কাজকর্মে লাগিয়ে দেবেন। তাঁর ভয় ছিল, লেখাপড়া শিখে ছেলে যেন কখনও মা-বাবাকে ছেড়ে আলাদা না হয়ে যায়।

বচন সিং সেবাকেই নিজের পরম ধর্ম জ্ঞান করত। কিন্তু ও বাবা-মায়ের দুঃখ একদম দেখতে পারত না। তাই আর কীই-বা করবে! মন ভার করে বাড়ির কাজকর্মে লেগে গেল।

একদিন ক্ষেতের কাজকর্ম দেখার জন্য ও এক গুরুদ্বারের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। গুরুদ্বারের দরজায় তালা লাগানো। ও ভাবতে লাগল, শিখদের এত বড় গ্রামে গুরুদ্বারের এই হাল হয়েছে? সামনে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল তাকে জিজ্ঞাসা করল।

—খোকা, এই গুরুদ্বারে কোন গ্রন্থী[১] নেই ?

ছেলেটি আঙুল দিয়ে ওপরের দিকে দেখিয়ে বলল, ওই দেখ ওপরের জানালায় ভাইজী বসে রয়েছেন।

বচন সিং আরও বেশি অবাক হয়ে গেল। নিজের ক্ষেতে অন্যের জানোয়ারকে চরতে দেখে লোকে অবাক হয়ে যায়, তার চেয়েও অবাক হয় যখন দেখা যায় যে ক্ষেতের রক্ষক ওখানেই চুপচাপ বসে আছে।

বচন ওকে আবার জিজ্ঞাসা করল—

কী ব্যাপার, ভাইজী কি ওপরে বসেই গ্রন্থসাহেবের 'প্রকাশ'[২] করেন নাকি ?

ছেলেটি বচন সিং-এর কথা বুঝতে পারল না। সে বলল—কী বললেন, প্রসাদ ? কী প্রসাদ ? ও তো গুরুপর্বের দিন দেওয়া হয়।

বচন সিং বুঝতে পারল ছেলেটি তার কথা বুঝতে পারে নি। ও তখন ভাইজীর নাম করে দু-একবার চেঁচিয়ে ডাকল। ভাইজী জানালা দিয়ে বাইরে মুখ বাড়াল। নীচে জমিদার সরদার জীবা সিং-এর ছেলেকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এল। এসেই দু-ফুট ঝুঁকে বেশ বিগলিত কণ্ঠে, হাত জোড় করে বলল, আসুন, আসুন সরদারজী! 'ওয়া গুরুজীকা খালসা শ্রী ওয়া গুরুজী কি ফতে'। আপনার অশেষ কৃপা যে এখানে পায়ের ধুলো দিলেন। আপনার চরণধূলিতে গরিবের এই কুটীর পবিত্র হল। আসুন, একবার ওপরে দর্শন দেবেন চলুন।

বচন সিং তো ভাইজীর সঙ্গে কথা বলারই অবকাশ খুঁজছিল। কিন্তু 'গরিবের কুটীর' কুটীরে চরণধুলি দেওয়ায় 'গরিবের কুটীর পবিত্র হল' এই-সব কথা শোনার পর তার আর কোন শ্রদ্ধা রইল না। ইচ্ছে হল এখনই সে বাড়ি ফিরে যায়! তারপর কিছু একটা চিন্তা করে সে ভাইজীর সঙ্গে ওপরে উঠল।

১. শিখদের ধর্ম-মন্দিরের পুরোহিত। যিনি গ্রন্থসাহেব পাঠ করেন।

২. পূজা-অর্চনা।

ভাইজী প্রায় সওয়া ছ-ফুটের মত লম্বা। ওকে দেখে মনে হয়, উনি যা খান তা দিয়ে গায়ে মাংস লাগার বদলে হাড়-পাঁজরাই পরিপুষ্ট হয়েছে। ওঁর গাল দুটো এত ভেতরে ঢুকে গেছে যে তার মধ্যে যদি দুটো বল রেখে দেওয়া যায় তো বল দুটিই অদৃশ্য হয়ে যাবে। যদি উনি পেটটা একটু নিচু করতেন তা হলে পিঠের হাড়ে গিয়ে ঠেকত। নীচের পাটিতে একটি দাঁতও নেই, যেন কোন শ্রদ্ধাহীন গুরুদ্বার খালি পড়ে রয়েছে।

ওপরের পাটিতে ওঁর চারটি মাত্র দাঁত। কিন্তু ওই চারটে দাঁতই বাইরে বার করা। ওঁর সরু সরু ঠ্যাং দুটো দেখে মনে হবে যে পৃথিবীটা গোরুর শিঙের ওপরেই দাঁড়িয়ে। কিন্তু গ্রন্থীজীর মত ওই দীর্ঘ চেহারার লোক ওই সরু সরু পা নিয়ে কীভাবে দাঁড়িয়ে আছে? ওর পেট থেকে বুড়ো আঙুলের মত নাভিটি বাইয়ে বেরিয়ে ঝুলছিল। পেট এত সরু যে মনে হচ্ছিল যেন কোন-একটা থালা (পরাত) কেউ মেটে রঙের কাপড়ে ঢেকে নিয়ে যাচ্ছে। ওঁর লম্বা লম্বা কানে কানবালা পরার দরুন কানের ছেঁদা এত বড় হয়ে গেছে তা দিয়ে একটা গাজর পর্যন্ত অনায়াসে গলে যেতে পারে। ওঁর লম্বা লম্বা ঠ্যাং দেখে মনে হবে ঈশ্বর বুঝি এই বেনিয়ার কাছে দ্বিগুণ ভুল করে ফেলেছেন।

ভাইজী নিজের হাতে নোংরা বালিশটা চারপাই থেকে উঠিয়ে নীচে ফেলে দিলেন। ওঁর বালিশটা দেখে মনে হচ্ছিল যেন মিষ্টির দোকানের নোংরা চট। সতরঞ্জিটা দু-পাট করে ফেললেন যাতে ছেঁড়াগুলো দেখা না যায়। তারপর ওপরের দাঁতগুলো হাত দিয়ে আড়াল করে বললেন, আসুন, আসুন সরদারজী বসুন। এ তো আপনারই বাড়ি। আপনার তো দেখাই পাওয়া যায় না। আপনি আজ আমার বাড়ি আসায় মনে হচ্ছে ক্ষুদ্র পিঁপড়ের ঘরে স্বয়ং ভগবান এসেছেন।

বচন সিং ঘরের জিনিসপত্রগুলো দেখতে দেখতে বলল, ভাইজী, এও আপনার দয়া। (আবার একটু ভেবে নিয়ে) আবার জিজ্ঞাসা করল, মহারাজ 'প্রকাশ' কোথায় হয়?

—কী আর বলব সরদারজী। এখানে কেউ গুরুদ্বারেই আসে না। (আবার একটু ভেবে নিয়ে) 'প্রকাশ' তো নীচেই হত। কিন্তু আজ আর আমার শরীরটা বড় খারাপ। তাই আজ আর 'প্রকাশ' করি নি।

বচন সিং অবোধ শিশু নয়। দু-এক কথাতেই বুঝতে পারল ভাইজী তাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টায় আছে। ওর কথার সত্যি মিথ্যে নিরূপণের জন্য ওঁকে জিজ্ঞাসা করল, চলুন আপনাকে একটু কষ্ট দেব। নীচে গিয়ে দরজাটা খুলুন আর মহারাজের প্রকাশের ব্যবস্থা করুন। যেদিন থেকে গ্রামে এসেছি সেদিন থেকে একদম পূজাপাঠ করার সুযোগ পাই নি।

অগত্যা ভাইজীকে নীচে নামতে হল।

পাঁচ-সাত মিনিটের চেষ্টায় চাবি পাওয়া গেল। কিন্তু কোন চাবিই গুরুদ্বারের দরজায় লাগল না। বচন সিং একটু ক্ষোভের সঙ্গে বলল, ভুল করে তালায় অন্য চাবি লাগাচ্ছেন না তো ?

ভাইজী হেঁচকি তুলতে তুলতে ওপরে আসতে আসতে বললেন, একটু অপেক্ষা করুন, সম্ভবত চাবি বদলে গেছে। উনি তাড়াতাড়ি ওপরে এসে একটা প্রদীপের তেলের মধ্যে চাবিটা তাড়াতাড়ি চুবিয়ে নিয়ে এলেন। তালা খুলতে খুলতে ভাইজী বলে উঠলেন, হয়তো কেউ এসেছিল তাই চাবি আর-একটা আলমারিতে পড়ে রয়েছে। আর আমি বৈঠকখানার চাবিটাই নিয়ে এসেছি। গুরুদ্বারের ভেতর ঢুকে দুজনে গুরুদ্বারের যে অবস্থা দেখল তাতে দুজনেই কাঁপতে লাগল। বচন সিং রাগে, আর ভাইজী লজ্জায়।

বচন সিং ভাইজীকে অনেক বকাবকি করল, এই রকম ভুল আর যেন না হয় তাও বলল। তারপর ক্ষেতের দিকে পা বাড়াল।

॥ ১১ ॥

কী খবর গ্রন্থীজী, আজকাল তো আপনার সময় ভালই যাচ্ছে !

পালা সিং খুব স্নেহের সুরে ভাইজীকে মৎ শ্রী আকাল বলে কুশল

বিনিময় করে কথাটা বললেন।

ভাইজী গুরুদ্বারের উঠোন ঝাঁট দিচ্ছিলেন। ঝাড়ু দেওয়া বন্ধ করে নোংরা হাত সার্টে পুঁছতে পুঁছতে বললেন,—আসুন মশাই আসুন। আর বলবেন না মহারাজ, সরদার জীবা সিং-এর ছেলেটা এখানে এসে আমায় বড় বিপদে ফেলেছে। যেদিন থেকে ও গ্রামে এসেছে আমার রক্ত শুকিয়ে গিয়েছে। ভয়ে মুখের ওপর কিছু বলতেও পারি না। যার গায়ে জোর আছে সে যদি বলে সাত বিশে সাতাশ, তা হলে তাই মানতে হয়।

পালা সিং গ্রামের একজন ডাকসাইটে বদমায়েস। ওর দলের লোক ওকে দেবতার মত ভক্তি করে। বাবা-মা মারা যাবার পর যেটুকু পৈতৃক জমি-জেরাত ছিল তা সবটাই বিক্রি করে খেয়ে বসে থাকে এবং মস্তান বনে যায়। সারা গাঁয়ের লোক ওকে দারুণ ভয় করে। যখনই গ্রামের কোন ঝগড়া মারামারিতে অংশ নেবার জন্য লোক-জনের দরকার পড়ত তখনই পালা সিং সদলবলে গিয়ে সেখানে হাজির হত।

ওর একটা গুণও ছিল—যার জন্য গাঁয়ের মধ্যে ওর খাতির কম ছিল না। প্রত্যেক পনের দিন বা একমাস অন্তর চুরি করতে যাবার আগে ও গুরুদ্বারে এসে মানত করে যেত। সেইজন্য ভাইজী ওর ওপর এত খুশি ছিলেন। পালা সিং যখন কোথা থেকে অনেক মালপত্র জোগাড় করে আনত তখন গুরুদ্বারে বড় রকমের ভোগ দেওয়া হত। এ ছাড়া কয়েকদিন ধরে যে অবিরাম সিদ্ধি শরবতের আসর চলত তার খরচাও দিত পালা সিং।

কিছুদিন আগে পালা সিং চুরির ধান্ধায় বেরিয়েছিল আর অনেকদিন পরে বেশ কিছু হাতিয়ে গ্রামে ফিরে এসেছে।

জীবা সিং-এর ওপর পালা সিং-এর মনে মনে খুব রাগ ছিল। ও আক্রোশের বশে শুধু দাঁত কিড়মিড় করত আর ভাবত একদিন যদি সুযোগ আসে তা হলে সে এর প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়বে। একে তো জীবা সিং ওর মাতব্বরি একদম মানত না তার ওপর আর একবার হাকিমের সামনে জীবা সিং পালা সিং-এর সব গুপ্ত কথা ফাঁস করে

দিয়েছিলেন। এইজন্যে সবসময়ই সে জীবা সিং-এর ভয়ে ভয়ে থাকত। বচন সিংকেও তার এইজন্যে সুবিধের বলে মনে হয় না। কারণ তার মনে হয় বচন সিংও তার পথের বাধা।

ভাইজীর কথা শুনে পালা সিং বলল, ওই ছোকরার এতখানি সাহস কোথা থেকে হয় যে আপনার মুখের ওপর রা কাড়তে সাহস করে। আচ্ছা বলুন তো, আপনাকে কি ও কোন বিপদে ফেলেছে?

—মহারাজ, আর বলবেন না। ও যে নতুন নতুন লেখাপড়া শিখে এসেছে, যা বলবেন, উলটো মানে ধরবে। বলছে কি রোজ সকালে উঠে গুরু গ্রন্থসাহেবের পুজো কর। দুবেলা গুরুদ্বারে ঝাড়পোঁছ লাগাও, সন্ধেবেলা আবার গ্রন্থসাহেব পাঠ কর। আরও সব কত কথা।

পালা সিং মাথার পাগড়ি ঠিক করে নিয়ে বলল, দেখুন তো; বেটার বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছে। ও কি এ জায়গাটাকে অমৃতসর ভেবেছে নাকি? কারই-বা সময় আছে যে ক্ষেতের কাজকর্ম সেরে গুরুদ্বারে আসবে। কখনও কোন পালাপার্বণের দিনে যদি কেউ আসে তা আলাদা কথা। আর ভাই, আমার কথায় হয়তো রাগ করবেন, আপনি হচ্ছেন একেবারে মাটির মানুষ! আপনি কি জীবা সিং-এর টাকা খান যে তার কথা শুনবেন?

নিজের দলে একজনকে পেয়ে ভাইজীর একটু সাহস হল। তিনি বললেন, ভগবান আপনার বাচ্চা-কাচ্চাদের বাঁচিয়ে রাখুন। আপনি লাখ টাকার কথা বলেছেন মহারাজ।—ও আমাদের কচি খোকা ঠাওরেছে। ওকে কে বোঝাতে যাবে? আমি তো বারোয়ারি মাগ।

—কিন্তু করবই-বা কী। আমাদেরও তো পেট চালাতে হবে। যদি কারও কথা না শুনি, তা হলে লোকে বলবে, ওই দেখ, গ্রন্থী হয়ে লোকের মুখে মুখে কথা বলছে। এই-সব ভেবেচিন্তেই চুপ করে যাই, বুঝলেন না? ওই যে কথায় বলে না, কোন রকমে কেটে গেলেই হল। কী জানি বাবা আবার কিসের থেকে কি ঝামেলা হবে। এখানে তো কেউ কাউকে একটুকরো পোড়া রুটিও দেয় না। আপনাদের মত দাতাদের দয়াতেই আমাদের পেট চলে। তা ছাড়া

মাসের মধ্যে দশদিন গ্রামের কেউ-না-কেউ মামলা-মকদ্দমায় পড়লে গুরুদ্বারে পুজো দিতে আসে। তখন তারা দু-চার পয়সা দেয়। নয়তো গুরুদ্বারে রোজ রোজ কেই-বা আসছে যার জন্যে শুধু শুধু ভোরবেলায় ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাব।

—এইজন্যেই তো ভাইজী যে-সে আপনার পিছনে লাগে। কিন্তু ভাই এইভাবে কি কাজকর্ম চলতে পারে? আপনি ওদের মুখের ওপর জবাব দিয়ে দিন। দেখি ওরা আপনার কী ক্ষতি করতে পারে। আমরা থাকতে আপনার ওপর কে ঝুট-ঝামেলা করে একবার দেখি তো।

পালা সিং-এর কথা শুনে ভাইজী যেন নিজের হারানো শক্তি আবার ফিরে পেলেন। বেশ জোর গলায় বললেন, না, সরদারজী, না। আমি ওদের পরোয়া করতে যাব কেন? আমি ভাবছিলাম, কাল ও আমাকে যে-সব কথা বলেছে তা শুনে যেন আমাকেই আবার খারাপ না ভাবেন। আপনার কথা যদি মনে না আসত তা হলে আমি কালই ওসময় ওকে ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে দিতাম।

—সর্দারজী, আমি নেশাখোর মানুষ। আফিমের নেশায় একটু বেশি ঘুম আসে, তাই বুঝলেন না একটু সকাল সকাল নেশা করতে হয়। মৌজ করার ওই তো সময়। হ্যাঁ, সত্যি বলছি, ও তো এখন আমাকে ঝামেলায় ফেলবার ফিকির খুঁজছে।

—কোন্ ঝামেলা বলুন তো?

—বলছিল, ভাইজী, আপনি তো সারাদিন খালি চারপাইয়ের ওপর বসে বসে কাটান। আর-কিছু না করুন, গ্রামের ছেলে-মেয়েদের পড়ান।

পালা সিং রাগে ঠোঁট কামড়ে বলল, না, না, কোন দরকার নেই। ঢের দেখেছি। নিজে বারো বছর ধরে পড়াশোনা করে কি উন্নতিটাই করল? কী ভালছেলেই না ছিল। কী রকম ভদ্র কথা-বার্তা ছিল। যেদিন থেকে দেড়টা অক্ষর পড়তে শিখেছে, সেদিন থেকেই ওর মাথাটা একদম বিগড়েছে।

দেখছেন না, কী রকম সঙ সেজে এবার গ্রামে এসেছে। জাঠের

ছেলে হয়ে পোশাক বানিয়েছে কাহালিদের মত। লোকে বলে খালশা কলেজে ভাল পড়াশোনা হয়, হ্যাঁ, তা আপনি কী জবাব দিলেন ?

—কিছুই বলি নি। আমি কি ওর খাই ? আমিও মুখের ওপর বলে দিলাম, দেখ বাবা, আমি ওই-সব বাচ্চা-কাচ্চাদের নিয়ে সারাদিন ধরে মাথা ঘামাতে পারব না। দুপুরবেলা তো সুক্‌খেসরদাই[১] খাওয়ার সময়, আর মাঠে-জঙ্গলে যাবার সময়। লেখাপড়ার মত বেয়াদপির ফুরসৎ কোথায় ?

ভাইজীর কথায় মদত দিয়ে পাল্লা সিং বলল, আপনি তো আজ-কাল একলাই গফ্‌ফে[২] লাগাচ্ছেন ? ধ্যান সিং আর নয়রন সিং আজকাল সকাল থেকেই আমার পিছনে পড়ে রয়েছে। ওরা বলছিল, চল ভাইজীর মজলিশে গিয়ে 'চরণামৃত' নিয়ে আসি।

—আরে মহারাজ, এখন কোথা থেকে গফ্‌ফে লাগাব ? ওই ছেলেটি আসার পর থেকে ওর ভয়ে আর বাটাবাটি পারছি না। এই কয়দিনেই কী রকম শুকিয়ে গিয়েছি দেখুন।

—আবার সেই এক কথা। আপনাকে বললাম না, ওই ছোকরাকে একরত্তিও পরোয়া করবেন না। আমি নিজেই ওকে দেখে নেব। আপনি বেশ করে মৌজ করার ব্যবস্থা করুন। আমি ওর লাট-সাহেবী একবার দেখে নিচ্ছি।

আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আজ এর সুদে-আসলে শোধ নেব। আপনি আসবেন তো ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

—আচ্ছা তা হলে দয়া করে তাড়াতাড়ি চলে আসবেন। সন্ধ্যার আগেই আসা চাই। আপনার বন্ধুরাও তো আসবেন ?

—হ্যাঁ জী, হ্যাঁ, ওরা তো আর আমার পিছু ছাড়বে না।

—মহারাজ, এ তো বেশ আনন্দের কথা।

—আচ্ছা তা হলে চলি। ওয়া গুরুজীকি ফতে। এই বলে

১. আফিম গাঁজা

২. মজা লোটা

পান্না সিং চলে গেল। ভাইজীর ঝাড়ু এক পাশে পড়ে রইল। উনি এখন থেকেই মৌজের সিদ্ধি বানাবার জন্য জোগাড়-যন্তর করতে লাগলেন। সকালে বানানো কয়েক টুকরো মাজুন ক্ষীরের সঙ্গে খেয়ে ফেললেন। বেশ নেশাও চড়ল। কিন্তু মুঠো ভরতি খাওয়া যাঁর অভ্যাস তাঁর ওই সামান্য মাজুনের টুকরো আঙুল দিয়ে চেটে চেটে খেলে আর কতখানি নেশা হবে। যিনি হাঁটুতে কনুই রেখে গটাগট বাটি চড়াতেন, মুখ লাল টকটক করত, ওই মাজুনের টিপে তিনি সেই মৌজ কোথায় পাবেন ?

১২

দুপুর তিনটে প্রায় বাজে। গুরুদ্বারের ওপরের ঘরে ভাইজীর মজলিশের সদস্যরা জড়ো হয়েছেন। ভাইসাহেব এক পাশে বসে খুব মনোযোগ দিয়ে ধীরে ধীরে তাঁর লাঠিগাছখানা পরিষ্কার করছেন। বচন সিং-এর ভয়ে গত কয়েকদিন লাঠি সাফ করার সময়ই পান নি।

পান্না সিং চাদরের খুঁটে বাঁধা এক টুকরো গুড় বার করতে করতে বলল, ভাইজী একটু জোরে হাত চালান।

গামছা দিয়ে শিল-নোড়াটা মুছে ভাইজী বললেন, নিন, মহারাজ, আপনি গুড়ের ডেলাটা গামলায় ফেলে গুলুন। আমি দৌড়ে গিয়ে সিদ্ধি নিয়ে আসছি।

মজলিশের এক যুবক বসে গুড় গুলতে লাগল। আর-একটি যুবক জল দিয়ে 'সুক্‌খা' ধুতে লাগল। ভাইজী ভেজা হাত দুটো সার্টের হাতায় মুছে বাজারে যাবার জন্য তৈরি হলেন। পান্না সিং তখন চাদরের গিঁঠ খুলে একটি সিকি বার করে ওঁর হাতে দিয়ে বলল, একটু ভাল করে তৈরি করবেন। দু-আনার বাদাম আর দু-আনার পেস্তা।

গোপাল সিং একটা ময়লা পুঁটলি খুলে বলল, ভাইজী, বাদাম আনার আর দরকার নেই। ও পুঁটলি থেকে তিনপোয়াটাক বাদাম বার করল। পান্না সিং বলল, আচ্ছা, আরও চার আনার নিয়ে আসুন।

'সত বচন' বলে ভাইজী তাড়াতাড়ি বাজারের দিকে এগোলেন। উনি ভাবতে লাগলেন, জাঠদের মাথা দেখছি একেবারে মোটা। উনি করলেন কি, দু-আনার 'সরদাই' কিনে বাকী দু-আনা সার্টের পকেটে রেখে দিলেন।

বাড়ি পৌঁছে ভাইজী দেখলেন, সাঙ্গোপাঙ্গরা দমাদম করে বাদাম ভাঙছে। দেবা সিং বলল, ভাইজী, আপনি তো জিনিস কিনতে গিয়ে বুড়ো হয়ে গেলেন. দিন, এদিকে দিন। ও ভাইজীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

ভাইজী সার্টের পকেট থেকে পুরিয়া বার করে তাড়াতাড়ি এগিয়ে দিয়ে বললেন, মহারাজ আমি তো দৌড়তে দৌড়তে গিয়েছি ···।

মজলিশের সকলে হেসে উঠল। সকলে ভাবল, ভাইজী বোধ হয় সকাল থেকেই সিদ্ধির নেশায় চুর হয়ে আছে—নয়তো কে জানে কী হয়েছে। সরদাই-এর প্যাকেটটি ওঁর পকেটের ভেতর খুলে গিয়েছিল। উনি শুধু দেবা সিং-এর হাতে কাগজটাই তুলে দিয়েছিলেন। কাগজে কিছু সরদাই লেগে ছিল। আর বাকী জিনিসগুলি পকেটের ভেতরেই রয়ে গিয়েছিল।

ভাইজী বেশ একটু লজ্জা পেলেন। পকেট থেকে একটা একটা করে সরদাই বার করে শিলের ওপর রাখতে রাখতে তিনি বললেন, দেখুন-না মহারাজ, এই বেনিয়া দোকানদারগুলো একেবারে উল্লুক। একটা পুরিয়া বাঁধতেও তারা জানে না অথচ মার পেট থেকে পড়েই সব দোকানে এসে বসে।

সারা মজলিশের লোক ভাইজীকে ঘিরে বসল। আর শিল-নোড়া নিয়ে ওদের সিদ্ধি বাটার কসরৎ শুরু হয়ে গেল। বাটতে বাটতে যখন সিদ্ধি সুর্মার চেয়েও মিহি হয়ে গেল তখন লক্ষা সিং বলল, নাও, এবার শেষ কর। সারা রাত এখানেই থাকবে নাকি।

ভাইজী একপাশে বসে গেলাস ধুচ্ছিলেন। একটা বাটিতে কিসের একটু দাগ লেগে ছিল। আঙুল দিয়ে ঘষে ঘষে দাগটি তোলার চেষ্টা করতে করতে বললেন, এখনও হয় নি মহারাজ, আরও একটু বাটুন। মহাত্মা লোক বলে গেছেন—

সিদ্ধি বাটার মজা হল, যত করবে বিলম্ব
ততই তার বাড়বে গুণ বলেছেন স্বয়ং শিব শম্ভু।

আজ কোথা থেকে এক নির্মলা সাধু[১] এসে গুরুদ্বারে আস্তানা গেড়েছিলেন। তিনি এই মজলিশের এক কোণে বসে ভাবরসামৃতের টীকা পড়ছিলেন। ভাইজীর মুখে কবিতা শুনে ওঁর মন পুঁথি থেকে ওই দিকে আকৃষ্ট হল। তিনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, ভাইজী সাহেব, মনে হচ্ছে আপনি একজন কবি কিন্তু আপনি ছন্দ মেলান নি। ভাইজী একটু মাতব্বরি করার জন্য বলে উঠলেন, মহারাজ, একে বলে 'সিরখণ্ডী ছন্দ।' বড় বড় কবিরা এই ছন্দেই কবিতা লিখতেন। দেখুন না, এক কবি বলেছেন,

মুখের ওপরে যার গঙ্গা বিশ্বনাথ কৈলাশপতি
যিনি তাঁকে ভজেন, তিনিই সুখী তার ওপরে রাখ মতি।

আর-কেউ কবিতার মানে কিছু বুঝতে পারল না। কিন্তু নির্মলা সাধু চুপ করে থাকতে পারলেন না। উনি হেসে বললেন, ভাই-সাহেবজী একে তো 'সোরঠা' বলে। আর মনে হচ্ছে, এ কবিতাটা আপনার রচনাও নয়— "মুখের ওপরে যার গঙ্গা"। বাঃ! কী সুন্দর অলংকার। গঙ্গা শিবজীর মুখ থেকে বার হয়েছে না মাথা থেকে?

সিদ্ধির ঘোর নেশায় ভাইজীর খেয়ালই ছিল না। এই মূর্খগুলোর মধ্যে একজন অত্যন্ত জ্ঞানী লোক বসে আছেন। এবার উনি একটু বিরক্ত বোধ করতে লাগলেন। ভাবতে লাগলেন, এই জ্ঞানী সাধুর কাছ থেকে কী করে সরে পড়া যায়। উনি পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বললেন, মহারাজ, 'সোরঠা' আর 'সিরখণ্ডী' একই ছন্দ। কবিরা শুধু আলাদা আলাদা নাম রেখেছেন।

সাধুর আরও হাসি পেল। তিনি বললেন, ঠিক আছে জ্ঞানী মহারাজ, আমি বুঝতে পেরেছি। কেননা, এই দুই ছন্দকে যখন এক বলে মনে করছেন তখন তো আপনি মস্তবড় পণ্ডিত। নিজেদের 'ভাইজীর' এই জয়লাভে সবাই খুব খুশি হয়ে হাততালি দিতে লাগল। এই আনন্দের রেশ কাটতেই আধঘণ্টা লেগে গেল।

১ এক ধরনের সাধু সম্প্রদায়

পালা সিং আঙুল দিয়ে শিলের কোণে বাটা সিদ্ধি কাঁখতে কাঁখতে বলল, ভাইজী, আর সিদ্ধি পিষতে হবে নাকি ?

—ব্যস—মহারাজ ব্যস। এই বলে ভাইজী কাঁধ থেকে গামছাটা নামিয়ে আগে ভাগে গিয়ে বসলেন। বসার সময় ওঁর হাঁটুর হাড় থেকে এক বিচিত্র আওয়াজ বেরুল। মনে হল বুঝি একটা পটকা ফাটল। পালা সিং থলির ভেতরে রাখা গুড় আঙুলের চাপ দিয়ে ভাঙতে ভাঙতে বলল, হ্যাঁ, ভাইজী সত্যি, আজ আর-একটা কথা মনে রাখবেন। দু-রকমের সিদ্ধি তৈরি করতে হবে। ফৌজী লোকদের জন্য একধরনের আর রংরুটদের জন্য। (হাত ইশারা করে) এই সরদারজী গণ্ডা সিং-এর জামাই। ইনি এই প্রথম শ্বশুরবাড়িতে আসছেন। দেখবেন, এমন-কিছু না হয় যে শ্বশুরবাড়ি আসাই বন্ধ হয়ে যায়। আর ইনি হলেন বাসব সিং। ইনি মান সিং, নতুন ভরতি হয়েছেন। 'সত বচন' এই বলে ভাইজী নিজের কাজে লেগে গেলেন। আর কিছুক্ষণের মধ্যে নিজের কাজ শেষ করলেন।

গণ্ডা সিং-এর জামাই প্রতাপ সিং শহরের ছেলে। কিন্তু লেখা-পড়ায় একেবারে অষ্টরম্ভা। কিন্তু ও যখন কলার তুলে নেকটাই পরে বেরোতো তখন ওকে কিছুতেই বি. এ.-এম. এ. পাসের কম বলে মনে হত না। ও বেচারা এর আগে কখনও এত ভাঙ-সিদ্ধি খায় নি। আজ এই সিদ্ধিবাজদের আড্ডায় এসে ফেঁসে গিয়ে সে ভাবতে লাগল —এখন ঠাকুর একমাত্র সহায়।

সকলকে সিদ্ধি দেবার সময় প্রতাপ সিং যখন দেখল, এবার ওর নিজের খাওয়ার পালা তখন তার পিছনে বসে থাকা ভাইজীর পিঠে খোঁচা মেরে বলল, ভাইসাহেবজী, সয়ায়া ডালিয়েগা[১] ভাইজীর খালসা ভাষায় তত জ্ঞান ছিল না। উনি ভাবলেন, 'সয়ায়া' মানে বুঝি 'একটু বেশি' করে আমাকে দিন। নেশাখোরদের এই কথা শুনেই রাগ চড়ে যায়। কেউ যদি বড়াই করে যে অনেক টানলেও আমার নেশা হয় না, তখন অন্যরা তাকে হিংসা করতে শুরু করে।

১ সোওয়াটাক ঢালবেন।

তখন তাকে তারা এমন ঘন করে সিদ্ধি দেয় যাতে তার দেমাক সহজেই ভেঙে যায়। প্রতাপ সিং বার বার বলে ওঠে, কম করে দিন। কম করে দিন।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। ভাইজী একটুখানি কমিয়ে সিদ্ধির গেলাস ওর হাতে দিলেন। প্রতাপ সিং ভয়ে ভয়ে সিদ্ধিটা খেয়ে নিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রায় চার ভাগের এক ভাগের মত পড়ে রইল। সকলকে চরণামৃতের ভাগ দিয়ে ভাইজী নিজে দু-গেলাস সিদ্ধি ঢক ঢক করে খেয়ে নিলেন।

এর একটু পড়ে রঙ্গ-রসিকতার কথাবার্তা শুরু হল। মুখে হাত বোলাতে বোলাতে উজগার সিং বলল, ভাইজী, আ—হা! আজ মনে হচ্ছে স্বর্গের দোলনায় দুলছি। এখন চুপচাপ থাকতেই ভাল লাগছে। চারিদিক গুলজার পেকে উঠেছে।

মুখ বন্ধ করে আর চোখ কুঁচকে ইন্দর সিং জবাব দিল, কী বললে? গুলজার পেকে উঠেছে। আরে তুই নোড়ুবালের ঘুঁটে তৈরি করার যুগ্যি। 'গুলজার' খায় না পাকে? বতরশাখই তো পাকে।

চোখ খুলে মান সিং বলে উঠল, পালা সিং, ব্যাপারটা কী? তুই তো ব্যাটা নেশা করতে ওস্তাদ। পুরোনো পাপী। এখন থেকেই চোখ বোঁজাতে শুরু করেছিস!

পালা সিং কষ্ট করে মুখঁ থেকে থুথু ফেলে বলল, মান সিং, তুই আবার আমায় বলছিস। এদিকে তোর চোখই বুঁজে আসছে।

মান সিং চমকে উঠে জবাব দিল, কী বললে? (এর পর আবার একটু সিদ্ধি খেয়ে নিল) না, আমার তো কিছু মনে হচ্ছে না।

—আরে এর কথাটা একবার শোন। তোমার চোখ দেখেই কি বোঝা যাচ্ছে না?

—আচ্ছা ভাই, তোমার যদি বিশ্বাস না হয় তা হলে তোমার যা ইচ্ছে হয় আমাকে জিজ্ঞাসা কর। যদি আমি ঠিক জবাব না দিতে পারি তখন বোলো।

পালা সিং বলল, আচ্ছা ভাই ঠিক আছে। পরে একটু ভেবে

নিয়ে ও বলল, আচ্ছা বল তো কালা সিং-এর মকদ্দমায় কোন্-কোন্ লোক সাক্ষী দিয়েছিল ?

জবাবের অপেক্ষায় পালা সিং যখন মান সিং-এর দিকে তাকাল তখন মান সিং-এর চোখ বুঁজে গিয়েছে। পালা সিং মনে করল, ওরই জিৎ হয়েছে, খুব খুশি হয়ে ওর কিছু বলার ইচ্ছে ছিল কিন্তু কী বলবে ভুলে গেল। যে কথাটা বলতে গিয়ে ও ভুলে গিয়েছিল সে খানিকক্ষণ তা মনে করার চেষ্টা করল কিন্তু ভেবেই পেল না বিষয়টা কি। আর-একটু ভাবার পর ও কার সঙ্গে কথা বলছে তা মনেই করতে পারল না।

শেষে অনেক চেষ্টা করার পর ওর সেই কথা মনে পড়ল যেমন করে কেউ হারানো জিনিস ফিরে পায়। আবার পাছে কিছু ভুলে যায় এই ভয়ে ও বলল, হ্যাঁ ও তো মান সিং।

কে কে সাক্ষী দিয়েছিল ?

জ্ঞান সিং-এর ঝিমুনি ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু পালা সিং-এর কোন কথা সে বুঝতে পারল না। সে বলল, কী বললে ?

আরও জোর করে চোখ খুলতে খুলতে পালা সিং বলল, কী ? আমি তো কিছু বলি নি।

(একটু ভেবে নিয়ে) হ্যাঁ, সত্যি, আমি বলেছিলাম, বলদটাকে আর হালে জুতবেন না, কাল সারারাত কুয়োতে জোতা ছিল।

মান সিং জিব কেটে বলল, এ সব কথা ছাড় তো। তুই তো বলেছিলি তুই তো বলেছিলি (কথা ভুলে গিয়ে) হ্যাঁ, পেয়েছি, কিন্তু ও আমার কাছ থেকে ভাড়ার দুটাকা (একটু থেমে) চলে গেল (হাসতে লাগল) পালা সিং মুখে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, আজকের দিনটা বেশ কাটল। আমার জীবনে এমন দিন কখনও আসে নি। কথা বলতে বলতে ওর কিছু খেতে ইচ্ছে হল। ও দেখল, প্রায় সেরটাক গুড় বেঁচেছিল, সামনে রাখা ছিল সেটি— ওরা সেটাও খেয়ে নিয়েছে। ও তখন বলল, ভাইজী, যান, কিছু খাবারদাবার নিয়ে আসুন।

ভাইজী নেশার ঝোঁকে টলছিলেন। কোন কথাবার্তা না বলে

একটা টাকা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ হাঁটার পর ওঁর সব-কিছু মনে পড়ে গেল। উনি তখন তাড়াতাড়ি দোকানের দিকে এগোলেন। আট আনার রেওড়ি কিনে বেশ শান্ত মনে বাড়ি ফিরে এলেন। এসে দেখলেন, রঙরুট ফৌজের সকলেই বেহুঁশ হয়ে পড়ে রয়েছে। এমন-কি পাকা ঘাগু সৈন্যরা পর্যন্ত কেউ ছাদের দিকে তাকাচ্ছে, ওদের মধ্যে কেউ হাসছে আবার কেউ নিজের জায়গায় ভূতের মত বসে আছে। কেউ হয়তো সামনে ঝুঁকে কাউকে ডাকতে গিয়েছিল তা সে সেই অবস্থাতেই রয়ে গিয়েছিল।

যাদের শুয়ে পড়বার মত অবস্থা তারা শুয়ে পড়েছিল। কিন্তু যারা জেগেছিল তারা এক নিমেষে ভূতের ভাতুর মত রেওড়িগুলো শেষ করে দিল। পাল্লা সিং তখন আর-একটা টাকা বার করে ভাইজীর হাতে দিল। ভাইজী তো বেরোতে রাজি হচ্ছিল না কিন্তু আট আনা থেকে কিছু হাতাবার লোভে আর প্রথম বারের রেওড়ি থেকে একটা দানাও পেটে না যাওয়ায় তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও দোকানের দিকে এগোলেন।

এইবার রাস্তায় বেরিয়ে ওঁর পুরো জ্ঞান ফিরে এল। তিনি এই সময় মনে রাখার চেষ্টা করলেন, যে কাজে যাচ্ছেন তা যেন কখনও না ভোলেন। আবার রাস্তাটাস্তাও যেন হারিয়ে না ফেলেন। ভাইজীর অবস্থাটা ঠিক সেই রকম, যে রকম অবস্থায় একজন জলমগ্ন ব্যক্তি তক্তায় চড়ে সাঁতার কাটতে চেষ্টা করে আর সাঁতার না জানলে তক্তাটা আরও জোরে চেপে ধরে। ওঁর ভয় হয় তক্তা থেকে হাতটা যদি খুলে যায় তা হলে ডুবে যাবেন।

ভাইজী নিজের কাঁধের গামছাটা কে জানে কোথায় ফেলে এসেছিলেন। (উনি ভুলেই গিয়েছিলেন যে এই গামছাতে রেওড়ি বেঁধে এনেছিলেন)। উনি ওটা খোঁজার জন্য চারপাই-এর নীচে গিয়ে বসলেন।

অনেকক্ষণ বাদে যখন ভাইজী রেওড়ি নিয়ে ফিরলেন না তখন পাল্লা সিং-এর রেওড়ির কথা খেয়াল হল। সে উঠে ভাইজীর খোঁজ করতে গেল, কিন্তু সেও ফিরল না।

এই-সব কাজে নির্মলা সাধু একজন পাকা লোক। ঘণ্টাখানেক বাদে ওঁর নেশার আমেজটা একটু ফিকে হয়ে এলে ওঁর খেয়াল হল যে তিন তিনটি লোক রেওড়ি আনতে গেল, একজনও তো ফিরল না। পরোপকার করার জন্য ভাবনায় উনি আর ঘরে বসে থাকতে পারলেন না।

উনি উঠে ওদের খোঁজে রাস্তার দিকে পা বাড়ালেন। এদিকে প্রদীপ জ্বালাবার সময় হয়ে গিয়েছিল।

উনি বাজারে পৌঁছলেন। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তিনজনের কারোরই সন্ধান পাওয়া গেল না। পরিশ্রান্ত হয়ে উনি যখন বাড়ি ফিরে আসছেন তখন দেখলেন রাস্তার এক জায়গায় কূপের জল জমে নোংরা কাদা হয়ে গিয়েছে, ঠিক তার ওপরে পালা সিং উপুড় হয়ে শুয়ে। বেশ কিছু লোক ওকে ঘিরে। ওর মধ্যেও পালা সিং নেশার ঘোরে বলে যাচ্ছিল, আমার সারা দেহে আগুন লেগেছে। আমার কাপড় জ্বলছে। জল ঢেলে আমি পেটের জ্বালাকে শান্ত করেছি। কিন্তু আমার পিঠ যে এখনও জ্বলছে। পিঠে বালতি ভরে জল ঢেলে দাও। হায় রে আমি মরে গেলাম।

সাধুজী সব-কিছু দেখলেন। তারপর চুপি চুপি আড্ডায় ফিরে এলেন। কিন্তু ভাইজীর কোন খবর পাওয়া গেল না। শোওয়ার জন্য সাধু চারপাইয়ের ওপর যেই বসেছেন অমনি নরম কিছু একটা পায়ে ঠেকল। অমনি নীচেটা ফাঁক করে দেখলেন, ভাইজী গুঁটিসুটি মেরে চারপাইয়ের তলায় শুয়ে রয়েছেন। তাঁর হাতের বন্ধ মুঠিতে টাকা।

সাধুজী ভাইজীকে হিড় হিড় করে বাইরে টেনে আনবার চেষ্টা করলেন। ভাইজী তত কুঁকড়ে যেতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, ধর ধর তোমরা এসে বচনকে ধর। সর্দার পালা সিংজী, আপনি বলেছিলেন না, ওর একটা ফয়শালা করবেন। (তাড়াতাড়ি) তাড়াতাড়ি কর। দেখ ও এসেই আমার টুঁটি চেপে ধরেছে, ও আমাকে (জোরে থুথু ফেলে) মেরে দেব। এস না। একবার ছুটে এস না। ও এসে আমার মুখে ধুলো বালি ভরে দিয়েছে। এস না

দেখি, আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। তোমরা এসে আমার মুখ থেকে ধুলো বালি বার করে দাও।

এদিকে সকলেরই তখন বেহুঁশ অবস্থা। ভাইজীর পাগলামির দিকে তাকাবার মত কারোরই অবস্থা নয়।

পরে সন্তজীর খেয়াল হল যে রাত হয়ে যাচ্ছে। এ লোকগুলোর এখন কী হবে! উনি সকলকে বকেঝকে ওঠাবার চেষ্টা করলেন। ওঁর চেঁচামেচিতে কিছু লোক উঠে কোনরকমে টলতে টলতে বাড়ির দিকে রওয়ানা দিল। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও প্রতাপ সিং আর উঠতে পারল না। সাধু মহারাজ ওর দিকে তাকিয়ে তো ভয় পেয়ে গেলেন। আর নিজের বিছানা-কমণ্ডলু নিয়ে ওখান থেকে সরে পড়ার মতলব করলেন। পরে ভাবলেন, তাই তো, এই অবস্থায় এখন দেখছি যাওয়াও মুশকিল। এই ভেবে ওখানেই শুয়ে পড়লেন।

পরের দিন যখন বেশ রোদ্দুর চড়েছে সাধু মহারাজ আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসলেন। উঠে চারদিক দেখে নিলেন। কিন্তু ভাইজীকে কোথাও দেখা গেল না। এই সময় ওঁর অবস্থা দেখে সত্যি কষ্ট হয়। গত রাতের কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল ভাইজী চারপাইয়ের নীচে শুয়ে ছিল। কিন্তু এখন তো ওকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। রাতে যে যুবকটি ফরাসে উপুড় হয়ে পড়েছিল— তাকেও এ সময় দেখা গেল না।

সন্তজীর এবার ভয় হল। উনি ঘর থেকে সরে পড়লেন। গ্রাম থেকে প্রায় আধ মাইলটাক গিয়েছেন এমন সময় দেখলেন, বচন সিং ভাইজীকে পিঠে করে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সন্তজী না দেখার ভান করে নিজের রাস্তা ধরলেন।

॥ ১৩ ॥

সারা গ্রামে হৈ-চৈ পড়ে গেল। সিদ্ধির আসরের ঘটনা নিয়ে গ্রামের সবাই আলোচনা করতে লাগল। যারা সেদিনের আসরে

গিয়েছিল তাদের বাড়ির লোকেরা কিছু না জানার ভান করল। কিন্তু গণ্ডা সিং-এরই বাধল বিপদ।

গণ্ডা সিং-এর জামাই সেই প্রথম শ্বশুরবাড়িতে এসেছে। কিন্তু সিদ্ধি খেয়ে রাতে সে চোখই খোলে নি। বচন সিং-এর কাছ থেকে শ্বশুর জানতে পেরেছেন তাঁর জামাই সেদিন গুরুদ্বারের ওই আসরে বসে সিদ্ধি টেনেছে। রাতে বচন সিং ওকে পিঠে করে বাড়ি পৌঁছে দিতে এসেছিল। সে সময় সে বলে, বচন যখন গুরুদ্বারে যায় তখন সেখানে ভাইজীকে দেখে নি। একজন সন্ত চারপাইয়ের ওপর শুয়ে ছিল আর প্রতাপ সিং চারপাইটার নীচে পড়ে ছিল।

গণ্ডা সিং-এর পরিবারের লোকেরা জামাইয়ের জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার জন্য অনেক চেষ্টা করলেন। ওর কানে তেল ঢেলে দিলেন। মাথায় ভাল করে মালিশ করা হল। সিদ্ধির নেশা কাটাবার জন্য মুখের ভেতর জোর করে আমের আচার গুঁজে দেওয়া হল। কিছু কি আর ওর মুখে যায়। দুধ ঘি একসঙ্গে মিশিয়ে মুখের ভেতর ঢেলে দেওয়া হল। কিন্তু তাও মুখ দিয়ে বাইরে গড়িয়ে পড়ল।

ধীরে ধীরে ছেলেটির অবস্থা খারাপের দিকে যেতে লাগল। চোখ পাথরের মত হয়ে গেল। চেহারা নীল হয়ে গেল। সারা শরীর নির্জীব হয়ে এল। ভয়ে সকলের মুখ শুকিয়ে গেল। পাশের গ্রামেই সরকারী হাসপাতাল। তাড়াতাড়ি গিয়ে সেখানকার ডাক্তারকে ডেকে আনা হল। ডাক্তারবাবু দেখে বললেন, জামাইকে বিষ দেওয়া হয়েছে।

রোগীকে তখন সরকারী হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভরতি করে দেওয়া হল।

এদিকে পালা সিং আর তার দলবলের ভয়ে হাত-পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যাচ্ছিল।

পালা সিং—এর ভয়টাই সবচাইতে বেশি কারণ পুলিশ যদি কাল রাতের ঘটনার কথা জানতে পারে তো সব দোষ ওর ঘাড়েই পড়বে।

প্রথম জীবনে ও বছর দু-তিন জেলের ঘানি টেনেছে। তারপর একনাগাড়ে পুলিশের সেবা ও সহায়তা করে তবে অনেক কষ্টে দশ-

নম্বরীর ঝামেলা থেকে উদ্ধার পেয়েছে। প্রতাপ সিং-এর অবস্থা দেখে আসার পর থেকে ওর ভয় আরও বেড়ে গিয়েছে।

ওর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। ও ভাবল, এক ঢিলে তুই পাখি মারবে। ও থানায় গিয়ে একটা ডায়েরি লেখাল যে জীবা সিং-এর ছেলে বচন সিং গণ্ডা সিং-এর জামাইকে সিদ্ধির সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে।

তুপুরবেলাতেই পুলিশ এসে গেল। একজন সিপাইকে জীবা সিং-এর বাড়িতে পাহারায় বসিয়ে দারোগাবাবু গণ্ডা সিং-এর বাড়ি এলেন।

ওদিকে একজন হাবিলদার বচন সিং-এর বাড়ি সার্চ শুরু করে দিল। আর-একজন অফিসার সুযোগ বুঝে গুরুদ্বারে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বেশ লোক জমে গেল। গুরুদ্বারে গিয়ে অফিসার দেখল, বচন সিং ভাইজীর মাথায় তেল মালিশ করছে, আর ভাইজী বসে বসে ঢুলছেন। পুলিশ তুজনকেই থানায় নিয়ে গেল। ফের বাড়ি সার্চ শুরু হল। ওরা যে জিনিসটা খুঁজছিলেন সেটি তাড়াতাড়িই পাওয়া গেল। খুব পরিশ্রম করতে হল না। এক কোণে একটা গামছা পড়েছিল। ভাইজী সিদ্ধি ছেঁকে তার ছিবড়েগুলো ওই গামছার মধ্যে রেখে-ছিলেন। তাড়াতাড়িতে ছিবড়েগুলো গামছার মধ্যেই ফেলে রেখে-ছিলেন, নয়তো গামছাটা পরিষ্কারই করে ফেলতেন।

ডাক্তারবাবুকে খবর দেওয়া হল। পুঁটলি খুলতেই সিদ্ধির সঙ্গে তুটো ঘষা তামার পয়সাও বেরিয়ে পড়ল।

এবার ডাক্তার আর পুলিশ বুঝতে পারল যে ঘষা পয়সা সিদ্ধির সঙ্গে মিশিয়ে শরবত তৈরি করে প্রতাপ সিংকে খাওয়ানো হয়েছে। বচন সিং আর ভাইজীর হাতে হাতকড়ি পড়ল। এদিকে জীবা সিং-এর বাড়িতেও নানান অশান্তি দেখা দিল।

পাশেই পালা সিং ও তার দলের লোকেরা দাঁড়িয়ে ছিল। সিদ্ধির নেশায় তাদের মাথা ঘুরছে। কিন্তু এই পরিস্থিতি দেখে সবাই নিজেদের সামলে রেখেছিল। সিদ্ধি থেকে তামার পয়সা বেরোতে দেখে তারা নিজেরাই হকচকিয়ে গেল। ওরা নিজেরাই বুঝতে পারল

না, সকলের অজান্তে কে এই পয়সাগুলো সিদ্ধির ভেতর রেখেছে।

কিন্তু যাই হোক-না-কেন, ওরা এই কথা শুনে খুব খুশি হল, যে বচন সিংকে ফাঁসাবার জন্য আর তার হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য ওরা এতদিন চেষ্টা করেছে কিন্তু পারে নি, সেই বচন সিংকে পুলিশ ধরেছে। তার বিরুদ্ধে সাক্ষীসাবুদও পাওয়া গিয়েছে। এর ফলে সোনায় সোহাগা হল। একে তো ওকে ঠিক মওকা মত ধরা হয়েছে তার ওপর প্রতাপ সিং-এর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা পুলিশের কাছে এজাহার দিয়েছে যে, রাত প্রায় নটার সময় বচন সিং তাদের জামাইকে কাঁধে করে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল। সে সময় বচন ওদের বলেছিল, প্রতাপ সিং খুব সিদ্ধি টেনে বেহুঁশ হয়ে পড়ে। পালা সিং-এর লোকজন এর সঙ্গে পুলিশের হাতে বেশ মোটা টাকা গুঁজে দিয়েছিল।

দুই আসামীকেই চালান করে দেওয়া হল। আদালতে মামলা উঠল। জীবা সিং সেদিন অসুস্থ। তার পক্ষ থেকে একজন উকিল আদালতে দাঁড়ালেন। পালা সিং তার সাক্ষ্যে বলল, ঘটনার দিন আমি বাড়িতেই ছিলাম। বিকেল পাঁচটার সময় যখন গুরুদ্বারে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন দেখলাম বচন সিং আর প্রতাপ সিং বসে সিদ্ধির শরবত তৈরি করছে। ভাইজী তখন পূজা-পাঠ করছেন, আমি একটু বসে পরে চলে এলাম। রাত ন-টার সময় আমি যখন গলি দিয়ে যাচ্ছি তখন আমি বচন সিংকে দেখলাম, সে প্রতাপ সিংকে পিঠে করে প্রতাপের শ্বশুরবাড়ির দিকে যাচ্ছে। আমি বচন সিং-এর নাম ধরে কয়েকবার ডাকলাম, কিন্তু ও কোন জবাব দিল না। এরপর পালা সিং-এর দলের লোকদের কয়েকজনের সাক্ষ্য ছিল। ওরাও সাক্ষীতে ওই একই কথা বলল।

যখন আসামীদের জেরা শুরু হল তখন ভাইজী তোতাপাখির মত বলে উঠলেন, 'আন কর কর'* আমাকে বচন সিং সিদ্ধি বাটতে বলেছিল। সিদ্ধি আনতে চার আনা পয়সাও দিয়েছিল। আমি দু'আনার···বলতে বলতে ভাইজী থেমে গেলেন।

---

* ভাইজীর কথার মুদ্রাদোষ, প্রতিটি কথার মধ্যে তিনি এই কথা ব্যবহার করতেন।

হাকিম একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। সরকারী উকিলকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আসামী নিজের ভাষায় 'আন কর কর' বলে কী বলছে? উকিল তখন ইংরাজিতে বুঝিয়ে দিলেন। হাকিম শুনে হেসে ফেললেন।

এজাহার দিতে দিতে ভাইজী বললেন, দু-আনার সরদাই নিয়ে এসেছিলাম হুঁজুর, 'আন কর কর', আমার কোন দোষই নেই। আপনি যার কসম খেতে বলবেন তারই কসম খাব।

বচন সিং-এর উকিলও পুরো ওস্তাদ। তাঁর জেরায় ভাইজী বিপর্যস্ত। সেই অবস্থায় ভাইজীকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কোন্ দোকান থেকে সরদাই এনেছিলেন?

—দেবী দয়াল হঠবেণিয়ার[১] ছেলের কাছ থেকে—আন কর কর কে··· ।

—ওকে আপনি কত দিয়েছিলেন?

—চার আনা।

—উনি আপনাকে কত ফেরত দিয়েছিলেন?

—দু আনা।

—আচ্ছা ওই দু-আনার মধ্যে খুচরো ক পয়সা ছিল?

পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল পালা সিং। সে হাত দেখিয়ে ভাইজীকে ইশারা করল। কিন্তু ভাইজীর তখন যেন কচি বাছুরের মত লেজে গোবরে অবস্থা। তিনি কিছুতেই পালা সিং-এর ইশারা বুঝতে পারলেন না। উনি বললেন, আট পয়সা।

উকিল আবার জিজ্ঞাসা করলেন, সেই পয়সাগুলো আপনি কি করলেন?

—আজ্ঞে আন কর কর কে, পয়সাগুলো আমি সার্টের পকেটে রেখে দিয়েছিলাম।

—আর সিদ্ধির প্যাকেটটা?

—তাও পকেটে রেখে দিয়েছিলাম···

—বাড়িতে গিয়ে আপনি সে পয়সাগুলো কোথায় রাখলেন?

১. দোকানদার

ভাইজীর তখন ভুলে যাওয়া কথাগুলো হঠাৎ মনে পড়ে গেল। উনি ঘাবড়ে গিয়ে বললেন,—হ্যাঁ মনে পড়েছে। পরে আমার পকেট থেকে মাত্র ছ'পয়সাই বেরোল, মনে হচ্ছে সম্ভবত তু-পয়সা সিদ্ধি পেশার সময়…আরে না সত্যি, (ভেবে নিয়ে) পয়সাগুলো হয়তো মাটিতে পড়ে গিয়ে থাকবে।

—আর যে পয়সাগুলো সিদ্ধি থেকে বেরিয়েছে (বেশ ধমকের সুরে) ও পয়সা কোথা থেকে এল ?

ভয়ে ভাইজীর পা কাঁপতে লাগল। পায়ের কাঁপুনিতে এক বিচিত্র আওয়াজ বেরুতে লাগল।

উকিল মশাই ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। বললেন, যদি বাঁচতে চাও সত্যি কথা বল, কী হয়েছিল ? তা না হলে কিন্তু সারা জীবন জেলে পচতে হবে। তখন বসে বসে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করবে।

ভাইজী মনে মনে যেখানে যত দেবতা ছিল, স্মরণ নিতে লাগলেন। উকিলের সামনে হাতজোড় করে বললেন, হুজুর, 'আন কর কর কে', আমি এবার সত্যি কথাই বলব। ও পয়সা তুটো আমার পকেট থেকেই সিদ্ধিতে পড়ে গিয়েছিল। পরে আমার খেয়াল হয়।

পালা সিং আর তার বন্ধুদের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। এবার ওরা বুঝতে পারল ওদের জীবন এখন এমন একজন মাঝির হাতে যার নৌকা ডুবু ডুবু।

উকিল সাহেব এবার বেশ মিষ্টি কথায় বললেন, সাবাশ, আমি সত্যিই আপনার ওপর খুশি হয়েছি। আপনি শিখ তার ওপর গুরুদ্বারের গ্রন্থী। আপনি মিথ্যা কথা বলতেই পারেন না। উকিল সাহেবের কাছ থেকে প্রশংসা শুনে ভাইজী আর চেপে রাখতে পারলেন না। উনি সব সত্যি কথাগুলো বলে ফেললেন। আর এও বললেন, যে এই ঘটনায় বচন সিং-এর কোন হাত নেই।

এরপর বচন সিং-এর জবানবন্দী নেওয়া হল। বচন সিং তার সাক্ষ্যে বলল, আমি ওই দিন সকাল সাতটার সময় আমাদের তহশীলে যাচ্ছিলাম। আমাদের এক জমি দেখাশোনার ব্যাপারে বাবা

আমাকে পাঠিয়েছিলেন। (বচন সিং-এর কথা যাচাই করে নেওয়ার জন্য তহশীলদারের সাক্ষ্য নেওয়া হয়)।

রাত আটটা সওয়া-আটটা নাগাদ যখন গ্রামে ফিরছি তখন একবার ভাবলাম ভাইজীর সঙ্গে দেখা করে যাই। কেননা, গাঁয়ের ছেলে-মেয়েদের জন্য গুরুদ্বারে একটা স্কুল খোলার ব্যাপারে ওঁর সঙ্গে আমার কথাবার্তা চলছিল।

আমি গুরুদ্বারের ওপরের ঘরে গিয়ে দেখি ভাইজী নেই। একজন নির্মলা সাধু চারপাইয়ের ওপর শুয়ে আছেন। (ওই সাধুকে ওই দিনের পর আর দেখা যায় নি) আর প্রতাপ সিং ওই চারপাইয়ের নীচে শুয়ে।

আমি দুজনকেই জাগাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তারা জাগল না। পাশে রাখা সিদ্ধির পাত্র দেখে বুঝতে পারলাম যে ওরা সিদ্ধি খাচ্ছিল। প্রতাপ সিং-এর অবস্থা দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। ও গ্রামের জামাই তাই ওকে তুলে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিলাম।

সকালে আমি যখন ক্ষেতের দিকে যাচ্ছিলাম তখন কে যেন এসে বলল, জলার ধারে একজন শিখের দেহ পড়ে রয়েছে। ওঁকে উঠিয়ে গুরুদ্বারে নিয়ে এলাম। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর ওর যখন জ্ঞান ফিরে এল, তখন ও বলল, জানি না, সিদ্ধির নেশায় কখন চারপাইয়ের নীচে চলে গিয়েছিলাম। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় জল আনার দরকার হল! ' জল নিয়ে আসার জন্য আমি কোনরকমে বাইরে বেরুলাম। কাছেই আর্যদের একটা বাগান ছিল। আমি সেখান থেকে জল নিয়ে যখন ফিরছি, তখন কোথা থেকে আসছি, কোথায় যাব কিছুই হুঁশ ছিল না। কোন্ সময় এবং কোন্ রাস্তা ধরে আমি জলার ধারে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যাই তা আমি কিছুই জানি না।

এরপর প্রতাপ সিং-এর সাক্ষ্য। ও হাসপাতালে ছিল। সেখান থেকে তাকে আনা হয়েছে। কথা বলার ক্ষমতা একদম নেই। ওকে যেমনটি শিখিয়ে পড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল সেগুলিই একটু এদিক-ওদিক করে কোনমতে বলল।

কিন্তু উকিল সাহেবের জেরার কাছে ওকে হার মানতে হল।

মামলার চেহারাটাই একেবারে পালটে গেল। পালা সিং, গ্রন্থী আর তাদের পাঁচ বন্ধুকে আদালত গ্রেফতার করতে হুকুম দিল। আর কিচ্ছুক্ষণ পরে আদালত এই মর্মে রায় দিল :

বচন সিং বেকসুর খালাস। ভাই দশোধা সিংকে একজনের জীবননাশের চেষ্টা করার অপরাধে এক বছরের জেল দেওয়া হল। ভুল রিপোর্ট দেওয়ার অপরাধে ১৭৭ ধারা অনুসারে পালা সিং-এর দু' বছরের জেল হল। মিথ্যে সাক্ষী দেওয়ার অপরাধে ১৯৬ ধারা বলে বাকী পাঁচজনের ছ'-মাসের জেল দেওয়া হল।

॥ ১৪ ॥

যদিও পালা সিং আর তার দলের লোকেরা ও সেই সঙ্গে ভাইজী তাদের কৃতকর্মের উচিত ফলই পেয়েছিল কিন্তু পালা সিং-এর দলের লোকজনের কাছে এর উলটো প্রতিক্রিয়া হল। বচন সিং-এর প্রতি রাগে তারা দাঁত পিষতে লাগল। বিশেষ করে পালা সিং-এর কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু এই অপেক্ষায় ছিল যে পালা সিং কবে জেল থেকে বেরোবে আর বচন সিং-এর ওপর বদলা নেবে। বন্ধুরা গ্রামে রটিয়ে দিল যে, পালা সিং-এর সঙ্গে বচন সিং-এর শত্রুতা ছিল। এইজন্যে সেই-ই সিদ্ধির মধ্যে পয়সা ঢেলে দিয়েছে। আর ভাইজীকে জপিয়ে তাকে দিয়ে উলটো সাক্ষী দিয়ে সবাইকে ঝুলিয়ে দিয়েছে।

এদিকে বচন সিং ভাবতে লাগল যে, নিরক্ষরতাই গ্রামের লোকদের দুর্দশার কারণ। গুরুদ্বারের মত পবিত্র স্থানটিতে গাঁজা-আফিমের আড্ডা বসিয়ে ওরা নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ করছে। বচন সিং এই অজ্ঞানতা দূর করার জন্য সত্যিকারের কী করা যায় ভাবতে লাগল।

ভাবতে লাগল কী করলে আবার গ্রামের লোক একে অপরকে ভালবাসবে।

অমৃতসর থেকে আসার সময় সেই বৃদ্ধ মহাত্মা (জ্ঞানী দীদার সিং) তাঁকে কথা দিয়েছিলেন যে, উনি বচন সিং-এর সঙ্গে দেখা করতে তাদের গ্রামে আসবেন। বচন তাঁকে এবার গ্রামে আমন্ত্রণ জানাল। উনি খুব শিগগির এসে পড়লেন।

জ্ঞানী দীদার সিং-এর বাড়ি শিয়ালকোটে। তাঁর দু-ছেলে ওখানে সাধারণ একটা কাজ করে। জ্ঞানী মহারাজ কিছুদিন আগেই ঠিক করে ফেলেছিলেন যে, অনেকদিন তো সংসার ভোগ করলেন, এবার জীবনের বাকী দিন ক'টা জনসেবা করে কাটিয়ে দেবেন। ওঁর দুই ছেলে প্রতিশ্রুতি দিল মাসে মাসে দশ টাকা করে পাঠাবে (তিনি যেখানেই থাকুন-না-কেন)। এ ছাড়া ওঁর কিছু জমানো টাকাও ছিল।

জ্ঞানী মহারাজের দর্শন পেয়ে বচন সিং খুব খুশি হল। জ্ঞানী মহারাজকে সে গ্রামবাসীদের দুঃখদুর্দশার কথা সব খুলে বলল।

শুনতে শুনতে জ্ঞানী মহারাজের চোখে জল এসে গেল।

বচন সিং যে মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে গিয়েছিল সে কথা শুনেও তিনি খুব দুঃখ পেলেন। উনি মনে মনে অনুভব করলেন, বচন সিং কতখানি সৎ, হৃদয়বান, নির্ভীক আর কর্মঠ যুবক। বচনের জীবনে পরিবর্তন আসতে দেখে তিনি মনে মনে খুব খুশি হলেন।

শেষ পর্যন্ত বচন সিং তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গুরুদ্বারের অবস্থা দেখালো। গুরুদ্বারের অবস্থা দেখে জ্ঞানীজী আর থাকতে পারলেন না। দীবানপুর গ্রামে কিছুদিনের জন্য থেকে গেলেন।

জ্ঞানীজী ধার্মিক, সরল, গুরুগতপ্রাণ আর মৃদুভাষী। উনি রোজ নিয়ম করে মাহেন্দ্রক্ষণে ঘুম থেকে উঠতেন। স্নান সেরে নিয়ে গুরু-কথামৃত পাঠ করতেন তারপর গুরুপূজা করতেন। জ্ঞানী মহারাজ গ্রামে আসায় গ্রামের জাঠদের লাভই হল। গুরুজী অমৃতবেলায় (মাহেন্দ্রক্ষণে) উঠে যখন কুয়ায় স্নান করতে যেতেন তখন কুয়ার চাকার আওয়াজে জাঠ কৃষকদের ঘুম ভেঙে যেত। তখন তারা হাল-গোরু নিয়ে ক্ষেতের দিকে রওয়ানা দিত। ধীরে ধীরে জাঠদের বাড়ির মেয়েরাও জ্ঞানী মহারাজকে দেখে প্রভাবিত হল। যখন তারা

পুরুষদের খাবার দেওয়ার জন্য মাঠে যেত তখন ফেরার সময় ফলমূল, তরকারী, আনাজ, ভুট্টা ইত্যাদি সঙ্গে করে নিয়ে আসত। আর এই-সব জিনিস তারা জ্ঞানী মহারাজকে প্রণামী হিসাবে দিত।

কিছুদিন আরও কেটে গেল। আজকাল কখনও কখনও জাঠরা মাঠ থেকে ফেরার সময় হাল-বলদ বাইরে রেখে, মাথা ঢেকে গুরুদ্বারের ভেতর ঢুকে গুরুজীকে প্রণাম করে যায়।

বচন সিং-এর চেষ্টায় জ্ঞানী মহারাজ জাঠদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের এক জায়গায় করে পড়াতে লাগলেন। এক ছুতোর মিস্ত্রির ছেলেকে দিয়ে দশ-পনেরটি স্লেট তৈরি করালেন।

সরকণ্ডী গাছের এক বাণ্ডিল কাঠ আর সামান্য গেরী আর মাটি দিয়ে গ্রামের কুমোরকে দিয়ে কিছু লেখার সরঞ্জাম তৈরি করালেন। তারপর সেগুলি শিশুদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। জাঠদের বকে-যাওয়া ছেলেমেয়েগুলোকে সারাদিন ধরে এক জায়গায় বসিয়ে রাখতে প্রথম দিকটায় বেশ বেগ পেতে হল। জমি চাষের প্রথম দিকটাই ঝামেলার।

কিন্তু জ্ঞানীজী তাঁর মধুর স্বভাব দিয়ে ছেলেমেয়েদের সহজেই বশ করে নিলেন।

জ্ঞানী মহারাজ যেন মনের মত কাজ পেলেন।

সারাদিন বাচ্চাদের লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। একটা বাচ্চাকে যখন একটা কলম দিতেন, তখন আর-একটি বাচ্চা বলে উঠত, ও জ্ঞানীজী, এই দেখুন, মন্নু আমার কলম ভেঙে দিয়েছে। জ্ঞানীজী তার জন্য একটা নতুন কলম তৈরি করে দিতেন। এই সময় হয়তো আর-একটা বাচ্চা বলে উঠত, জ্ঞানীজী, দেখুন-না, বংতো আমার সাঙ্গ' নিয়ে নিচ্ছে। অন্যদিকে হয়তো ওদিকে বসা মেয়েদের মধ্যে গুঁতোগুঁতি বেধে যেত আর জ্ঞানীজীকে গিয়ে তাদের ঝগড়া মিটিয়ে দিতে হত।

এই-সব পাখিদের পড়ানোর জন্য জ্ঞানীজী দিনরাত মনপ্রাণ ঢেলে

দিলেন। দু-মাস তো স্রেফ কেটে গেল কী ভাবে ইস্কুলে বসতে হয় তা শেখাতে।

যখন হাওয়ায় জ্ঞানী মহারাজের সাদা দাড়ি ওঁর বুকের ওপর ফুরফুর করে উড়ত, তখন ওই চঞ্চল ছেলেমেয়েরা হেসে খুন হয়ে যেত। জ্ঞানী মহারাজ যদি একবার ওদের চোখের আড়াল হতেন অমনি মেয়েগুলো নিজেদের মাথা থেকে দোপাট্টাগুলো খুলে ফেলত। তারপর স্লেট নাচিয়ে নাচিয়ে থাল খেলা শুরু করে দিত। কখনও নিজেদের মধ্যে বিনুনি বেঁধে ভাঙ্গড়া নাচ নাচত। কিন্তু জ্ঞানীজী আশাবাদী ছিলেন। উনি ভাবতেন একদিন-না-একদিন বাচ্চারা নিশ্চয়ই উন্নতি করবে।

একদিন জ্ঞানী মহারাজ আর বচন সিং বসে কোন-একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিল। তাঁদের সামনে চাটাইতে বসে ছেলে-মেয়েরা পডছিল। তাঁদের আলোচনার বিষয় ছিল সেবা। জ্ঞানীজী বলছিলেন, দেখ, সেবা করা বড় কঠিন কাজ। সেবার নাম করে লোকে আজকাল যা করছে অনেক সময় তা সেবা নয়।

জ্ঞানী মহারাজের প্রতিটি কথা বচন সিং-এর মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল। বচন সিং-এর আরও কিছু জিজ্ঞাসা করার ছিল।

এই সময় ওর দৃষ্টি আর কারও দিকে গিয়ে পড়ল। তার মুখটা ছিল দরজার দিকে। ও অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ্য করছিল যে দরজার বাইরে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বয়স বছর বার-চোদ্দ। ওর মাথায় ময়লা জিনিসপত্র বোঝাই একটি ঝুড়ি ছিল। ঝুড়ির ভার বইতে তার বেশ কষ্ট হচ্ছিল। মাঝে মাঝে ঝুড়িটা মাথায় রাখতে যখন ওর ঘাড় ব্যথা হয়ে যাচ্ছিল তখন সে ওটা মাথা থেকে নামিয়ে হাতে করে রাখছিল। ওর রূপ দেখে মনে হচ্ছিল কালো মেঘের মধ্যে যেন ক্ষণিক বিদ্যুতের চমক।

বচন সিং দেখল, দরজার পাশে বসে যে-সব ছেলে-মেয়েরা পড়ছিল তারা ওই মেয়েটিকে দেখে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি শুরু করেছে। তাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ আখ খেয়ে ছিবড়েগুলো মেয়েটির দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে। একটি দুষ্টু মেয়ে চাটাই থেকে কাঠি ছিঁড়ে

মেয়েটির দিকে ছুঁড়ছে। কেউ ওর গায়ে থু থু দিচ্ছে।

কিন্তু মেয়েটির এ-সব দিকে খেয়ালই ছিল না। সে এক দৃষ্টিতে ছেলেমেয়েদের স্লেট, বর্ণ-পরিচয়ের বই, লেখার সামগ্রীর দিকে তাকিয়ে ছিল।

ও আর-একবার দু-হাত দিয়ে ঝুড়িটা মাথায় তুলল। হঠাৎ ঝুঁড়িটা মাথা থেকে পড়ে গেল। মেয়েগুলো এই দৃশ্য দেখে বেশ মজার খোরাক পেয়ে গেল। হাসি চাপবার জন্য ওরা অনেক চেষ্টা করল কিন্তু দু-তিনটি মেয়ে তো মুখ বন্ধ করা সত্ত্বেও হাসি চাপতে পারল না। খিল খিল করে হেসে উঠল। জ্ঞানী মহারাজের কানে হাসির আওয়াজ এসে পৌঁছল। বেচারি মেয়েগুলো এবার লজ্জা পেয়ে গেল। তারা আর বাইরে তাকাতে পারল না। জ্ঞানী মহারাজ মেয়েদের থামিয়ে দিলেন। মেয়েরা তখন স্লেটের পিছনে মুখ রেখে চুপ হয়ে গেল। এরপর বচন সিং জ্ঞানীজীকে সব কথা খুলে বলল। ওই বিচ্ছু মেয়েগুলো ওই গরিব মেয়েটিকে অনেকক্ষণ ধরে উত্ত্যক্ত করছে।

জ্ঞানীজী এতক্ষণ ভেবেছিলেন যে মেয়েগুলো এমনি এমনি হাসছে। কিন্তু আসল কারণটা দেখেন নি। বচন সিং-এর কাছ থেকে সব কথা শুনে তিনি খুব রেগে গেলেন। বলে উঠলেন, খবরদার, আবার যদি তোরা উৎপাত করিস, দেখাব মজা। (বচন সিংকে) এদের নিয়ে আর পারছি না। এদের অনেক বলেছি কিন্তু এরা কেউ একটা কথাও শোনে না। কে যেন একটা সত্যি কথা বলেছিলেন, বাচ্চা মেয়ে, পাখি আর ছাগল এই তিন শ্রেণী দারুণ দুরন্ত[1] আর চঞ্চল হয়। এদের তো···

বচন সিং কথার মাঝখানে বলে উঠল, জ্ঞানীজী, এটা বুঝতে পারছি যে, আপনার হিম্মত আছে বলেই এই মূর্খগুলোকে আপনি অ-আ-ক-খ শেখাতে পারছেন (ছেলে-মেয়েদের দিকে দেখিয়ে) এরা কি পড়াশোনা করার পাত্র? এরা শুধু হেট্ হেট্ করে গোরু-মহিষ চরাতেই জানে। আর কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর বচন সিং বিদায় নিল।

---

১. অথরিথা।

॥ ১৫ ॥

বাবা রোড়ু রাম যখন দিনের রোজগার শেষ করে বাড়ি ফিরছিল, তখন রাস্তায় যেতে যেতে তার মনে পড়ে গেল, অনেকদিন বাড়ি ফেরার সময় ও সুন্দরীর জন্য কোন জিনিস নিয়ে যায় না। ও নিজের পাগড়ির কোণাটা খুলল। পাগড়ির ভেতর থেকে তিনটি ছোট থলি আর একটা পয়সা বার করল। নিজের আধ-ছেঁড়া ঝোলা খুলে একটি ছেঁড়া কাপড় বার করল। তারপর ওই কাপড়ের গাঁট খুলল। একটি বাড়ির রোয়াকে গিয়ে বসল সে। দিনের রোজগারের-পয়সাগুলো গুণে নিল। সব মিলিয়ে আজকের রোজগার তিন আনা। ও অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে ভাবল, এই পয়সায় কী কিনবে। শেষ পর্যন্ত ওর মনে পড়ল, সুন্দরী রোজ একটা বাজনা কিনে আনার জন্য বায়না করে। ও একটি মনোহারি দোকানে গেল। আড়াই আনা দিয়ে একটি বাজনা কিনে নিল। আর বাকী পয়সা দিয়ে মিষ্টির দোকান থেকে একটা বরফি কিনে তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে রওনা দিল।

বাড়ি পৌঁছে বাঁদরীটিকে দরজার কাছে ছেড়ে দিল। সুন্দরী সুন্দরী বলে ডাকতে ডাকতে ঘরের ভেতর ঢুকল রোড়ু। কিন্তু অন্য দিন যেমন সুন্দরী বাড়ির বাইরে বাবাকে অভ্যর্থনা করার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে আজ তেমন তাকে দেখা গেল না। না, ধারে-কাছে কোথাও সুন্দরী নেই।

তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এদিক-ওদিক দেখল। কিন্তু কোথাও সুন্দরীকে পেল না। ও রাগে জ্বলে উঠল। এই রাগটুকুর মধ্যে যে কতখানি ভালবাসা, কতখানি উত্তেজনা আর তার কতটুকুই বা ধৈর্যহীনতার প্রকাশ তা বলা মুশকিল।

তাড়াতাড়ি কুটীরের পিছনে গিয়ে পৌঁছল। দেখল সামনে খাড়া করা একটি চারপাই। তার পিছনে বসে সুন্দরী। আঙুল দিয়ে মাটির ওপরে কী যেন লিখে চলেছে সে।

বেচারা রোড়ুর ধড়ে এবার প্রাণ এল। ওকে দেখে সুন্দরী লেখা বন্ধ করে একটু মুচকি হাসল। আর হাত দিয়ে রোড়ুর কোমর

জড়িয়ে ধরে তার দিকে টানতে টানতে সুন্দরী বলল, 'বাবা এদিকে দেখবে এস।' রোড়ুকে নিয়ে লেখার জায়গাটায় বসিয়ে দিল সুন্দরী। তার পিছনে গিয়ে দুহাত বাবার পিঠে রেখে সে বলল, এদিকে দেখ বাবা, এদিকে দেখ। সুন্দরী ওর সামনে দাঁড়িয়ে এমনভাবে লাফালাফি করতে লাগল যেন সে টাকা ভরতি একটা কুঁজো পেয়েছে।

রোড়ু মুগ্ধ দৃষ্টিতে সুন্দরীর এই শৈশব চাপল্য দেখছিল। ও গভীর স্নেহে সুন্দরীকে কাছে টেনে নিল। মাথায় চুমু খেয়ে জিজ্ঞাসা করল, এখানে এ-সব কী হিজিবিজি কাটছিস খুকী? সুন্দরী নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। মাটির ওপর লেখা অক্ষরগুলোর দিকে রোড়ুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে বলল, হিজিবিজি নয় বাবা। (অক্ষরের ওপর আঙুল রেখে) এই দেখ বাবা একটা 'ওড়া'[১]। আর এই দেখ, 'সস্‌সা'[২] আর এইটা (একটু ভেবে নিয়ে) দাঁড়াও, দাঁড়াও, নামটা ভুলে যাচ্ছি···হ্যাঁ, এটা হল 'পন্না'[৩]। বেচারা রোড়ু আর কী করে জানবে, কাকে বলে স আর কাকে বলে প। ও হাসতে হাসতে বলল, বা রে আমার পড়ুয়া মেয়ে! হ্যাঁরে খুকী, কেমন করে লেখে তুই কী করে জানলি?

—হ্যাঁ, বাবা, ওরা তো এইভাবেই লিখছিল।

—কারা?

—ওই মেয়েগুলো, আবার কারা?

—কোন্ মেয়েগুলো?

—ওই যে যারা গুরুদ্বারে পড়ে।

—কিন্তু খুকী তুই কী করে জানলি, ওরা এইভাবে লেখে?

—হ্যাঁ, আমি শিখে ফেলেছি। আমি তো রোজ দেখি, আজও দেখেছি। যখন আমি ময়লা ফেলতে যাই, তখন ওরা লেখে।

—ওরা লিখুক গে। তোর কী?

—জেদী বাচ্চা মেয়ের মত কাঁদো কাঁদো মুখ করে সুন্দরী বলল, না, বাবা, আমিও লিখব। কেমন যেন আনমনা হয়ে গেল রোড়ু। একটু হেসে সে সুন্দরীর চিবুক ধরে বলল, দেখি আমার পড়ুয়া মেয়ের মুখখানা। পাগলি। লেখাপড়া কি আমাদের কাজ?

---

১. পাঞ্জাবি বর্ণমালার প্রথম অক্ষর। ২. স ৩. প

সুন্দরীর মন নিরাশায় ভরে উঠল। ও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রোডুর দিকে তাকিয়ে বলল, তা হলে কাদের কাজ ?

—মা, ওরা সব সরদার মহাজনের মেয়ে আর আমরা হলাম গরিব ভিখারি। এ-সব কাজ করে আমাদের হবেই বা কী ?

ভিখারিরা লেখাপড়া করে না শুনে সুন্দরীর দেহ-মন নৈরাশ্যে ছেয়ে গেল— ও ভাবতে লাগল, তা হলে সত্যি সত্যি সে যা করেছে তা উচিত হয় নি। কিন্তু বাচ্চারা যেমন একটা কথা নিয়ে বার বার জেদ করে তেমনি সুন্দরীও বলল, বাবা আমি…আমাকে দিয়ে… আমি…কি, আমি কি কখনও লেখাপড়া করতে পারব না ?

ছোট্ট মেয়েটির হৃদয় এ কথা কিছুতেই মানতে চাইল না। ও তাই বার বার জেদ করতে লাগল— না বাবা ! আমি লিখব। বাড়িতে বসে লিখব। ওরা কী করে জানতে পারবে ? দিনের বেলা যখন ময়লা ফেলতে যাব তখন মেয়েরা কীভাবে অক্ষর লিখছে দেখে আসব আর রাতে—

রোডু কথার মাঝখানে বলে উঠল, চল্, আর আজেবাজে বকিস না। নে, এই নে। ও তখন সুন্দরীর হাতে বাজনা আর মিষ্টিটা দিল।

হ্যাঁ, কয়েক সপ্তাহ ধরে যে খেলনা আনতে সে রোডুকে ফরমাশ করছিল এই সেই খেলনা। রোডু ভেবেছিল, এই খেলনা পেয়ে সুন্দরী খুশি হবে। আনন্দের চোটে নাচানাচি শুরু করে দেবে। কিন্তু সুন্দরী কোন আগ্রহ না দেখিয়ে জিনিস দুটো হাতে করে নিল। তারপর ভেতরে গিয়ে এককোণে রেখে দিল।

॥ ১৬ ॥

বচন সিং রোজ নিয়মমাফিক জ্ঞানী মহারাজের কাছে গিয়ে বসত। দুজনের মধ্যে নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা হত। বচন সিং এই-সব আলোচনায় খুব আনন্দ পেত। জ্ঞানী মহারাজের সংসর্গে এসে ওর চেহারাই যেন বদলে গেল। ওর জীবনের গতি আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেল।

প্রতিদিন ও দেখে সেই মেয়েটি একটি ভাঙা ঝুড়ি, কখনও মাথায় নিয়ে, কখনও হাতে নিয়ে কত কষ্ট করে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে ছেলে-মেয়েদের লেখা দেখছে।

একদিন দুপুরে এমনি গুরুদ্বারে পৌঁছে সে দেখল, জ্ঞানীজী ছেলে-মেয়েদের পড়তে বলে কোথায় বেরোবার জন্য তৈরি হচ্ছেন। এমন সময় বচন সিং এল। জ্ঞানীজী জিজ্ঞাসা করলেন, আজ কোথায় যাবে?

আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি। কাপড়টা ময়লা হয়ে গিয়েছে। ভাবলাম, কুয়াতে গিয়ে কেচে নেই। এদিকে আপনার সঙ্গে গেলে বেশ ভাল হত। বেশ জমত।

তা চল-না কেন। জ্ঞানীজী বচন সিংকে সঙ্গে নিয়ে নিলেন। দুজনে যেই দরজার বাইরে এসেছেন এমন সময় ওই কুড়ুনি মেয়েটি খালি ঝুড়িটা একপাশে রেখে দেওয়ালের দিকে মুখ করে বসে বসে মাটিতে কিছু লিখছিল। ওর কাছে একটা ছেঁড়া কাগজের টুকরো ছিল তাই দেখে দেখে লিখে যাচ্ছিল মেয়েটি। মুক্তোর মত অক্ষরগুলো দেখে মনে হচ্ছিল যেন ছাপার হরফ— ওঁরা দুজনে দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন। ছেঁড়া কাগজটা বালবোধের প্রথম পাতা। মোটা মোটা হরফে ছাপা পাঞ্জাবি বর্ণমালা। পাতাটা ছেঁড়া, বিবর্ণ। মেয়েটি পাতাটি আঠা দিয়ে কোন রকমে জুড়েছিল। ওই কাগজটুকু সে এমন আলতো ভাবে ধরেছিল যেন একটা শাহী হুকুমনামা।

তারা দুজনে দুজনের দিকে তাকালেন। মেয়েটির হাতের লেখা দেখে দুজনেই খুব আশ্চর্য হয়ে গেল। যখন মেয়েটি শেষ অক্ষর লেখার জন্য বইটির দিকে তাকাল তখন তার দৃষ্টি পড়ল ওঁদের দুজনের দিকে। ও ভীষণ ভয় পেয়ে গেল! ঝুড়িটা ফেলেই পালাতে গেল। কিন্তু পালাতে পারল না। কয়েক পা গিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে রইল। মেয়েটির আশ্চর্য মেধা আর সুন্দর হাতের লেখা দেখে দুজনেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। মেয়েটি চার-পাঁচ পা গিয়েছে এমন সময় জ্ঞানী মহারাজ ডাকলেন, খুকী!

ডাক শুনে প্রথমে মেয়েটি ভাবল পালিয়ে যায় কিন্তু ওর পা আর চলল না। ও থেমে গেল। জ্ঞানীজী আবার ডাকলেন, খুকী, ভয়

পেয়ো না। আমি তোমাকে মারব না। এদিকে এস। আমার কথা শোন।

মেয়েটির ধড়ে প্রাণ এল। মাথা নিচু করে অপরাধীর মত সে ধীরে ধীরে সামনে এসে দাঁড়াল। জ্ঞানীজী তাকে আদর করে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা খুকী, তুমি কার কাছে লিখতে শিখলে? মেয়েটি আবার ভয়ে থর থর করে কেঁপে উঠল। ও বুঝতে পারল, ও চুরি করেছে। ওঁরা তাকে কৌশল করে কবুল করিয়ে নিতে চান। জ্ঞানীজীর কথার কোন জবাব তাই সে দিতে পারল না।

জ্ঞানী মহারাজ ওর মাথায় হাত রেখে, ওকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, কাকী[১] তোর ভয় নেই। আমি তোকে কিছুই করব না। তোর সুন্দর হাতের লেখা দেখে আমি সত্যিই খুব খুশি হয়েছি। তুই কোথা থেকে এমন লিখতে শিখলি?

মেয়েটি এবার একটু আশ্বস্ত হল। তার সংকোচ দূর হয়ে গেল। ও খুব আস্তে আস্তে বলল, আমি নিজেই লিখতে শিখেছি।

বচন সিং এতক্ষণ হতবাক হয়ে এই-সব দৃশ্য দেখছিল, মেয়েটির কথা শুনে ও ফস করে বলে উঠল, নিজে লিখেছ? কেউ শিখিয়ে দেয় নি? মেয়েটি জবাব দিল, না। মেয়েটির কথায় দুজনেই খুব খুশি হল। জ্ঞানীজী আবার জিজ্ঞাসা করলেন, এই অক্ষরগুলো সব চেন?

—হ্যাঁ জী।

—পড়ে শোনাও তো দেখি।

মেয়েটি তাড়াতাড়ি বর্ণমালা পড়ে শুনিয়ে দিল। আর বলল, আমি মুহারনীও জানি।

জ্ঞানীজী বচন সিং-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, বচন সিংজী, মেয়েটি তো বড়দের কাছ থেকে ভালই লেখা শিখেছে, কিন্তু পড়া?

মেয়েটি বলল, ছেলে-মেয়েরা রোজ দুপুরবেলা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ে। আমি তো রোজই শুনি।

জ্ঞানীজী ওর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, সাবাস খুকী, সাবাস। তুই বড় বুদ্ধিমতী মেয়ে। তোমার জন্য আমি স্লেট পেনসিল

---

১. বাচ্চা মেয়ে

এনে দিচ্ছি। তুমি লেখাপড়া চালিয়ে যাও। তোমার নামটা কি খুকী?

—জী, সুন্দরী।

—বচন সিং বলল, বাবাজী, ও সম্ভবত কোন অচ্ছুত কন্যা। আপনি দেখছি ওকে ছুঁয়ে বসে রয়েছেন। আমি অবশ্য অস্পৃশ্যতা মানি না। কিন্তু আমাদের গ্রামের লোকগুলো খুবই বদ।

জ্ঞানী মহারাজ জোর গলায় বলে উঠলেন, এই রকম একটা প্রতিভাবতী মেয়েকে কেউ যদি ছুঁতে না দেয়, লেখাপড়া শেখাতে না দেয় তা হলে তা অন্যায়। আমি এই-সব লোকদের একদম পরোয়া করি না।

বচন সিং আর কিছু বলল না। জ্ঞানীজী ভেতরে গিয়ে স্লেট পেনসিল আর দোয়াত কলম নিয়ে এলেন। এই-সব জিনিস মেয়েটিকে দিয়ে বললেন, নাও মা! রোজ মন দিয়ে লেখাপড়া করবে। যদি মনে কর, তা হলে এখানে এসেও পড়ে যেতে পার।

মেয়েটি জিনিসগুলি হাতে নিয়ে জ্ঞানী মহারাজের সস্নেহ কথাগুলি শুনল। ওর তখন কেমন মনে হচ্ছিল? মনে হচ্ছিল, যেন সে এতদিন অন্ধ ছিল। কোন্ এক দৈববলে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে। সবাই নিজের নিজের রাস্তা ধরল।

সুন্দরীর পায়ে যেন ততক্ষণে কে পাখা লাগিয়ে দিয়েছে। ও দৌড়তে দৌড়তে বাড়ি গিয়ে পৌঁছল।

॥ ১৭ ॥

—বাবা! ও বাবা দেখ, আমি কী এনেছি। এই বলে খুশিতে ডগমগ হয়ে সুন্দরী সব জিনিসগুলি বার বার রোডুকে দেখাতে লাগল। সুন্দরী বলল, তুমি যে বলেছিলে যে খবরদার পড়িস না, ওরা মারবে। এখন উলটে ওরাই আমাকে লেখাপড়া করতে বলছে। এই দেখ, কী সুন্দর স্লেট। আর দেখ সঙ্গে দু-দুটো কলম। সঙ্গে মুলতানি মাটিও দিয়েছে। আমি গুঁড়ো করে দোয়াতে কালি করব।

এবার থেকে আমি স্লেটে লিখব। কী মজা!

মেয়ের জিনিসগুলো দেখে রোডু ভাবনায় পড়ে গেল। কে এই জিনিসগুলো ওকে দিল? ওর ভয় হল, বোধ হয় এই জিনিসগুলো সুন্দরী কারও কাছ থেকে না বলেই নিয়ে এসেছে। এই ভেবে জিজ্ঞাসা করল, হ্যাঁরে এ-সব কার জিনিস নিয়ে চলে এসেছিস? যা, যার জিনিস তাকে দিয়ে আয়। দেখিস তোর জন্য কেউ না আবার মেরে আমার মাথাটা ফাটিয়ে দেয়।

—না বাবা! দেবীর নাম নিয়ে বলছি এই জিনিসগুলো জ্ঞানীজী নিজে হাতে আমায় দিয়েছেন। চল তোমার সামনেই ভজিয়ে দিচ্ছি। সুন্দরী রোডুর হাত ধরে টানতে লাগল।

সুন্দরীর কথার মধ্যে এক দৃঢ়তা ফুটে উঠছে দেখে, সেই সঙ্গে ওর সাহস দেখে ওর কথায় রোডুর বিশ্বাস হল। সুন্দরী যখন সব কথা খুলে বলল, তখন রোডুর মনে আর সন্দেহ রইল না।

সেইদিন থেকে সুন্দরীর লেখাপড়ায় উৎসাহ বেড়ে গেল। বাড়ির কাজকর্ম সেরে যেটুকু সময় বাঁচত সেটুকু সময় সে লেখাপড়া করত। এমন-কি, রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়েও সে লেখাপড়ার কথা চিন্তা করত। রোজ এক ঘণ্টা দু-ঘণ্টার জন্য জ্ঞানীজীর কাছে পড়তে যেত। জ্ঞানীজী মনে মনে চাইতেন যে, সুন্দরী আর-সব মেয়েদের সঙ্গেই একসঙ্গে ক্লাসে বসুক। কিন্তু কোন ঝামেলা হতে পারে মনে করে উনি দরজার বাইরে ওর বসার জন্য এক টুকরো চট বিছিয়ে দিতেন। এই চটে বসেই সে পড়াশোনা করত। এতে ওর পক্ষে ভালই হয়েছিল। কারণ সে যদি মেয়েদের মধ্যে বসত তা হলে তাদের উৎপাতে ওর মোটেই পড়াশোনা হত না। কিন্তু একান্তে বসে লেখাপড়াতেও বিঘ্ন দেখা দিল। ছেলে-মেয়েরা তার পাশ দিয়ে যাওয়া-আসার সময় তার পিছনে লাগত। কোন মেয়ে হয়তো আর-একটি মেয়েকে ধাক্কা মেরে সুন্দরীর ওপর ফেলে দিত আর তাকে ভেংচি কেটে বলে উঠত, "অড়োঁগলা, অড়োঁগলা, পরাই ভিট কোইনা"[১]

১. পাঞ্জাবি ছড়া

আবার যে মেয়েটি পড়ে যেত সে অন্য মেয়েদের ছুঁয়ে দেবার জন্য দৌড়ত। কেউ আবার ওর দোয়াতের কালি উলটে দিত। আবার কেউ তার কলমটা নিয়ে নিবটা খুলে বন্দুকের মত করে তার দিকে ছুঁড়ে মারত। সুন্দরী কখনও কারও বিরুদ্ধে নালিশ করত না। এতে করে ছেলে-মেয়েরাও মজা পেয়ে যেত। তারা উত্ত্যক্ত করা বন্ধ করত না।

এই সব-কিছু বাধা সহ্য করে সুন্দরী আপন মনে নিজের কাজ নিয়েই থাকত। কিন্তু ওর পড়াশোনার ব্যাপারে আর একটা অন্তরায় দেখা দিল। গ্রামের প্রতিষ্ঠিত পরিবারের লোকেরা ওকে দেখলেই ফিস ফিস করে কি যেন বলত। এ-সবই পালা সিং-এর দলের লোকজনের শাসানির ফল। এমন-কি, ওরা ছল-ছুতো করে জ্ঞানীজীকেও শাসিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তবু জ্ঞানীজী সুন্দরীকে পড়ানো ছাড়লেন না।

কথায় কথা বেড়ে গেল। চন্দ্রা সিং-এর মায়ের মৃত্যুর পর মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় যখন গাঁয়ের লোক তার বাড়ি এসে জড়ো হয়েছিল তখন সেখানেও সুন্দরীর বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেল। ওখানে জ্বালা সিং বলল, ডাক্তাররা গ্রামের কুয়ার ভেতর কী-সব ওষুধ ঢেলে দিচ্ছে। সুন্দর সিং বলল, ওষুধ তো আমাদের ভালর জন্যই দেওয়া হচ্ছে। সেদিন জীবা সিং-এর ছেলে বচন বলছিল, জলে ওষুধ দিলে যত রকমের জীবাণু থাকে মরে যায়।

নথ্‌থা সিং পাগড়িটা চোখের ওপর থেকে সরিয়ে বলল, আরে শোন কথা! ওষুধ দিলে রোগ তো আরও বাড়ে। মনে আছে, গত বছর কি হয়েছিল? ইংরেজরা ওষুধের বড়ি ছড়িয়ে দিয়েছিল। তাই খেয়ে সব ইঁদুর মারা পড়েছিল। পচা ইঁদুরের গন্ধে তারপর সকলের জীবন অতিষ্ঠ। অনেক বাড়ির লোক তো গন্ধের চোটে মারাই পড়েছিল। সুন্দর সিং বলল, ভাই, আমরা মুখ্যুসুখ্যু মানুষ। আমরা এ-সব কথা জানব কি করে। যে যেরকম কথা বলে, আমরা মেনে নি। ভাবি তাদের কথাই ঠিক। লেখাপড়া জানা লোকেরাই এই-সব কথা ভাল বোঝে।

এর মাঝে বাবা ভান সিং বলে উঠল, হ্যাঁরে হ্যাঁ, তোমাদের ওই লেখাপড়া জানা লোকদের আমার চেনা আছে। সত্যি কথা বললে হয়তো তোমরা রেগে যাবে, কিন্তু না বলেও থাকতে পারছি না। জীবা সিং ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে কী করল! নিজের আখেরটাই ঝরঝরে করে ফেলল। এই ছেলেগুলোর ইংরাজী পড়ে কী হবে। এরা তো অচ্ছুত চামারদের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করে দিয়েছে। কাল রাতে কে যেন বলছিল, বচন সিং বলাতে গুরুদ্বারায় জ্ঞানী মহারাজ এক অচ্ছুত মেয়েকে নাকি পড়াচ্ছেন।

আর একজন বলে উঠল, ভাই তুমি লাখ টাকার কথা বলেছ। আমি নিজে ওই মেয়েটিকে গুরুদ্বারের সামনে বসে থাকতে দেখেছি। ক-বার মনে মনেই ভেবেছি যে যাই, একবার জীবা সিংকে গিয়ে বোঝাই আর তা ছাড়া জ্ঞানী মহারাজকেও একবার জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু আবার ভাবলাম, কীই-বা হবে গায়ে পড়ে ঝগড়া করে। আর বেচারা জীবা সিং তো অসুস্থ। রাত দিন চারপাইতে শুয়ে শুয়ে কাটায়। ওকে বলে লাভই-বা কি? কিন্তু এই ধরনের কুকর্ম আর কতদিন চলবে? আজ মেয়েটি গুরুদ্বারে যাচ্ছে, কাল হয়তো কুয়ায় গিয়ে জল নিয়ে আসবে।

দ্বিতীয় একজন বলল, হ্যাঁ ভাই, আর কি! ওই ছোটলোকগুলো কি আর কথা শুনবে। মনে পড়ছে খনী গ্রামে সেবার কী ফ্যাসাদটাই বেধেছিল। ওখানকার খালসা বিরাদরীরা তো বলতে আরম্ভ করেছিল, চামার অচ্ছুতদের শুদ্ধি করে নেব।

তৃতীয় ব্যক্তি— ভাইসব, আমি তোমাদের মুখের ওপর স্পষ্ট কথাই বলব। এখনও অবস্থা সে রকম জটিল হয় নি। এখন থেকে যদি তোমরা জ্ঞানী মহারাজকে বারণ না কর তা হলে খনী গ্রামের মত এখানেও অমন গোলমাল শুরু হবে। কথায় আছে একে আর একেই এগারো হয়। একেই বচন সিং, তাই রক্ষে নেই তার ওপর দোসর জুটেছে জ্ঞানী মহারাজ।

আর একজন বলল, এই জন্যেই বলে সৎসঙ্গে স্বর্গবাস আর অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। ভাইজী দেবতুল্য লোক ছিলেন। সাতচড়ে মুখে

রা কাড়তেন না। আজে বাজে জিনিস নিয়ে কখনও মাথা ঘামাতেন না।

আর বড় ভাল লোক ছিলেন। যা বলা হত বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি— এই জন্যেই তো বচন সিং গ্রামে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে তার শত্রু হয়ে গেল। ওকে ওখান থেকে তাড়াবার ছুতোয় কখনও বলছে, ছেলে-মেয়েদের পড়াও। কখনও বলছে, গ্রন্থসাহেবের পুজো কর। কিন্তু ভাইজী ওর কথা শোনার লোক নন। তিনি …

তৃতীয় ব্যক্তি— আর কি! সেইজন্যই তো বচন সিং রেগে গিয়ে তাকে জেলে পুরে দিয়েছে। কিন্তু ভাই, আমরা কি তখন ভেতরের খবর জানতাম! ও (বচন সিং) যখন আমাদের কাছে এসে বলল, বাচ্চাদের ইস্কুলে দাও আমরা তখন ওর কথামত ছেলে-মেয়েদের ইস্কুলে দিয়েছি।

চতুর্থ ব্যক্তি— আচ্ছা ভাই তোমরাই বল ও বাচ্চাদের এতদিন ধরে কী পড়িয়েছে? আগে তবু বাচ্চারা বাড়ির কাজকর্ম একটু করত, এখন তাও গিয়েছে। ভাও[১], আমার মেয়েটা এতদিন ইস্কুলে যাচ্ছিল এখন যেতে বারণ করে দিয়েছি। এই-সব লেখাপড়া শিখে লাভ কি?

পঞ্চম ব্যক্তি—তুমি মেয়েকে পাঠাবে না অন্যরা পাঠাবে। আমি তো বাড়ি গিয়েই স্লেট-বইপত্তর সব কুয়োতে ফেলে দেব। আমার মেয়েটা বুঝলে, ঘরের কাজকর্ম ভালই করত। কিন্তু যেদিন থেকে লেখাপড়া শুরু করেছে সেদিন থেকে আর একটা কুটোও নাড়ে না। সব সময় জোয়ারের রুটি আর গুড় হাতে নিয়ে ঘরের কোণে বসে আছে।

ষষ্ঠ ব্যক্তি— যদি পালা সিং জেল থেকে বেরুতো তা হলে এতক্ষণে ওদের চাঁটি মেরে উড়িয়ে দিত।

সপ্তম ব্যক্তি— ভাই সব, মুখের কথা অনেক দূর পৌঁছে যায়। এই জন্যই তো আমি মুখ খুলতে চাই না। কিন্তু লোকে কি আর আসল কথা জানে না? পালা সিং আর …।

---

১. ভাই

আর একজন বলল, ছেড়ে দাও ভাই ও-সব কথা। এ সব কথা তুলে লাভ কি! ও তো আর বেশি দিন জেলে বন্ধ থাকবে না। আপীলে বোধ হয় ছাড়া পেয়ে যাবে। আমাদের এ-সব কথা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি!

অনেকক্ষণ ধরে এই রকম কথাবার্তা চলতে লাগল। কিন্তু কেউ কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারল না। কেননা, গাঁয়ের যিনি মাথা সেই পালা সিং আর তাঁর দলবল তখনও জেলে। .

॥ ১৮ ॥

বছর দেড়েকের মত অসুস্থ থাকার পর জীবা সিং-এর জীবনদীপ নিভে গেল। সংসারের সব ভার এসে পড়ল বচন সিং-এর ওপর। বচন সিং-এর মা ছেলের মুখ চেয়েই বেঁচেছিলেন। তাঁর আর কোন সন্তান ছিল না।

এদিকে পালা সিং আর তার বন্ধুরা জেলের মেয়াদ কাটিয়ে এক এক করে বেরিয়ে এল। ভাই দশোধা সিংও জেল থেকে ছাড়া পেল। পালা সিং জেলে থাকতেই শুনেছিলেন যে বচন সিং গুরুদ্বারে একজন নতুন গ্রন্থী এনে বসিয়েছে! এতে ওঁর সম্মানে দারুণ লাগল! উনি ঠিক করলেন যে গাঁয়ে পা দেওয়ার আগে নতুন গ্রন্থীর ব্যাপারটা নিয়ে তিনি একটা গোলমাল পাকিয়ে তুলবেন তারপর তাকে তাড়িয়ে দেবেন। সম্ভবত পালা সিং আর তার দলের দশোধা সিং-এর সাক্ষ্যের জন্যই তাদের জেল হয়েছিল। কিন্তু পালা সিং-এর ধারণা ভাইজীর নির্বুদ্ধিতা ও ছেলেমানুষির জন্যই তার জেল হয়েছে। সেইজন্য সে তাকে ক্ষমা করেছিল। সে একথা জানত যে ভাইজীকে দিয়ে পরে কাজ হবে। এই-সব কারণে সে ভাইজীকে ডেকে পাঠাল।

যেদিন পালা সিং জেল থেকে বেরুল সেদিন কয়েকটি বাড়ি ছাড়া আর সব জায়গা থেকেই সে সাদর অভ্যর্থনা পেল। ভাইজীর খাতির

ও সম্মান আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেল। সকলের মুখে এক কথা —দেবতার মত নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের ভাইজীকে এভাবে জেলে পাঠিয়ে বচন সিং-এর কী লাভ হল ! তাই তো ওর পাপের ফলে বাপটাও মরল। যত জোরজবরদস্তি সব গরিবের ওপরেই।

এবার জ্ঞানীজী গ্রামের সকলের চোখের বিষ হয়ে উঠলেন। এমন-কি, যে-সব পরিবার জ্ঞানীজীর পক্ষে ছিলেন তারাও তাঁর ঘোর শত্রু হয়ে গেলেন। কেউ কেউ তাদের ছেলেমেয়েদের গুরুদ্বার স্কুলে পাঠানো বন্ধ করে দিল।

জ্ঞানী মহারাজ নিস্পৃহ হয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত এই দায়িত্বের বোঝা থেকে তিনি মুক্ত হতে চাইলেন। বচন সিং অনেক করে বলল। কিন্তু তিনি শুনলেন না। উনি বুঝতে পেরেছিলেন যে গ্রামে এক মুহূর্ত থাকলে নানা রকম মামলাঝগড়া শুরু হয়ে যাবে। কে জানে বাবা কিসের থেকে কি হবে।

পালা সিং-এর বন্ধুদের ধারণা ছিল জ্ঞানী মহারাজকে গুরুদ্বার থেকে হঠানোর জন্য বেশ হুজ্জোতি করতে হবে। কিন্তু তার আর দরকার হল না। ভাই দশোধা সিং চুপি চুপি গিয়ে গুরুদ্বারে আবার বসলেন।

ভাইজীর এ কথা জেনে আরও খারাপ লাগছিল যে জ্ঞানী মহারাজ গুরুদ্বারের চেহারাটা ফিরিয়ে এনেছিলেন। তিনি ভাবলেন, যে রকম ভাবে হোক উনি গুরুদ্বারের চেহারাটা ওর চেয়েও ভালভাবে বদলে দেবেন। গ্রামে যারা এখন জ্ঞানী মহারাজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ তারা যেন কিছু বলার সুযোগ না পায়।

সামনে গুরুনানকের জন্মদিন— গুরুপরব। ভাইজীরা গুরুদ্বারে কিছু রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। উদ্দেশ্য গুরুদ্বারের আরও আকর্ষণ বাড়ানো।

গুরুদ্বারে পা দিয়েই ভাইজী সকলকে বলতে লাগলেন, বচন সিং ঘুষ দিয়ে হাকিমকে হাত করে। বচন সাক্ষীদের দিয়ে উলটো সাক্ষী দেওয়ায়। যার ফলে সকলকে জেল খাটতে হয়। এ সব বলার দরুন লোকদের কাছে ভাইজীর আরও শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। বচন সিংকে

তারা রক্তচক্ষু দেখাতে শুরু করল। লোকেরা এই বলে বচন সিং-এর বদনাম করতে লাগল যে সে এক অচ্ছুতের মেয়ের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করছে। সে রোজ মেয়েটিকে পড়াবার ছুতো করে রোডুর বাড়িতে যায় আর কয়েক ঘণ্টা মেয়েটির সঙ্গে কাটিয়ে আসে। গ্রামের লোকেরা ঠিক করল, গুরুপরবের দিন সকলের সামনে বিষয়টি তোলা হবে এবং এর একটা ফয়সালা করা হবে।

এখনকার সুন্দরী আর আগের সেই সুন্দরী নেই। লেখাপড়া শিখে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানী মহারাজ আর বচন সিং-এর সংস্পর্শে এসে ওর চিন্তাধারাটাই একেবারে বদলে গেছে। এখন তো সে শিখ সিদ্ধান্ত। সাহিত্য আর ইতিহাস সম্পর্কে বেশ ওয়াকিবহাল হয়ে উঠেছে। বচন সিং-এর মা সেকেলে মানুষ। পাড়া-পড়শীরা ওঁকে সাতখানা করে বচন সিং-এর নামে লাগাত। কিন্তু বচন সিং আর জ্ঞানীজী দুজনে মিলে তাঁকে বোঝাতেন। তাই তিনি পাড়া-পড়শীর কথায় খুব বেশি গুরুত্ব দিতেন না।

এদিকে গুরুপর্ব কাছে এসে গেল। সুন্দরীর মন গুরুপরব দেখার জন্য ছটফট করছে। জ্ঞানীজীর কাছ থেকে শিখ ধর্ম সম্পর্কে অনেক কিছু শোনার পর ওর অন্তর গুরুর প্রতি ভক্তিতে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু ও যখন ভাবল সে পরবের দিনেই গুরুদ্বার দর্শন করতে পারবে না তখন তার মন ব্যথায় ভরে উঠল। সব চেয়ে তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল রোডু। কিন্তু ওর মনে মনে খুবই ইচ্ছা ছিল যে গুরুপরবের দিন যদি সৎগুরুর দরবারে মাথা ঠেকাবার কোন সুযোগ সে পায় তা হলে সে চুরি করেও তা মেটাবে। গুরুপরবের আর একদিন বাকী ছিল। আসন্ন উৎসবের প্রস্তুতি চলছে। সুন্দরী শুনেছিল পর্বের দিন সকালে সাধুদের কীর্তন হবে। ও রাতভর জেগে রইল। একটুও ওর ঘুম আসছিল না। বানরের সঙ্গে থাকতে থাকতে সত্যি সত্যি ওর প্রকৃতি বানরের মত হয়ে গিয়েছিল। ও শুধু ভাবছিল কখন ভোর হবে, কখন গুরুদ্বারের দরজা খুলবে। সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে কী করে ভেতরে চলে যাব। উঠোনের কুলগাছের ঘন ডালের ভেতরে লুকিয়ে থাকব। কখনও

ভাবছে, না, তা হলে হয়তো কেউ দেখে ফেলবে। সৎগুরু স্থানে গিয়ে উঁচু স্থানেই বা কেন বসব? এমন একটি জায়গার সন্ধান করতে হবে যেখান থেকে কেউ আমাকে দেখতে পাবে না।

সারারাত সে এই-সব কথা ভাবতে লাগল আর ভাবতে ভাবতে কখন তার চোখ ঘুমে বুঁজে এল।

যখন ওর ঘুম ভাঙল তখন সূর্যের আলো এসে পড়েছে ঘরে। ওর আফসোস হতে লাগল যে আমি এমন বেঁহুশ হয়ে ঘুমোচ্ছিলাম যে ভোর হয়ে গেল? আর তার এক মুহূর্তও ঘরে থাকতে ইচ্ছা করল না। সে দেখল রোডু নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। ও পা টিপে টিপে কুটীর থেকে বেরুল। আর সোজা গুরুদ্বারের কাছে চলল। ও ভেবেছিল গুরুদ্বারের কাছে গেলে বাজনার শব্দ শুনতে পাবে। কিন্তু ওর ধারণা একদম ভুল।

গুরুদ্বারের দরজা তখনও বন্ধ। এবার ওর মনে হল তাই তো এখনও ভোর হয় নি। পূর্ণিমা রাতের পূর্ণ চাঁদের আলোকে সে দিনের রোদ্দুর ভেবেছে। সে মনে মনে খুশিই হল। ও ভাবতে লাগল গুরুদ্বারের ভেতরে কী ভাবে ঢুকবে। হঠাৎ ওর মনে হল গুরুদ্বারের যে ঘরে গুরুগ্রন্থসাহেবের পুজো হয় তার পাশের ঘরটা খালিই পড়ে থাকে। গুরু গ্রন্থসাহেবের ঘরে ঢোকার জন্য ওই ঘরে একটি দরজাও আছে। দরজাটা খোলাই থাকে। সে অনেকবার গুরুদ্বারের বাইরে থেকে এটি লক্ষ্য করেছে।

এখন শুধু ওই ঘরের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারলেই হল। পূর্ণিমা চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় ওর কাজের অসুবিধা হচ্ছিল। খুব চিন্তামগ্ন অবস্থায় সে গুরুদ্বারের পিছনে এল। ওদিকটায় সে একটা নাদ[১] দেখতে পেল। নাদটি মাটি থেকে বেশ উঁচু। সে এক লাফে নাদটির ওপর উঠে এক ফাঁকের ওপরে পায়ের পাতা রেখে ছাদে গিয়ে উঠল। কাঁচা বাড়ির ছাদ যে কত উঁচু তা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু এই বাঁদরীর কাছে তা কিছুই নয়। ছাদে উঠে সে পাশের বিরাট কুল গাছের ওপর উঠল। তারপর গাছ থেকে নীচে

১ বড় গামলা

লাফিয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি ভুষি রাখার ঘরে গিয়ে এক কোণে লুকিয়ে রইল। গুরু গ্রন্থসাহেব যে ঘরে সেই ঘরের দরজাটা খোলা না বন্ধ, তা দেখার জন্য সে দরজাটা একটু ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। দেখল গ্রন্থসাহেবের পুজোর ঘরের দরজাটা খোলা যায়। ঘরের ভেতর স্তূপীকৃত ভুষির চাপে দরজাটা সজোরে বাইরে থেকে খুলে গেল আর সেই ঘরের ভেতর থেকে একগাদা ভূষি গ্রন্থসাহেবের পুজোর ঘরে উড়ে এসে পড়ল।

সুন্দরী এবার খুব ভাবনায় পড়ে গেল। কিন্তু নিরাশ হল না। সে দেখল শতরঞ্জি বিছিয়ে তিন-চারটি লোক ও ঘরে শুয়ে। কিন্তু কেউ জেগে নেই। ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। শুধু এক টুকরো চাঁদের আলো এক পাশে এসে পড়েছে। সে আবার বাইরে বেরিয়ে এল। বাইরে থেকে একটি বস্তার টুকরো নিয়ে এসে সে ভুষিগুলো পরিষ্কার করে ঘরের বাইরে ফেলতে লাগল।

একনাগাড়ে এক ঘণ্টা ধরে চেষ্টার পর সুন্দরী নিজের দাঁড়াবার মত জায়গা করে নিল। এই সময় ভুষিতে ওর মাথা পর্যন্ত ভরে গিয়েছে। আর এক জায়গায় জমা করা ময়লা বাইরে ফেলে দিয়ে সে দরজা বন্ধ করে বন্ধ দরজায় হেলান দিয়ে বসে পড়ল। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ঘুম পেয়ে গেল।

এই সময় ঘুমের মধ্যে তার মনে পড়ল বচন সিং-এর শোনানো গুরুজীর সেই কথামৃত। মনে হল সে যেন চোখের সামনে সব-কিছু দেখছে। ঠিক আজকের দিনটিতেই পরম পিতা জন্ম নিয়েছিলেন। ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল।

—রায়েভোয়ের উঠানের সেই ধুমধাম। কালু পাটোয়ারির বাড়ির কোটি কোটি বিজলি বাতির রোশনাই। সারা পৃথিবীর বনস্পতি যেন ওখানে সুগন্ধ বিতরণ করছে। মাতা তৃপ্তার কোলে আঁধার জাগানো আর শীতল চন্দ্রিমাবর্ষণকারী চাঁদ চমকে চমকে উঠছে। যে একবার চোখ ভরে দেখবে সে তার অন্তরেও এই অপূর্ব চমকের স্বাদ পাবে। তার হৃদয় আপ্লুত হয়ে উঠবে।

সে আবার দেখল তার কিশোর প্রিয়তমের সঙ্গে সে যেন লুকোচুরি

খেলছে। সে দেখল, তার কিশোর প্রিয়তম গাছের ঠাণ্ডা ছায়ায় শুয়ে আছে। মাথার ওপরে সাপ ফণা ধরে রয়েছে।

সুন্দরীর স্বপ্ন টুটে গেল। সে বিহ্বল হয়ে দেবতার পায়ের নীচে পড়ে চোখের জলে তার চরণ ধুয়ে দিতে দিতে মিনতি জানাল, হে প্রীতম, আমার দিকে একবার তোমার অমৃত ভরা নয়ন মেলে তাকাও। আর আমাকে বল, কোন্ ভুলের জন্য এই অভাগিনীর তোমার পায়ের ওপর মাথা রাখবার অধিকার পর্যন্ত নেই। হে আমার দেবতা, আমি কত লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে তবে তোমার কাছে এসে পৌঁছেছি। হে আমার হৃদয়েশ্বর, তুমি তোমার সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে সম্ভবত লুকোচুরি খেলে থাক। কিন্তু আমার মত অবলার এতখানি শক্তি নেই যে তোমাকে আমি খুঁজে বার করি। আমার সঙ্গে এমন করে লুকোচুরি খেল না, আমাকে তোমার কাছে যেতে বাধা দিয়ো না প্রভু।

ঠিক সেই সময় আকাশ থেকে এক ভয়ানক শব্দ উঠল। মনে হল কে যেন তাকে ঘা মারল। সে সময় সুন্দর সুসজ্জিত মূর্তির গলা থেকে মধুর আওয়াজ শোনা গেল। সেই আওয়াজ চারিদিকে গুঞ্জরন তুলল। আর এই গুঞ্জরনের সঙ্গে নিখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড এক অপূর্ব সুগন্ধে ভরে উঠল। এক রমণীয় পাহাড়ী উপত্যকায় জংলী ফুল-গুলো মনের আনন্দে মাথা নাড়ছিল। তার মধ্যে এক আসনে বসে প্রিয়তম দেবতা। তাঁর দুপাশে দুই সাথী।

তার কানে যখন সেই গুঞ্জরনের আওয়াজ এসে পৌঁছল তখন মনে হল, সারা সংসারের রাগরাগিণী একত্র মিলে এক মহান সংগীতের রূপ ধারণ করে গেয়ে চলেছে। দেবতার ডান দিকে বসে যে মহাত্মা তাঁর কণ্ঠ থেকেই সেই অপূর্ব সুর নির্গত হচ্ছে। তাঁর হাতের রবাব থেকে বার হচ্ছে এক চিত্তবিমোহিনী সুর লহরী—

হর অমৃত মিন্নে লোইনা, মন প্রেম
রতন্না রামরাজে।
মন রাম কসবটী লাইয়া, কঁচন সোবিন্না
গুরমুখ রঙ্গ চলুলিয়া মেরা মন তন মিন্না।
জন নানক মুসক ফকোলিয়া
সব জনম ধন ধন্না।

সুন্দরী চোখ খুলে দেখল সে ভুষি রাখার ঘরটায় এসে পড়েছে। দরজার ফুটো দিয়ে দেখল গুরুজীর আরতির ঘরে যে সাধুরা শুয়েছিল তারা এখন গ্রন্থসাহেব পাঠ করছে। প্রথমে ছক্কা শেষ করে ওঁরা পাঠ করছেন, ওয়ার সলোকাঁ নাল সলোক মহল্লে পহলে কে…।

সুন্দরী তাড়াতাড়ি উঠে ওখানে বসে বসে কীর্তনের সেই অমৃত-স্বাদ গ্রহণ করতে লাগল। আজ ও সর্বপ্রথম গুরু গ্রন্থসাহেব দর্শন করল। কিন্তু কেমন করে সে গিয়ে গুরু গ্রন্থসাহেবে মাথা ঠেকাবে? এই ভাবনায় সে বিচলিত হয়ে উঠল। কিছুতেই চুপ-চাপ বসে থাকতে পারল না। কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার হৃদয়ও উদ্বেল হয়ে উঠল।

ধীরে ধীরে দিন বাড়তে লাগল। গ্রন্থসাহেব পাঠের সামান্য তখন বাকী। এবার এক এক করে গ্রামের লোকেরা গুরুদ্বারে ঢুকতে লাগল। সুন্দরী মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল। আজকের দিনটি যেন এক বছরের মত দীর্ঘ হয়! আর তার মন যেন এই-ভাবেই সদগুরুর চরণে পড়ে থাকে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু পর্যন্ত তাকে যেন অমৃতরস পান থেকে নিবৃত্ত করতে না পারে।

বেচারা রাগী সিং ভীষণ নিরাশ হল। আজ ভোগের দিন। কিন্তু ভোগের জিনিস নিয়ে যাদের আসবার কথা এখনও পর্যন্ত তারা এসে পৌঁছল না। ও মনে মনে ভাবছিল যদি ভোগ না এসে পৌঁছয় তা হলে গুরুপরবটাই বৃথা যাবে।

একজন উঠে দৌড়ে গিয়ে ভাইজীকে বলল, ভাইসাহেবজী, ভোগ দেওয়ার সময় তো হয়ে গেছে। এখনও পর্যন্ত ভোগ তো এসে পৌঁছল না। ভাইজী মহারাজ গুরুজীর সেবা করতে করতে গলদঘর্ম হয়ে উঠেছিলেন। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললেন, আন কর করকে, কী বললেন? রাগী সিং আবার তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। ভাই সাহেব তখন বললেন, মহারাজ, এরা সবাই গাঁয়ের লোক। আচ্ছা আমি গিয়ে ডেকে আনছি—আন কর করকে। জ্ঞানী মহারাজ ভোগ আনতে চলে গেলেন। রাগী সিং জেনেশুনেই দেরি করছিল যাতে সব লোক এক সঙ্গে জড়ো হতে পারে। তখন ভোগ দেওয়ার

সুবিধা হবে। ভাইজী একবার গেলেন, আবার গেলেন। তৃতীয় বার আবার গেলেন। এই ভাবে কয়েকবার যাওয়া-আসা করলেন।

দুপুরবেলা প্রসাদের সুগন্ধে চারিদিক বিভোর হয়ে গেল। এই সময় গুরুদ্বারে দূর দূর জায়গা থেকে আসা স্ত্রী-পুরুষের ভিড়ে ভরে গেল।

ভোগ নিয়ে যাদের আসার কথা তারা কিছুক্ষণ আগে এসে গেছে। লোকেরা রাগী সিংকে প্রসাদ দেবার জন্য ধরাধরি করতে লাগল। তারা রাগী সিং-এর কানে কানে বলতে লাগল, একটু ঝটপট হাত চালাও না বাবা। আমাদের যে আবার তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে।

শেষ বারের ভোগ তৈরি হয়ে গেল। ভাইসাহেব বেশ খুশি হয়ে ভোগ উৎসর্গ করার জন্য এগিয়ে এলেন। আজ কড়ায় বেশ ভাল প্রসাদ ছিল। পালা সিং আর তার দলের লোকেরাই তো এগারো টাকার ভোগ দিয়েছে। পঞ্চায়েতের প্রসাদ এ হিসেব থেকে আলাদা।

"সিখ পড়দে সুণদে সরবৎ লাহে বন্দ্, জো আওয়ে সো রাজী জায়ে। গুরু নানক নাম চড়দি কলা, তেরে ভাণে সরবৎ দা ভলা।" এই মন্ত্র উচ্চারণ করে সকলে মাটিতে মাথা ঠেকাল।

ঠিক এই সময় সেই নোংরা ঘরের দরজা খোলার আওয়াজ হল। কিছু ভুষি উড়ে এসে পড়ল। তার সঙ্গে সঙ্গে টলতে টলতে একটি মেয়ে এসে গুরু নানকের ছবির সামনে আছাড় খেয়ে পড়ল। গুরু গ্রন্থসাহেবের আসনের কাছে যেখানে মাথা ঠেকানোর জায়গা রয়েছে সেখানে মেয়েটির মাথা সজোরে ঠুকে গেল আর মেয়েটির সর্বাঙ্গ ভুষিতে ভরে গেল।

সকলের নজর পড়ল মেয়েটির দিকে। রাগে সকলের দেহ জ্বলে উঠল। ওরা আরও ক্ষেপে উঠল যখন দেখল মেয়েটি এক অচ্ছুতের মেয়ে।

সমস্ত লোক তখন এই অভাগী মেয়েটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কেউ তার ওপর এলোপাথাড়ি লাথি চালাল, কেউ থাপ্পড় মারতে

লাগল। কেউ তাকে ঘুসি মারতে লাগল। একে তো মেয়েটিকে নিয়ে তারা প্রথম থেকেই নানান ঝামেলায় পড়েছে, তার ওপর কিনা সে মেয়েটি মন্দিরের ভেতর এসে গুরুদ্বারের পবিত্রতা নষ্ট করল।

কে জানে তাকে আরও কত শাস্তি দেওয়া হত কিন্তু কিছু লোকের মনে এই আশঙ্কা দেখা দিল যে মারের চোটে মেয়েটি না মরে যায়। এই তো কিছুদিন আগে সব গ্রামের লোক এই মামলার ব্যাপারে একেবারে হিমসিম খেয়ে গিয়েছিল। কে জানে আবার তারা কোন্ ঝামেলায় পড়বে।

তারা তখন মেয়েটিকে গালাগালি দিতে দিতে আর টানতে টানতে গুরদ্বারের বাইরে নিয়ে এল। মেয়েটির নাক-মুখ আর মাথা থেকে চাপ চাপ রক্ত বেরোচ্ছিল। তার কাপড়-চোপড় রক্তে ভিজে গিয়েছিল। কেউ কেউ ভাবল, মেয়েটির বোধ হয় ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গেছে। তারা যখন নিজেদের মধ্যে এই নিয়ে ফিসফিস করে কথাবার্তা বলছে সে সময় বচন সিং ঘটনাস্থলে এসে পড়ল।

বচন সিংকে দেখে লোকেদের রাগ আরও বেড়ে গেল। তারা তো বচন সিং-কে এক হাত নেবার জন্য আগে থেকেই ছুতো খুঁজছিল। এখন তো ওরা সাহস পেয়ে গেছে। এর মধ্যে কিছু লোকের তো একেবারে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এ-সব কারসাজি বচন সিং-এরই। সে বদমায়েস কী করে মেয়েটিকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে।

বচন সিং-এর এ সময় কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করার মত মনের অবস্থা ছিল না। সুন্দরীকে এভাবে রক্তাক্ত অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে দেখে ওর রক্ত গরম হয়ে গেল। ও রাগে দাঁত কিড়মিড় করে বলতে লাগল, একে কেন মারা হয়েছে? কী অপরাধ করেছিল ও?

বচন সিং-এর কথা শুনে সকলেই একবাক্যে বলে উঠল। 'এই মেয়েটির এখানে কী কাজ ছিল?' 'ওকে এখানে আনলই বা কে?' 'আমরা সব জানি।' 'গেল গেল ধর্ম গেল।' 'ঘোর কলি!' 'এখন এত প্রসাদ কোথায় ফেলব?' 'সর্বনাশ হল!' লোকেরা চেঁচামেচি করতে করতে বচন সিংকে ঘিরে দাঁড়াল। আক্রমণ করার আগে

বেড়াল ইঁদুরের দিকে যেমন চেয়ে থাকে ঠিক তেমনি করে তারা বচন সিং-এর দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু বচন সিং-এর রাগ একটুও কমল না। ও রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল, এরকম কাজ তো কসাইরা করে। কীর্তন শোনার জন্য যদি এ বেচারী এখানে এসেই থাকে তা হলে তাতে কার কী ক্ষতিটা হচ্ছে? এমন নৃশংসভাবে একে মারা হয়েছে যে—ওর গলা ধরে এল। চোখ দিয়ে টপটপ করে কয়েক ফোটা জল গড়িয়ে পড়ল। কিন্তু ওর কথা শুনে ওখানে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের এমন অবস্থা হল যেমনটি মাতালদের বেদমন্ত্র শোনালে হয়। ওরা সবাই এমন ভাবে হাসাহাসি শুরু করল যেন বচন সিং প্রলাপ বকছে। একজন এগিয়ে এসে বলল, কী বললে? কীর্তন শুনতে এসেছিল? সরদারজী এ-সব আজেবাজে কথা অন্য কোথাও গিয়ে বোলো।

আর একজন বলল, চোরের মার আবার বড় গলা। তৃতীয় ব্যক্তি বলল, আমি তো গোড়া থেকেই জানতাম, ও একদিন-না-একদিন আমাদের মান-ইজ্জৎ ডোবাবে। চোরের একশো দিন, সাধুর একদিন। ভালরে ভাল, পাপ কি চেপে রাখা যায়! চতুর্থ ব্যক্তি বলল, এ বেচারা দেখছি সকলকেই জ্ঞানী মহারাজ ঠাউরেছে। ভেবেছে ও যা-কিছু বলবে আমরা সব মেনে নেব। ও জানে না যে আমাদের ভাইজী গুরুদ্বারের ভেতর কোন শয়তানী বরদাস্ত করেন না।

বচন সিং তাদের অর্থহীন কোন কথাই বুঝতে পারল না। কিন্তু সে ওদের হাবভাব দেখে বেশ ঘাবড়ে গেল।

ওর দৃষ্টি এবার সুন্দরীর দিকে গেল।

এই ভেবে ও ভয় পেয়ে গেল যে সুন্দরী বোধ হয় আর বাঁচবে না।

ও ঠিক করল আর এখানে বেশিক্ষণ থাকা উচিত হবে না। ও এগিয়ে গিয়ে দু-হাত দিয়ে সুন্দরীকে কাঁধে তুলে নিল। তারপর দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় সে বলতে লাগল—বদমায়েস, নিষ্ঠুর। দেখ আমি একে আমার বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি। আমি তোমাদের সবাইকে ঘৃণা করি।

সবাই হো-হো করে উপহাসের হাসি হেসে উঠল। যার যা মুখে এল সবাই তাই বলল।

ওদের রাগ বোধ হয় সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গিয়েছিল। কারণ মানুষ যখন দেখে তার শত্রু নতুন জালে জড়িয়ে পড়েছে তখন তার নিজের লোকসানটা সে আর খতিয়ে দেখে না। ওরা বচন সিংকে শায়েস্তা করতে চেয়েছিল, তার আর এখন দরকার রইল না— তাদের মনোগত বাসনা এবার পূরণ হতে চলেছে।

ওরা আবার গুরুদ্বারে এসে বসল। ওরা কড়া ভরতি ভোগ যা ছিল সব ফেলে দিল। আবার নতুন করে জিনিসপত্র নিয়ে আসা হল। নতুন ভোগ তৈরি হল। আগের ভোগগুলো যে কোথায় গেল তা ঈশ্বরই জানেন।

বেশ বেলা হয়ে গিয়েছিল। এদিকে লোকেরা বাড়ি ফেরার জন্য উতলা হয়ে উঠছে।

ঠিক এই সময় নম্বরদার লত্‌ফা সিং-এর ছেলে গুরুদ্বারের ভেতর এসে গেল। তার পিছনে পিছনে একটি বিকট দর্শন কুকুরের বাচ্চাও হেলতে দুলতে ভেতরে এসে ঢুকল। নম্বরদার তাকে নিজের কোলে উঠিয়ে নিল। কুকুরটি লেজ নাড়তে নাড়তে তার মুখ চাটার চেষ্টা করতে লাগল। সম্ভবত কড়ার প্রসাদের সুগন্ধ ওর নাকে এসেছে। নম্বরদার কুকুরটির গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। মুখের থুতনিটা ধরে নীচের দিকে টানতে লাগল। ওর আদর করার ভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছিল, যেন সে একটি ছোট্ট শিশুর সঙ্গে খেলা করছে।

জ্বালা সিং পাশেই বসেছিল। কুকুটির পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সে বলল, কি নম্বরদার? এই কুকুরটিকে কোথা থেকে জোগাড় করলেন? বেশ খানদানি কুকুর বলেই মনে হচ্ছে।

নম্বরদার তো আগে থেকেই কুকুরের প্রশংসা শোনবার জন্য তৈরি। সে বলল, হ্যাঁ, জ্বালা সিং, অনেক ধরাধরি করে কুকুরটাকে একজনের কাছ থেকে এনেছি। তহশীলদার টেকচাঁদের সঙ্গে আমার বাবার বেশ ভাল আলাপ-পরিচয় আছে। গত বছর উনি বিলেত যাবার আগে কুকুরটিকে আমাদের দিয়ে যান। কুকুরটি জন্মাবার

আগেই আমার বাবা বলে রেখেছিলেন, যে বাচ্চা হলে একটা বাচ্চা দিতে হবে। আমিও পাঁচ ছ'বার হাঁটাহাঁটি করেছি। এ ছাড়া পঁচিশটা টাকাও দিতে হয়েছে। খোশামোদের ব্যাপারটা তো আছেই। ভাই জ্বালা সিং, কুকুরটি বেশ বুদ্ধিমান জাতের কুকুর। বাবার কাছ থেকে শোনা— একবার ওই তহশীলদারের একটা মোষ চুরি গিয়েছিল, এই কুকুরটা গিয়ে ঠিক চোরের সন্ধান করেছে। তারপর মহিষটাকে ফেরত এনে তবে আর কাজ। একটু চুপ করে থেকে নম্বরদার আবার বলল, রোজ পাক্কা আধ সের মাংস এর জন্য আনতে হয়। এ ছাড়া দুধ যতটুকু খেতে পারে খায়। সে হিসেব তো আলাদা। (কুকুরের মুখের ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে) দেখ-না এখন যা খুশি কর, কামড়াবে না। কিন্তু বাড়িতে যদি কোন বাইরের লোক আসে তা হলে বাড়ি মাথায় করবে। চেন ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে চাইবে। আমাকে বলবে, একবার আমায় ছেড়ে দাও আমি গিয়ে লোকটাকে ধরি।

নতুন করে প্রসাদ তৈরি হল। এবার বিতরণের পালা। নম্বরদারের কুকুরের জন্য যে প্রসাদ দেওয়া হয়েছিল তা কুকুরকে খাওয়ানো হল। শেষে নিজের দু-ভাগ প্রসাদও কুকুরকে খাইয়ে চতুর্থ ভাগের প্রসাদ নিজে খেল।

প্রসাদ বিতরণের পর প্রণামী দেওয়ার প্রশ্ন এল। নম্বরদার বচন সিং এই ব্যাপারে বরাবর অগ্রণী। এই জন্য তাকে সবার আগে বসানো হত। সকলের আগে ভাইজী উঠে বললেন, খালসাজী, রাগী সিং বড় সুন্দর করে ব্যাখ্যান করেছেন। এইবার আপনারা সকলে ওঁকে প্রণামী দিয়ে জীবন সফল করুন।

সকলের নজর গিয়ে পড়ল লদ্দা সিং-এর দিকে। তারা দেখছিল নম্বরদার কত দেয়। সকলেই চেঁচাতে লাগল, আগে তুই দে, আগে তুই দে। শেষ পর্যন্ত লদ্দা সিং পাগড়ির খুঁট খুলে একটা আধুলি বার করল। এই দেখে রাগী সিং-এর মনটা নিরাশ হয়ে গেল। গ্রামের ছুতোর দেবাসিংজী পিছনে বসেছিল। সে উঠে গিয়ে এক টাকা প্রণামী দিয়ে এল।

এই দেখে রাগে নম্বরদার লদ্দা সিং-এর সারা শরীর যেন জ্বলে উঠল। ও ভাবল, গ্রামের কম্মী[1] হয়ে ও কিনা আমার থেকে বেশি পয়সা দেবে? ওর একবার মনে হল উঠে গিয়ে ওকে আচ্ছা করে উত্তম-মধ্যম দিয়ে আসে, কিন্তু পরে কিছু একটা ভেবে সে এই কাজটা ভবিষ্যতের জন্য তুলে রেখে দিল।

বাবা করম সিং একজন সজ্জন ও সৎ প্রকৃতির লোক। মুখের ওপর সত্যি কথা বলা ওঁর অভ্যাস। ফট করে তিনি রেগে উঠলেন, ভাই নম্বরদার, তুমিই দেখালে বাবা। দিলেই যখন একটু বেশি দিলে পারতে। স্রেফ একটা আধুলি? দু-আনা নয়, চার-আনাও নয়। দেখলে তো বাপু, দেবাসিং কেমন ঠক করে একটা টাকা ফেলে দিল।

নম্বরদারের কাটাঘায়ে যেন নুনের ছিটে লাগল। সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, বাবা করম, তোমাকে এর আগে বার বার বলেছি, কথা বলার সময় বুঝে-শুনে কথা বলবে। মানুষের যদি নিজের বুদ্ধি থাকে তা হলে অন্যের কাছ থেকে বুদ্ধি নেয়। কিন্তু তুমি যে কেমন বীরপুঙ্গব তা আমার জানা আছে। তোমার মনে নেই, যখন মুদির দোকানের মালিক কোর্টের সাহায্য নিয়ে তোমার ঘরবাড়ি নীলাম করতে গিয়েছিল, তুমি তখন আমার বাবার পায়ে পাগড়ি রেখে কেঁদেছিলে? বাবা সে সময় তোমার পাশে এসে না দাঁড়ালে আজ তোমার হাড়ির হাল হত।

বাবা করম সিং-এর দু-ছেলে ওখানেই বসেছিল। বাবাকে অপমানিত হতে দেখে তার বড় ছেলে বেলা সিং বলল, নম্বরদার, মুখ সামলে কথা বলবে। আমাদের ফজু কুমোর ভেব না। যার টাকা ছিনতাই করে নিয়ে উলটে তাকেই আবার হাজতবাস করিয়েছিলে।

এবারের মত ছেড়ে দিলাম। ফের যদি তোমার মুখ দিয়ে বাবার নাম বার হয় তা হলে কিন্তু খুব খারাপ হবে বলে দিলাম। নিজের মান-সম্মান নিজের কাছে।

নম্বরদার কিছু বলতে যাচ্ছিল। এমন সময় ওর ভাইপো ফৌজা

১ নীচু জাত। চাকর

সিং বলে উঠল, ব্যস আর না। ছেঁড়া জুতোর মত বেশি ফটর ফটর করিস না। ছাল নেই কুত্তার বাঘা নাম। যা, যা তোদের যা করার করে নে। তোকে বলে রাখছি, তুই যা বারণ করছিস, একশোবার করব। কোন ভড়ুয়ার[১] খেয়ে তো বেঁচে নেই।

করম সিং-এর ছোট ছেলে শিবা সিং বলে উঠল— হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোর এই রকম ট্যাঁকখোরের মত কথা হবে না তো কার হবে। ঠাকুর্দা এক টুকরো রুটির জন্য হা-হা করে মরেই গেল। আর তার নাতির মেজাজ একবার দেখ-না। নম্বরদার বলল, তুমি আমার মেজাজের কী দেখেছ? করম সিং-এর এক সাকরেদ বলে উঠল, হ্যাঁরে হ্যাঁ, তোর মেজাজ হবে না কেন। নিজেদের তো কিছু মুরোদ নেই। পূর্বপুরুষ যা করে গিয়েছে তাই ভোগ করছিস। মেজাজ হবে নাই-বা কেন। ওই দিনের কথা ভুলে গেলি? যেদিন তিন ভাইকে ডাকাতির দায়ে পুলিশ তোদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল আর তোদের বাবা বাড়ি বাড়ি গিয়ে কান্নাকাটি করত। সেই সময় আমরা সাহায্য না করলে তোদের বাড়ির মেয়েদের ঘাগরা পর্যন্ত নীলাম হয়ে যেত।

—ব্যস, ব্যস এই কুকুর!

—চুপ্ কর। লোচ্চার বাচ্চা।

—ধর্ ধর্। যাচ্ছিস কোথায়?

—আমার গায়ে হাত দেয় এমন কে জন্মেছে দেখি?

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

—তা হলে আয়।

—আয়।

ব্যস, দু-পক্ষেরই আর তর সইল না। দু-দলের মধ্যে মহাভারত শুরু হয়ে গেল। বেশ জোরদার লড়াই লেগে গেল। তবু রক্ষে লড়াইটা গুরুদ্বারের চত্বরে হচ্ছিল, সেইজন্য কারও কাছে লাঠি কিংবা ধারালো কোন অস্ত্র ছিল না। তা না হলে আজ যে কত

---

১ অসতী স্ত্রীর রোজগারে খায় এমন স্বামী।

লোক মারা পড়ত কে জানে! রাগী সিং-এর হারমোনিয়াম ও তবলা কিছুক্ষণ পর্যন্ত হাতিয়ারের কাজ করল। কিন্তু তাও বেশিক্ষণ টিঁকতে পারল না। যার যার মাথায় পড়ল মাথা ফাটবার আগে ওগুলো ভেঙে চুরমার হল।

ভাইসাহেব তো ভয়ে তক্তাপোষের নীচে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আর রাগী সিং প্রাণের দায়ে জুতো ফেলে খালি পায়ে চোঁ-চাঁ দৌড় লাগিয়েছিলেন। এক দৌড়ে স্টেশনে পৌঁছে তবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

বিকেল হতে না হতেই থানা থেকে পুলিশ এসে ছোট বড় সবাইকে ধরে নিয়ে গেল।

এর শেষ পরিণাম কী হল? যা হয়, কিছুদিনের মধ্যেই গাঁয়ের লোকদের টাকা কিছু গেল উকিলের পকেটে, কিছু গেল আদালতের দফতরে আর বাকীটা গেল পুলিশের মুখগহ্বরে।

॥ ১৯ ॥

বচন সিং সুন্দরীকে নিজের বাড়িতে তো নিয়ে এল। কিন্তু তার হল সাপের ছুঁচো গেলার মত অবস্থা। ওর মা প্রথম থেকেই সুন্দরীকে ভাল নজরে দেখতেন না। সুন্দরীকে বাড়ি এনে তুলতে দেখে তিনি খুবই দুঃখ পেলেন। মনে হল এই দুঃখে তাঁর প্রাণটাই চলে যাবে। তাঁর এই সময়টা ছিল খুবই সঙ্কটজনক। বচন সিংকে কিছু বলারও তাঁর ক্ষমতা ছিল না। তিনি আগের থেকেই চিন্তা করছিলেন কীভাবে বচন সিংকে অচ্ছুতের মেয়েটির কাছ থেকে দূরে রাখা যায়। কিন্তু যে মেয়েটিকে তিনি মন থেকে ঘৃণা করেন সেই মেয়েটিই কিনা আজ তাঁর বাড়িতে!

এ ছাড়া গ্রামের প্রত্যেক বাড়িতে বচন সিং-এর এই কাজ নিয়ে পাঁচ কথা হচ্ছিল। ফলটা হল এই যে এই মা ও ছেলের সঙ্গে গ্রামের লোকেরা কথা বন্ধ করে দিল।

বচন সিং এ-সব যে কিছুই জানে না তা নয়। ও মায়ের দুঃখ মনে মনে অনুভব করত। তার মনে এই আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল কি জানি লোকেদের দুর্ব্যবহার আর কত বাড়বে। কিন্তু সে তো সব জেনেই সুন্দরীকে নিজের বাড়ি এনেছিল। বাড়ি এসেই সে কবিরাজ ডেকে সুন্দরীর পায়ে ব্যাণ্ডেজ করাল। সে রোড়ুকেও সব কথা জানিয়ে তাকে সঙ্গে করে বাড়িতে নিয়ে এল।

রোড়ু সুন্দরীর অবস্থা দেখে হকচকিয়ে গেল। ভাবল, সত্যি, প্রথম থেকেই বচন সিং আমাদের সম্মান রাখার জন্য মাথায় সব অপমানের বোঝা তুলে নিয়েছে। কি জানি তার আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে তাকে এজন্য কত দুর্ব্যবহারই ভোগ করতে হচ্ছে।

রোড়ু বচন সিং-এর পা জড়িয়ে ধরল। ওর দেহের প্রতিটি রোম-কূপ যেন বচন সিংকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। সে অজ্ঞান অবস্থাতেই সুন্দরীকে নিয়ে যেতে চাইল। যদিও মন থেকে সে কিছুতেই এটা চাইছিল না। কেননা, সে জানত, সুন্দরীকে যে ভাবে এখানে যত্ন করা হচ্ছে সে রকম যত্ন সে তার কুটীরে গিয়ে করতে পারবে না; সামান্য চিকিৎসা করাবার ক্ষমতাও তার নেই। কিন্তু সে মনে করল বচন সিং-এর সম্মানের জন্য সুন্দরীর যদি জীবন যায়ও তা হলেও ভাল। কিন্তু ওর হাজার কাকুতি-মিনতিও বচন সিং শুনল না। অবশেষে ঠিক হল, সুন্দরী যতদিন না সুস্থ হয়ে ওঠে ততদিন বচন সিং-এর বাড়িতেই থাকবে। কিন্তু এদিকে রোড়ুর সামনে আর-এক বিপদ দেখা দিল। সুন্দরীকে ছেড়ে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। যদিও সে ভাল করে জানে বচন সিং-এর বাড়িতে সুন্দরী থাকলে তার সেবাযত্নের একটুও ত্রুটি হবে না। কিন্তু মায়ার বন্ধনে ও অসহায় হয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত সে তার মনের ওপর পাথর চাপা দিয়ে সুন্দরীকে কিছুদিনের জন্য ছেড়ে থাকার জন্য নিজেকে তৈরি করল।

তারপর দু-তিন দিন ধরে রোজই সে সুন্দরীকে দেখতে যেতে লাগল। কিন্তু লোকেদের নানান মন্তব্যের জন্য সে সেখানে যাওয়া বন্ধ করে দিল। যখন সে সুন্দরীকে দেখার জন্য গলির মধ্যে ঢুকত

তখন আশেপাশের লোকদের নানান অশ্লীল মন্তব্যে তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসত।

এদিকে বচন সিং-এর সেই একই অবস্থা। কিন্তু কেউ ওকে লক্ষ্য থেকে হঠাতে পারল না। ওর সম্পর্কে লোকে নানান মন্তব্য নানা হাসিঠাট্টা করতে লাগল কিন্তু তা সত্ত্বেও সে নতুন উৎসাহ নিয়ে সুন্দরীর সেবা আর চিকিৎসায় নিজেকে ঢেলে দিল।

এক নাগাড়ে দু-তিন দিন সুন্দরী একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল। মাঝখানে কখনও-সখনও সে চোখ খুলত। আবার পরক্ষণেই চোখ বন্ধ করত। তৃতীয় দিন রাত সওয়া ন-টা নাগাদ রোডু যখন কোন রকমে লুকিয়ে লুকিয়ে এসে সুন্দরীর শিয়রে বসেছে ঠিক সেই সময় সুন্দরী পাশ ফিরল। আর ভুল বকতে লাগল। ধীরে ধীরে সুন্দরী চোখের পলক দুটি খুলল। তারপর সে আশেপাশের জিনিসগুলো এক দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। রোডুর ধড়ে যেন প্রাণ এল। সে সুন্দরীর মাথায় হাত রেখে কাঁদো কাঁদো সুরে বলল, সুন্দরী!

সুন্দরী খুব আস্তে আস্তে বলল, কী বাবা!

—মা, আমার দিকে একবার চেয়ে দেখ্ তো।

সুন্দরী পাশ ফিরল। শিয়রে বসে থাকা বাবার দিকে তাকাল। হ্যাঁ, এই সেই বাবা, যে তাকে জীবন দিয়েছে। এত বড় করে তুলেছে। সুন্দরী রোডুর দিকে নিজের দুটি হাত বাড়িয়ে দিল। তার পর রোডুকে জড়িয়ে ধরে সুন্দরী বলে উঠল—বাবা, আমি এখন কোথায়?

—কেন মা, তুই তো তোর বাড়িতেই আছিস।

—না বাবা, এ তো আমাদের বাড়ি নয়। আমাদের বাড়িতে তো কোন চারপাই ছিল না। তারপর সুন্দরী বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে চারিদিকে তাকাল। এবার ও অনুভব করল, ওর মাথায় হাতে ও পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

সুন্দরী হাত দিয়ে রোডুর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, বাবা, আমাকে এখানে কে আনল⋯?

সুন্দরীর কথা মাঝখানেই থেমে গেল। ও নিজেই তার প্রশ্নের

উত্তর পেয়ে গেল। সেদিনকার সব ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। ও আবার বলল, বাবা, আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম, না ?

—হ্যাঁ, মা।

—চল বাবা আমরা বাড়ি ফিরে যাই।

—হ্যাঁ, মা যাব। তুমি আর-একটু ভাল হয়ে ওঠ।

—না বাবা। আমি একেবারে ভাল হয়ে গেছি। সুন্দরী উঠে চারপাইয়ের ওপর বসার চেষ্টা করল। বেশ রাত্রি হয়ে গিয়েছিল। রোডু ওকে ধরে আবার চারপাইয়ে শুইয়ে দিল। তারপর ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, মা, শুয়ে পড়। আমি ভোর হওয়া মাত্র তোকে এখান থেকে নিয়ে যাব।

বচন সিং কাছেই বসে ছিল। রোডু হাত জোড করে নম্রভাবে বলল, সরদারজী, সুন্দরীর জ্ঞান ফিরে এসেছে। আমি চললাম। আবার সকালে আসব।

বচন সিং বলল, আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আপনি নিশ্চিন্তে বাড়ি যান।

সুন্দরীর চোখ আবার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। রোডু তার দিকে আর একবার তাকাল। তারপর তার ছড়িটা তুলে নিয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা হল।

ওর যাবার আধ ঘণ্টা পরে সুন্দরী পাশ ফিরল। জল চাইল। বচন সিং ওর পাশেই বসে ছিল। ও জল নিয়ে এসে সুন্দরীকে খাওয়ালো।

সুন্দরী বচন সিং-এর দিকে অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। বলল, আপনিই আমাকে এখানে এনেছিলেন না ?

বচন সিং বলল, হ্যাঁ। তারপর সে কুঁচকে যাওয়া বিছানাটা ঠিক করতে করতে বলল, সুন্দরী তুমি কোন চিন্তা কোরো না। তুমি এখন ভাল হয়ে গেছ। তবে তোমার বেশি নড়া-চড়া করা উচিত হবে না। এ সময় বেশি কথাবার্তা বলাও ভাল নয়।

কিন্তু চঞ্চলা সুন্দরী কি কারও কথা শোনে ? ও বলে উঠল, আমি একেবারে ভাল হয়ে গেছি।

তারপর সে নিজের হাত দুটো যার রঙ একেবারে হলদে হয়ে গিয়েছিল, উলটে পালটে দেখতে লাগল। তারপর বলল, আপনিই আমাকে এখানে এনেছেন, না ?

—হ্যাঁ, বললাম তো।

—কেন ?

—অজ্ঞান অবস্থায় তুমি পড়ে ছিলে যে !

—আপনি আমাকে ছুঁয়েছেন ?

—হ্যাঁ, কেন, তোমায় ছুঁলে কি কোন ক্ষতি হয় ?

—আমরা যে ছোট জাত।

—না, আমার দৃষ্টিতে তোমরাই দুনিয়ার সব থেকে উঁচু জাতের। সুন্দরী, আমি তোমাকে নীচ ভাবি না।

—আপনি আমাকে নীচু জাত ভাবেন না ?

—না। একেবারেই না।

—তা হলে কী ভাবেন ?

—তুমি আমাদেরই মত মানুষ। যাকগে, এ-সব কথা ছাড়। আচ্ছা বল তো, সেদিন গুরুদ্বারায় তুমি কীভাবে ঢুকলে ?

যে কথাগুলো ও আর শুনতে চাইছিল না, সে কথাগুলো বচন সিং-এর মুখে শুনে ও বেশ বিচলিত হল। সে-সব ঘটনার জন্য ওর এখন অনুতাপ হচ্ছে। ভীষণ দুঃখও লাগছে। ও ভাবছিল ওর সেদিন গুরুদ্বারের ভেতর ঢোকার কী দরকার ছিল। বোধ হয় তার ভুলের জন্যই গুরুজী তাকে শাস্তি দিয়েছেন। সেইজন্যই তো তার এই দুরবস্থা। ও লজ্জিত হয়ে বলল, আমার ভুল হয়ে গেছে।

—ভুল— না সুন্দরী। তুমি ওখানে গিয়েছিলে বলে আমি কোন আপত্তি করছি না। আমি জিজ্ঞেস করছি, তুমি ওখানে পৌঁছলে কী করে ? সে সময় কেউ কি তোমাকে বারণ করল না ?

সুন্দরী এবার একটু সাহস পেল। সে সেদিনের সব ঘটনা খুলে বলল। এও বলল, রাগী সিং যখন কীর্তন করছিল, আমি তখন দরজার পিছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম। যখন কীর্তন শেষ হল ; মনে ছিল না, আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছি। প্রণাম করবার

জন্য মাথা নোয়াতেই মাথার ঠোক্কর লেগে দরজা খুলে গেল। এ ঘর থেকে ভুষি গড়িয়ে গিয়ে পড়ল ও ঘরে। আমি গুরুগ্রন্থসাহেবের পুজোর ঘরে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। আমার যেখানে মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম করার ইচ্ছে ছিল, ঠিক সেখানটাতেই আমার মাথা ঠুকে গিয়েছিল। আমার ইচ্ছা পূর্ণ হল। কিন্তু আমার ভুলের শাস্তি আমি পেলাম। লোকেরাই আমাকে সে শাস্তি দিল।

সুন্দরীর দৃঢ় মনোবল, তার আত্মত্যাগ আর দৃঢ়সংকল্প দেখে বচন সিং-এর হৃদয় সুন্দরীর প্রতি ভালবাসায় ভরে উঠল। সে উত্তেজনার বশে সুন্দরীর হাত দুটো চেপে ধরল। বলল, সুন্দরী, তুমি ধন্য। আমার হৃদয়ে তোমার জন্য শ্রদ্ধার আসন পাতা রইল।

সুন্দরীর মনে হয়েছিল দুনিয়াতে রোড়ু আর বাঁদরীটি ছাড়া তাকে আর কেউ ভালবাসে না। মনে হয়েছিল সারা পৃথিবীর লোক তাকে ঘৃণা করে। এই কারণে ভালবাসার যে কী মর্ম তা সে এতদিন জানত না। একজন উচ্চকুলের লোক হওয়া সত্ত্বেও বচন সিং তাকে ভালবাসে, এই ভেবে সুন্দরীর মন এক অনাস্বাদিত পুলকে ভরে গেল। ও যদিও চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ে, ভালবাসার দামও সে ঠিক জানে না, কিন্তু প্রেম যে কী তা তো সে বোঝে।

বচন সিং নিজের সাধ্যমত সুন্দরীর চিকিৎসা করছিল। সুন্দরী দ্রুত আরোগ্য লাভ করছিল। চিকিৎসা না বচন সিং-এর নির্মল ভালবাসার জন্যই সে ভাল হয়ে উঠছিল, তা ঠিক বলা শক্ত। সুন্দরী যত আরোগ্যলাভ করতে লাগল ওর হৃদয়ে ঈশ্বরের মত বচন সিং-এর আসনও তত পাকা হয়ে উঠল। এইজন্যই তো সারা গ্রামের লোকের তার ওপর এত আক্রোশ। একটি পনেরো বছরের অচ্ছুত বালিকার হৃদয় যে কত কোমল পবিত্র আর উদার করে ভগবান গড়েছেন, তাই দেখে বচন সিং মনে মনে সুন্দরীর প্রতি বেশি করে আকৃষ্ট হয়ে পড়ল।

নারী-হৃদয় কখনও কখনও পাথরের মত শক্ত। আবার কখনও কখনও সেই হৃদয়ই বরফের মত শীতল। বচন সিং-এর মা প্রথমে এই অচ্ছুত মেয়েটিকে ঘৃণা করত। কিন্তু যেদিন আহত সুন্দরীকে

বচন সিং নিজের বাড়িতে নিয়ে এল, আর সুন্দরীর দুর্ভাগ্যের কথা সে মায়ের কাছে খুলে বলল, সেদিন থেকে তিনি সুন্দরীকে ভালবেসে ফেলেছিলেন। তাঁর চোখের সামনে সমাজের কিছু লোকের খুনী দৃষ্টি ভাসছিল আর ভয়ে তাঁর রক্ত জল হয়ে যাচ্ছিল।

সুন্দরীর সুন্দর রূপ, ফরসা রঙ, ভাসা ভাসা চোখ দেখলে কে তাকে ঘৃণা করবে?

পনেরো দিন কেটে গেল। সুন্দরী প্রায় ভাল হয়ে উঠেছে। ওর দেহের ক্ষত মিলিয়ে এসেছে। মাথার ব্যাণ্ডেজ খুলতে আর দু-তিন দিন বাকী।

সুন্দরীর ক্ষত নিয়ে বচন সিং-এর চিন্তা হল। এর কারণ এই নয় যে ক্ষত খুব গভীর। বচন সিং-এর চিন্তার কারণ, এই ক্ষতের ফলে আবার সুন্দরীর রূপে যেন খুঁত না থেকে যায়।

কিন্তু যেদিন সুন্দরীর মাথার ব্যাণ্ডেজ খোলা হল, সেদিন দেখা গেল উলটে ওই ক্ষতচিহ্ন সুন্দরীর রূপকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এ যেন এক অর্ধচন্দ্রের জায়গায় চারচাঁদের উদয়। বচন সিং-এর মনে হল সুন্দরীর সব রূপ শুধু যেন ওই ক্ষতচিহ্নটার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে।

রাত প্রায় দশটা। সুন্দরীর চারপাই উঠোনের একপাশে রাখা। বচন সিং ও তার মায়ের চারপাই ভিতরের বারান্দার একদিকে রাখা। বচন-এর মা ঘরের কাজকর্ম সেরে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিলেন।

আজ সুন্দরী একেবারে সুস্থ ছিল। চারপাইয়ে শুয়ে সে গভীর চিন্তায় মগ্ন। ও দরজায় কান লাগিয়ে কোন শব্দের প্রতীক্ষা করছিল। সে কাল নিজের কুটীরে ফিরে যাবে। আজ তাই বচন সিং-এর সঙ্গে সে মনের কথা খুলে বলতে চায়। সে কী কথা বলতে চায়? নিজেই জানে না, বচন সিং-এর সঙ্গে সে কী কথা বলবে। ও মনে মনে অনুভব করছিল বচন সিংকে ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য তার মন এখন থেকেই দুঃখে ভরে গেছে। মনে হচ্ছে বচন সিং-এর কাছ থেকে বিদায় নেবার দুঃখ প্রাণত্যাগের দুঃখের মতই সমধিক।

বচন সিং এখনও ফিরল না কেন? সব ঠিক আছে তো? এই

চিন্তার গভীরে সে ডুবে ছিল। কোন রকম আওয়াজ হলেই সে চমকে উঠে দরজার দিকে তাকাচ্ছিল। বচন সিং-এর মায়ের কিন্তু এ-সবের কোন খেয়াল ছিল না। তিনি নিজের ছেলের স্বভাব ভালভাবেই জানেন। সে তো কখনও কখনও রাতদুপুরে বাড়ি ফেরে।

ধীরে ধীরে এগারোটা বেজে গেল। সুন্দরী না পারল শুতে, না পারল বসতে, সে উঠোনে পায়চারি করতে লাগল। বচন সিং-এর সঙ্গে তার অনেক জরুরি কথা আছে। মনের ভিতরে এত কথা জমে আছে। সব কথা কি মনে থাকবে? তার শুধু এই চিন্তা হচ্ছিল।

ঠিক এই সময় কেউ দরজার কড়া নাড়ল। সে তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলে দিল। বচন সিং হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে ঢুকল।

বচন সিং-কে অমন ব্যস্তভাবে বাড়ি ঢুকতে দেখে সুন্দরীর মুখে এক শিশুসুলভ হাসি ফুটে উঠল। সে জিজ্ঞাসা করল, আপনার যে আজ ফিরতে এত দেরি হল?

বচন সিং সেই মুহূর্তে কোন উত্তর দিতে পারল না। সে সুন্দরীর চারপাইয়ের পাশে রাখা একটি চেয়ারে গিয়ে বসল। ওর পিছনে পিছনে গিয়ে সুন্দরী তার চারপাইয়ের ওপর বসল।

ঠিক এই সময় একটা দমকা হাওয়া ঘরের ভিতরে ঢুকল। বচন সিং-এর মনে হল সুন্দরীর যেন আবার ঠাণ্ডা না লেগে যায়।

ওর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে বচন সিং বলল, সুন্দরী তোমার বোধহয় ঠাণ্ডা লাগছে। চল, তোমার চারপাই আমরা বসবার ঘরে বিছিয়ে দেই। এই বলে সে হাত ধরে সুন্দরীকে চারপাই থেকে ওপরে ওঠালো। সুন্দরীর হাত একেবারে বরফের মত ঠাণ্ডা।

বচন সিং আবার বলল, হুঁ, তুমি নিশ্চয়ই ঠাণ্ডাতে ঘুরে বেড়িয়েছ তাই না? সুন্দরী, আবার কি জ্বরে পড়তে চাও?

বচন সিং হাত ধরে সুন্দরীকে বৈঠকখানা ঘরে নিয়ে গেল। সেই সঙ্গে তার চেয়ার আর বিছানাও।

সুন্দরীকে চারপাইয়ে বসিয়ে ওর গায়ে লেপ জড়িয়ে দিয়ে বচন

সিং রাগ করে বলল, এইভাবে চললে তোমার আবার অসুখ করবে।

সুন্দরী এই কথার কোন জবাব দিল না। বচন সিং ওর হাত ধরে জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার বল তো সুন্দরী ?

সুন্দরীর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল।

বচন সিং ভাবল তার রুক্ষ কণ্ঠস্বরে হয়ত সুন্দরী আহত হয়েছে। সে মনে মনে অনুশোচনা করল। চেয়ার ছেড়ে সেও চারপাইয়ের ওপর গিয়ে বসল। নিজের বলিষ্ঠ হাত দুটি দিয়ে সুন্দরীকে জড়িয়ে ধরে সে বলল, সুন্দরী আমার কথায় কি তুমি রেগে গেলে ?

সুন্দরীর মন এ সময় অন্য কোন জগতে বিচরণ করছিল। বোধহয় তার মন তখন স্বপ্নলোকে। ও ভাবছিল, বচন সিং তার ভালমন্দের জন্য কত চিন্তা করে।

তার প্রতি বচন সিং-এর কত সহানুভূতি আর ভালবাসা রয়েছে। সামান্য হাতটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে তা নিয়ে সে কত চিন্তিত। হ্যাঁ, সত্যি আমি কত ভাগ্যবতী— না, আমি অভাগিনী ···

এই-সব চিন্তায় সুন্দরী মগ্ন ছিল। বচন সিং-এর প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে তাই সে কেঁদে ফেলল।

বচন সিং ওর হাত দুটো আরও জোরে জড়িয়ে ধরে বলল, সুন্দরী ! এ ছাড়া তার মুখ থেকে আর কোন শব্দ বেরোল না। ও মনে মনে এক অদ্ভুত আনন্দরসে ডুবে ছিল। মনে হল সে নিজের বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। সেইজন্য সে নিজের সর্বশক্তি দিয়ে সুন্দরীর হাত দুটো ধরতে পেরেছিল, ব্যস, এইটুকু।

বচন সিং সুন্দরীর সামনেই বসেছিল। কিন্তু সুন্দরীর মনে হল সে বচন সিংকে দেখতে পাচ্ছে না। তার চোখের সামনে কেবল সেই ভাঙা কুটীরটি ভাসছে। সেই ভাঙা কুটীরে তার শূন্য মন পড়ে রয়েছে। মনে হল বচন সিং ছাড়া তার মন শূন্যই থাকবে।

সম্ভবত ভোরের সূর্যের আলো ক্রমশ চড়ছিল কেননা, রোডু তাকে খবর দিয়ে বলেছিল সকালবেলাই সুন্দরীকে তার কাছে পাঠিয়ে দিতে।

হ্যাঁ, সে অনুভব করছিল সে ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়ে পড়েছে। ওর মনে হচ্ছিল যে বচন সিং তার ভবিষ্যৎ জীবনের শিরায় শিরায় মিশে গেছে। কেউ বচন সিং-কে তার কাছ থেকে আলাদা করতে পারবে না। যদি সে তাকে ছেড়ে দেয়, যদি সে আলাদা হয়ে যায় তা হলে সুন্দরী বাঁচতে পারবে না।

এ-সব আজেবাজে কথা কি সে বচন সিং-কে বলতে পারে?

সুন্দরী এই-সব চিন্তায় গভীর ভাবে মগ্ন ছিল। ওর মনে হচ্ছিল বচন সিং-এর শক্ত মুঠি ওর সারা শরীরে অমৃতের ধারা বহিয়ে দিচ্ছে। সে সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেল বচন সিং বলছে, সুন্দরী! আমার সুন্দর! তুমি কথা বলছ না কেন? আজ যে তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

এই প্রথম সে বচন সিং-এর মুখে এত গভীর প্রেমাবেগের সঙ্গে 'সুন্দর' এই শব্দটি শুনল। সুন্দরীর মন এতে অপূর্ব আনন্দলহরীতে পূর্ণ হয়ে উঠল—যার কোন ভাষা নেই, যা শুধু শব্দ—'আমার সুন্দর।'

সে মাথা তুলে বচন সিং-এর দিকে তাকাল। তার চোখের ভাষা গভীর অর্থবহ। সুন্দরী বচন সিং-এর চোখে চোখ রেখে তার চোখের ভাষা পড়তে শুরু করল। পড়তে পডতে তার মনে রইল না বচন সিং-এর চোখে তার নিজেরই প্রতিফলন।

বোধ হয় এই দৃষ্টির নামই ভালবাসা। অনেকক্ষণ ধরে দুজনে দুজনকে প্রাণ ভরে দেখল। বচন সিং এবার নিজের ঘড়ির দিকে দেখল। ভাবল, দেড় ঘণ্টা এত তাড়াতাড়ি কি করে কেটে গেল? ঘড়িতে সাড়ে বারোটা বেজে গিয়েছে।

শেষ পর্যন্ত এই মৌন সংলাপ শেষ হল। বচন সিং আবার বলল, সুন্দরী তোমার সঙ্গে আজ অনেক কথা ছিল।

সুন্দরী হেসে বলল, কথা ছিল—এখন আর কথা বলার নেই নাকি?

—রাত যে অনেক হয়ে গেছে সুন্দরী।

—হ্যাঁ ঠিক কথা— যদি আপনার ঘুম পেয়ে থাকে তা হলে…

আমার এক্কেবারে ঘুম পায় নি। আমি তো তোমার ঘুমের কথা চিন্তা করছি।

—আমার ঘুমের চিন্তা আপনার—। মনে হচ্ছে, আমার আজ ঘুম আসবে না।

—কেন? আসবে না কেন?

সুন্দরী চুপ করে রইল।

বচন সিং আবার বলল, সুন্দরী।

—বলুন।

—তুমি চলে যাবে?

সুন্দরী কোন জবাব দিল না। দাঁত দিয়ে নখ কাটতে লাগল।

—সুন্দরী, তুমি যদি চলেই যাও তা হলে এখানে এলে কেন?

সুন্দরী শুধু এক ঠাণ্ডা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

বচন সিং বলল, সুন্দরী, তুমি আমার জীবন অমৃতে ভরে দিয়েছ।

সুন্দরী এবারও নীরব।

মৌন থেকেই সে বচনের সব কথার জবাব দিচ্ছিল—ভাষা দিয়ে নয় তার মনোভাব দিয়ে। ভাষা দিয়ে সে কিছু বলতে চাইছিল কিন্তু পারছিল না। বচন সিং-এর প্রতিটি কথাই সে বুঝতে পারছিল কিন্তু নিজের ভাবনাকে প্রকাশ করতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল নিজের মনের ভাব বুঝিয়ে বলবার মত শব্দ তার কাছে নেই। সেইজন্য সে একেবারে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

বচন সিং জিজ্ঞেস করল, সুন্দরী, তুমি কি কথা বলবে না? আচ্ছা তা হলে আমি চললাম। এই বলে বচন সিং চারপাই ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

সুন্দরী তাড়াতাড়ি তার সার্ট চেপে ধরল। ওকে বসাবার চেষ্টা করে সে বলল, আপনি আজ এত দেরি করে ফিরলেন কেন?

যে সুন্দরী বচন সিং-এর সঙ্গে কথা বলার জন্য ভীষণ উতলা হয়েছিল সেই সুন্দরী সুযোগ পেয়েও নিজের মনের কথা না বলে, আজেবাজে কথা বলে প্রসঙ্গ এড়াতে চাইল। সেজন্য সে বচন সিং-এর কথার জবাব না দিয়ে নতুন প্রসঙ্গ উত্থাপন করল— আপনি এত দেরি করে ফিরলেন কেন?

আসলে সুন্দরী যে কথা বলতে চায় বচন সিং তার কথার মধ্য দিয়ে সেই কথাই বলছিল। কিন্তু প্রকৃতি নারী-হৃদয়কে কী রহস্যে না আবৃত করেছিল। সেই হৃদয়কে কী নিদারুণ সহ্যশক্তিই না তিনি দিয়েছেন। সমুদ্র যেমন বিরাট, অন্তহীন, পাহাড় যেমন অটল তেমনি এই নারী-হৃদয়। কিন্তু প্রকৃতির কী বিচিত্র লীলা! নারী তার এই হৃদয়কে ইচ্ছে করলে ছোট্ট একটি পাত্রের মধ্যে আটকে রাখতে পারে।

বচন সিং আর তার মধ্যে প্রেম অসম্ভব শুধু এই কথা ভেবে সুন্দরী ইচ্ছে করেই মৌন থেকেছে। হৃদয়ের অনেক কথা বেরিয়ে আসতে চেয়েছে কিন্তু সেই উদ্গত কথার স্রোতকে সে কিছুতেই ওপরে আসতে দেয় নি।

সুন্দরী প্রসঙ্গ বদলাতে চেয়েছিল। কিন্তু বচন সিং ঘুরে ফিরে আবার সেই পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে এল। সে বলল, তোমার জন্যই তো দেরি হয়ে গেল। রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে কুয়োর দিকে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ওখানে বসে বসে তোমার কথা ভাবছিলাম। কতক্ষণ চিন্তায় ডুবেছিলাম জানি না। দেখি দশটা বেজে গিয়েছে।

—আমার কথা ভাবতে ভাবতে দেরি হয়ে গেল? সুন্দরী পাংশু মুখে বলল, আমার কথা ভাবতে ভাবতে?

—হ্যাঁ, সুন্দরী, তোমার কথাই খালি ভাবছিলাম।

—বোধ হয় ভাবছিলেন সুন্দরীকে বাড়ি নিয়ে এসে কী মুশকিলেই না পড়লাম, তাই না?

—না-না, ও কথা আমার মাথায়ই আসে নি।

—তা হলে?

—আমি ভাবছিলাম, কাল তুমি চলে যাবে।

—তারপর?

—সুন্দরী, আমি—।

—বলুন, থামলেন কেন?

—আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না। আমার হৃদয়···

—আপনার হৃদয়? হাঁ আপনার হৃদয়। তারপর?

—সুন্দরী তুমি ছেলেমানুষ।

প্রেম কাকে বলে তুমি জান না। যদি তুমি বুঝতে প্রেম কী তা হলে তুমি আমার অবস্থা বুঝতে পারতে।

—কে বলল, এখন বুঝতে পারছি না। আপনি আর জ্ঞানীজী আমাকে সমস্তই তো পড়িয়েছেন। প্রেম কাকে বলে আমি জানি না ভাবছেন? আমি জানি। আমাদের সকলের সঙ্গেই প্রেম করা উচিত। গুরুবাণীতে এই কথাই লেখা আছে, 'জিন প্রেম কিও। তিন হী প্রভু পায়ো।'

এই সরল জবাব বচন সিংকে একেবারে নিরুত্তর করে দিল। সেই সঙ্গে কিছুটা নৈরাশ্যও। কিন্তু আর একবার সে নিজের যুক্তির পক্ষে সওয়াল করে বলল, আমি অন্য প্রেমের কথা বলতে চেয়েছিলাম।

—অন্য প্রেম? সুন্দরী আবার অবাক হয়ে বচন সিং-এর দিকে একবার তাকাল তারপর বলল, সে আবার কেমন প্রেম? বইয়ে তো এই প্রেমের কথা কিছু নেই।

—লেখাপড়ার সঙ্গে এ প্রেমের কোন সম্পর্ক নেই।

—আচ্ছা, স্কুল-কলেজেও এ প্রেম পড়ানো হয় না?

—না পাগলী মেয়ে, না। তুমি দেখছি একেবারে গোবেচারী।

—তা হলে আপনি বলছেন না কেন?

বচন সিং যখন ওকে কিছুতেই বোঝাতে পারল না তখন আরও সরল ভাষায় তার বক্তব্য বোঝানোর জন্য বলল, আচ্ছা এ-সব কথা ছাড়। তুমি এখন বল, কাল চলে যাচ্ছ?

—হ্যাঁ, বাবা বলে পাঠিয়েছেন।

—যদি উনি বলে না পাঠাতেন?

—তা হলে আমি যেতাম না।

—আচ্ছা, ওখানে গিয়ে আমার কথা তোমার মনে পড়বে?

—আপনি আমাদের ওখানে আসবেন না?

—না।

—না? মনে হল সুন্দরী যেন ভীষণ আঘাত পেয়েছে। সে বলল, তা হলে আমাকে পড়াবে কে?

—পড়ানোর জন্য আমি অন্য লোক ঠিক করে দেব।

—আমি আর কারও কাছে পড়ব না।

—বেশি লেখাপড়া শিখে করবেই বা কী?

গুরুমুখীতে বেশ ভালই লিখতে পড়তে পার। অনেক বানানও তোমার মুখস্থ।

—আপনি তো নিজেই বলেছিলেন, ক্লাস টেন পর্যন্ত আমাকে পড়াবেন।

—হ্যাঁ, তুমি যদি আরও পড় তা হলে তোমাকে শহরে নিয়ে গিয়ে মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করে দেব।

—আপনিও ওখানে গিয়ে থাকবেন তো?

—আমি? বাড়ি ছেড়ে আমি কী করে ওখানে গিয়ে থাকি বল?

সুন্দরী চুপ করে গেল। ও আর কিছু বলল না। তার মনে হল বচন সিংকে সে ভুল প্রশ্ন করে ফেলেছে।

বচন সিং আবার বলতে শুরু করল, সুন্দরী, আমার কাছে তোমার থাকতে ইচ্ছা করে না?

—আপনার কাছে? আপনার কাছে কি লোকে আমায় থাকতে দেবে?

—আচ্ছা সুন্দরী, তুমি আমাকে ভালবাস না?

ভালবাসার নাম শুনে সুন্দরীর ঠোঁটে মিষ্টি হাসির ঝিলিক খেলে গেল। তারপর সে বচন সিং-এর কাঁধে মাথা রেখে বলল, আপনি···আপনি··· আমি···সে চেষ্টা করেও যে কথাটা বলতে চাইছিল বলতে পারল না।

কিন্তু বচন সিং তার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গিয়েছিল। সুন্দরীর সঙ্গে সঙ্গে প্রবাহিত হয়ে চলেছে উজ্জ্বল প্রেম-প্রবাহ।

বচন সিং তাতে বিভোর হয়ে গেল।

প্রেমিক প্রেমিকা দুজনে দুজনকে যে কথা বলবে বলে ভেবেছিল সে কথা কেউই আর বলতে পারল না। তা তাদের মনের মধ্যেই থেকে গেল। কারুরই আর সে কথা বলার দরকার হল না। তারা দুজনে অনুভব করতে লাগল যে তারা আর আলাদা নয়, তারা আসলে এক।

বচন সিং ঘড়ি দেখল। আড়াইটা বেজে গেছে। সে বলল, আচ্ছা সুন্দরী, এখন তুমি গিয়ে শুয়ে পড়। রাত অনেক হয়ে গেল। সে সুন্দরীর হাতে চুমু খেল। বচন সিং-এর ঠোঁটের স্পর্শে সুন্দরী এমন বিভোর হয়ে গেল, যে সে জানতেই পারল না বচন সিং কখন ওখান থেকে চলে গেছে।

॥ ২০ ॥

ধীরে ধীরে রাত্রির অন্ধকারে চারিদিক ছেয়ে গেল। মাঘের ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দীওয়ানপুর গ্রামের বাইরে কুয়ার ধারে লোক চলাচল করছে। গাধার পিঠে বসে একটি বছর তেরো বয়সের ছেলে হেঁ হেঁ করে এক জোড়া গোরু তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কুয়োর চারিদিকে ঝিঁঝি পোকার মিষ্টি আওয়াজ ভেসে আসছে।

কূপের পাড়ের ধারে যেখান দিয়ে ঝিরঝির করে জল বয়ে চলেছে, সেখানে চারিদিকে গোল হয়ে বসেছিল গ্রামের মেয়েরা। ওদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কাছেপিঠেই খোলামকুচি নিয়ে খেলা করছিল।

একটু দূরে কাপাস খেত। কিন্তু এখন আর একে কাপাস খেত না বলে শুকনো ঝোপ-ঝাড়ের খেত বললেই ভাল হয়। কেননা, কোন গাছে এক টুকরো পাতাও ছিল না, ফুলও নয়।

হ্যাঁ, কাপাসের খালি খোসাগুলোয় সারা গাছ ভরতি। হাওয়ার দোলা লেগে গাছগুলি থেকে খড় খড় শব্দ উঠছিল।

এই সঙ্গে মাটি থেকে অর্ধেক মাথা তোলা সাদা সাদা মূলোগুলোর মাথার ওপর সবুজ পাতা দুলছিল। মনে হচ্ছিল কোন এক রাজকুমারীর মাথায় কে যেন চামর দোলাচ্ছে।

শুকনো কাপাস খেতের মধ্যে এই সবুজ খেত দেখতে কী সুন্দর লাগে! মনে হয় বুড়ো বাপের কোলে যেন কোন দুরন্ত আদুরে ছেলে খেলা করছে।

যখন জোরে জোরে হাওয়া বয়, তখন মূলোর ছোট্ট ছোট্ট

পাতাগুলো তুলো গাছের নীচে এমন ভাবে হেলে পড়ে যে মনে হয় কোন শিশু ভয় পেয়ে বাবার কোলে উঠে মুখ লুকোবার চেষ্টা করছে।

ঠিক এই সময় দেখা গেল মূলো খেতের কাছে তিনটি লোক বসে।

ওদের মধ্যে থেকে একজন খেত থেকে একটা মূলো তুলে মূলোর গোড়া থেকে মাটি পরিষ্কার করতে করতে অন্য লোকগুলোর দিকে চেয়ে বলল, তা হলে ও ব্যাটাকে সিধে করা যাবে না? ও তা হলে এমনি করে চিরকাল আমাদের পিছনে লেগে থাকবে?

দ্বিতীয় ব্যক্তি— কিন্তু ভাই পালা সিং, এতে আমাদের আর কী দোষ বল। তুমিই তো এ ব্যাপারে টালবাহানা করে যাচ্ছ। তোমাকে তো বলেছি ভাই, একটা এসপার ওসপার করে ফেল। তবেই কাজ হবে।

পালা সিং— বীরু, আমি কি এসপার-ওসপার করতে তোমাদের বারণ করেছি? তোমরা একেবারে অকম্মার ঢেঁকি! কোন কাজের নও! কালকের ছোকরা ওই বচন সিংকে যদি টিট করতে না পার তাহলে তোমাদের আর কী হবে।

তৃতীয় ব্যক্তি— কিন্তু পালা সিংজী তো বড় বড় ডাকাতি করার সময় একটুও ভয় পায় না। অথচ সেই পালা সিংজী বচন সিংকে এত ভয় পায় কেন বুঝি না।

দুই বন্ধুর কথাবার্তাগুলো পালা সিং-এর বুকে তীরের মত বিঁধল। সে নিজেকে কোনরকমে সামলে নিয়ে বলল, কে বলল, আমি ওকে ভয় পাই? গুরুজীর দিব্বি, আমি যদি মনে করি ও-ব্যাটাকে এক কোপেই সাফ করে দিতে পারি, কিন্তু তোমরা কি দেখছ না, সেই ছুঁচো মেয়েটি বচন সিং-এর জন্য কী রকম জান লড়িয়ে দিচ্ছে। আমি বলে রাখছি, এমন যেন না হয় আমি রাগের মাথায় বচনকে একটা কিছু করে বসলাম আর পরে যার জন্য এত কাণ্ড সেই ছুড়ীটা ওর শোকে আবার মরার দাখিল হল। সোওয়া সিংজী, আমি কী চাইছি জান, এমন একটা উপায় খুঁজে বার করতে হবে যাতে এক ঢিলে দুই পাখিই মরে। বচন সিংকে নিয়ে রোজ রোজ এই ঝামেলাও পোহাতে হয় না। আর ওই পরীরানীটিরও একটু দড় হয়।

বীরু— আর ওর বাপ ওই কাণা রোডুটাকে ?

পালা— কী করবে ? তুমি এ ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিন্ত থাকো। আমার তো শুধু নিজের জানটা নিয়েই ভয়। ওই বুড়োটাকে আমি মানুষই ভাবি না, ওকে আমি হাতের কড়ে আঙুল দিয়ে পিষে ফেলে দেব। কিন্তু বলি, পরের ঝামেলাটা পোহাবে কে ?

সোওয়া সিং— আরে ও-সব আজেবাজে কথা ছাড়। এবার বল আজকে ডেকেছ কেন ? দারুণ ঠাণ্ডা পড়েছে আজ। যা করবার তাড়াতাড়ি কর।

পালা— কোথায় ঠাণ্ডা ? সোজাসুজি বল না কেন মুখটা একটু গরম করতে ইচ্ছা করছে।

পালা সিং-এর কথা শুনে দুই বন্ধু জিভ কেটে হাসতে লাগল।

পালা সিং তার আগের কথার জের টেনে বলল, ঠিক আছে। ঠিক আছে। তোমাদের যাতে ঠাণ্ডা না লাগে সে ওষুধের ব্যবস্থা করে দেব। দেড় বোতল মাল এখনও পড়ে আছে। সেদিনকার থেকে বেঁচেছিল।

'দেড় বোতল' কথাটা শুনেই দুই বন্ধুর শরীরে লাল আভা খেলে গেল। বীর সিং বলতে লাগল, ভাই আমি তোমার মধ্যে নেই। তোমাকে যতক্ষণ না বরের পিঁড়িতে বসাতে পারছি ততক্ষণ কি আর আমার স্বস্তিতে বসবার জো আছে ?

সওয়া সিং— কিন্তু আমার মামীকে আনতে গিয়ে যেন আবার তেমনি না হয়। সেই যে কথায় বলে না, কোঠা বাড়ি তৈরি করেছেন অথচ সিঁড়িটা করতেই ভুলে গেছেন।

বন্ধুদের কথা শুনে পালা সিং-এর মদ না খেয়েই বেশ একটা আমেজের ভাব এল। সে বলল, 'মেয়ে কোথায় না ক্ষেতে। ছেলে কোথায় না পেটে। আয় জামাই মিষ্টি রুটি খেয়ে যা।' ওই বিবিরানী এখন বচনের হারেমের ভেতর আটকে রয়েছে আর উনি কিনা মামীর স্বপ্ন দেখছেন।

বীর সিং উতলা হয়ে বলল, কে বলছে এ কথা ? বুড়োটা তো ওকে দিন পাঁচেক হল বাড়ি নিয়ে গিয়েছে।

—আচ্ছা ? পালা সিং নিরাশ হয়ে বলল। চলে গেছে। তুই জানিস ? আমি তো সাত দিন বাইরে ছিলাম। আজ ফিরলাম।

বীরু— তা হলে জখম হওয়ার পর থেকে তুমি ওকে আর দেখনি ?

—না।

—ভাই, মাইরি গুরুর দিব্যি বলছি, এখন ওর চেহারাটা যা খোলতাই হয়েছে না। দেখার মত। গায়ের রঙ ফেটে পড়ছে যেন ময়দা আর সিঁদুর মেশানো। কয়েকদিনের মধ্যেই বেশ লতার মত বেড়ে উঠেছে। আরে ভাই, ও মেয়েকে পেলে তোমার কপাল খুলে যাবে।

পালা— ভাই, ওর ওপর প্রথম থেকেই নজর দিয়ে রেখেছি। ও হল আমারই সওদা। এখন এই মুখের গ্রাসটাও কি হাতছাড়া করে দেবে নাকি ? তোমার রাজত্বে বাস করে যদি এই সামান্য কাজটাও না হয় তা হলে আমি তোমাদের দুজনের পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব।

সোওয়া— ভাই, এ আর এমন কী কঠিন কাজ। ইচ্ছে থাকলে এক তুড়িতেই এই কাজ করা যায়। তোমার সওদার মাথায় তো আর সিং নেই। কিন্তু আগে বচনের একটা ব্যবস্থা কর। বচন থাকতে ওই মেয়েটিকে কাবু করা যাবে না।

পালা— কিন্তু সওয়া সিং, তোমার কি ধারণা বচন ওকে বিয়ে করবে ?

বীরু— নয় তো কী ? ওকে লেখাপড়া শিখিয়ে বিদুষী তৈরি করছে কি এমনি এমনি ?

পালা— কিন্তু আমি তো এই কথা বলে বলেই হয়রান হয়ে গেলাম বচনের বিয়ের জন্য পাত্রীর কি অভাব আছে ? বারো ক্লাস পর্যন্ত পড়া ছেলে। অনেক বড় বড় সর্দারের ঘর থেকে ওর বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে। ওই মেয়েটা আমার মত চাল-চুলোহীন লোকের পক্ষেই উপযুক্ত। যার সামনে পিছনে কেউ নেই।

সওয়া— ভায়া, তোমার কথাটা সত্যি। কিন্তু চাচা, শুধু কথায় তো আর চিঁড়ে ভেজে না। এর জন্য খোলা ময়দানে নেমে তোমাকে লড়াই করতে হবে। যে জিতবে সেই-ই ওকে পাবে।

বীরু— তোমরা বাজে কথা বলে পুরো সময়টা নষ্ট করলে। কোন কাজের কথা থাকে তো বল। নয় তো আমাকে ছেড়ে দাও। ঠাণ্ডায় আমার পা কাঁপছে।

একটু ভেবে নিয়ে পালা সিং বলল, আমার মতে বচন সিংকে কোন মামলায় জড়িয়ে দাও। তা হলেই বুঝবে হাতের ওপরে সরষে জমে যাবে। অসাধ্য সাধন করতে পারবে।

বীরু— আমারও তাই মত।

সওয়া— আমারও তাই মত। আমিও তোমাকে এই কথাটা বলব ভেবেছিলাম। কিন্তু বুড়োটার কী হবে ?

পালা সিং দুজনের কানে কানে কিছু বলল। কিছুক্ষণ ধরে কী সব ফিস ফিস করে কথা হল। শেষ পর্যন্ত ওরা একটা কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছল। তারপর সবাই মিলে এক দিকে চলতে আরম্ভ করল।

॥ ২১ ॥

সুন্দরী বচন সিং-এর বাড়ি থেকে চলে যাবার পর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। বচন সিং রোড়ুর বাড়িতে প্রায়ই আসে। ওর সহযোগিতায় সুন্দরীর পড়াশুনো বেশ ভালই চলছিল। আজ দুপুরে বচন সিং কুয়ো থেকে স্নান করে বাড়ি ফিরে দেখল ওর মা উদাস ভাবে বসে আছে। বচন সিং কারণ জিজ্ঞাসা করতেই ওর মা উত্তর দিল, আমি আর কী বলব কাকা।[১] তুমি কিছু বুঝতে পারছ না ?

কি ব্যাপার বল তো মা ? মা বলল, কাকা, দেখছ না, এই বাড়িতে অষ্টপ্রহর ধরে লোকজনের আনাগোনা লেগেই থাকত। কিন্তু আজ আর কেউ এমুখো হয় না। আজ সকালে সুরেনের ছেলে যে ওই হোশিয়ারপুরে থাকে সে এসেছিল। আমায় প্রণাম করার জন্য ও

১. ছেলে

দরজা দিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকল। আমি কী করে জানব, আমি ওকে ভাল মনে এক গেলাস ঘোল খেতে দিলাম। ঘোলটা খেয়ে ও বাড়ি চলে গেল। বাইরে থেকে কে বোধ হয় ওকে ঘোল খেতে দেখেছিল। ব্যস আর যাবি কোথায়? যেই বাইরে বেরিয়েছে অমনি সবাই ওর পিছনে লাগল। বলতে লাগল, কেন ওদের বাড়ির ঘোল খেলে? ওদের সঙ্গে তো কোন আত্মীয়-কুটুম্ব কোন সম্পর্ক রাখে না। তারপর দীননাথ ব্রাহ্মণের বাড়ি থেকে গঙ্গাজল নিয়ে ওকে খাইয়ে তবে তারা নিশ্চিন্ত হল।

বচন সিং বেশ কয়েকদিন ধরে তাদের ওপর গ্রামের লোকের অসম্মানজনক ব্যবহার লক্ষ্য করছিল। কিন্তু ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াবে তা ও বুঝতে পারে নি। লোকের অত্যাচার আর মায়ের দুঃখের কথা ভেবে তার হৃদয় গভীর ব্যথায় পূর্ণ হল। কিন্তু মনের দুর্বলতা কোন রকমে চেপে সে বলল, মা তারপর কী হল? যাকগে, তুমি মন খারাপ কোরো না। আমরাও কারুর কেয়ার করি না। ওরা আমাদের পাত্তা দিতে না চাক, না দিক। আমরা কি কারও বাড়ি পাত পাড়তে যাচ্ছি?

—কাকা, লোকের বাড়ি পাত পাড়তে নাই-বা গেলাম। মানুষের আত্মীয়স্বজনই তার শোভা। কথায় বলে, পাত পেড়ে বসে খাওয়ায় যে আনন্দ আলাদা বসে সে আনন্দ পাওয়া যায় না। সুখ-দুঃখ জীবন-মরণ মানুষের সঙ্গেই চলে। গাছপালা কখনও মানুষের জায়গা নিতে পারে না। এখন তো তোর বিয়ের চেষ্টা করতে হবে বাবা। আগে তো বেশ কয়েক জায়গা থেকে সম্বন্ধ এসেছিল। প্রচুর দিতে থুতেও চেয়েছিল। কিন্তু এখন তো কেউ আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়েও দেখে না। বল্ দিকি আমি কোথায় যাই? এতক্ষণ পর্যন্ত বচন সিং নিজের সহজ সরল স্বভাব আর খেয়াল মত মার সঙ্গে কথা বলছিল। কিন্তু মার মনে যে এতখানি আঘাত লেগেছে তা সে আজ প্রথম জানতে পারল। ও জবাব দেবার মত কথা খুঁজে পেল না। জবাব দেবার মত কিছু ছিলও না। এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে বলল, তা হলে এবার কী করব বল।

—করবে আবার কী? আত্মীয়-স্বজনদের তো আর ছাড়া যায় না। বাবা, সেই মেয়েটি তো এখন এখানে নেই। তাতে কি আমাদের কোন অসুবিধে হচ্ছে? সেই-তো এ-সব ঝগড়াঝাঁটির মূলে। যদি সে এই গ্রামে না আসত তা হলে আমাদের এত ঝামেলা পোহাতে হত না।

বচন সিং একটু উত্তেজিত হয়ে বলল, মা ওই বেচারী গরিব আর মা-মরা মেয়েটার জীবন বাঁচিয়েছি বলেই যত দোষ! যদি দোষ হয়ে থাকে তা হলে আমাকে যা সাজা দাও একশো বার মাথা পেতে নেব।

মা যখন ছেলের মতিগতি অন্যরকম দেখলেন, তখন তিনি বাড়ির কাজকর্মে মন দিলেন। বচন সিং মেজাজটা ঠিক করার জন্য বাইরে বেরিয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত সে ঘুরতে ঘুরতে রোড়ুর কুটীরে গিয়ে পৌঁছল। দেখল রোড়ু বাড়ি নেই। সুন্দরী কোন গভীর চিন্তায় মগ্ন। বচন সিং দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডাকল, সুন্দরী।

সুন্দরী চমকে উঠে বলল, হ্যাঁ বলুন।

—আজ কোন্ গভীর চিন্তায় ডুবে আছ সুন্দরী?

—আপনি এসে গেছেন? আমি আপনার অপেক্ষাই করছিলাম।

বচন সিং যখন ওর দিকে তাকাল তখন দেখে বুঝল সুন্দরী কিছুক্ষণ আগে খুব কেঁদেছে। সে নিজেকে সামলাতে পারল না। জিজ্ঞাসা করল, মনে হচ্ছে তুমি খুব কেঁদেছ?

সুন্দরী কোন জবাব দিল না। বচন সিং-এর উদ্বেগ আবার বেড়ে গেল। ও আবার বলল, জিজ্ঞাসা করলে যদি কোন অন্যায় হয় তা হলে জিজ্ঞাসা করব না। কিন্তু··· ।

—আপনাকে কিছু বলার মধ্যে আবার অন্যায় কি? আমাদের লচ্ছোকে কে গুম করেছে।

—গুম করেছে? কীভাবে? ও তো কখনও কোথাও যায় না। চেন খুলে রেখেই তো তোমরা ঘুমোও।

সুন্দরী ঠাণ্ডা নিশ্বাস নিয়ে বলল, কী জানি, কোথায় গেল! আমাদের ছেড়ে তো কখনও কোথাও যায় না। মনে হচ্ছে কেউ ধরে নিয়ে গিয়েছে। কাল রাত্তির থেকেই ওকে পাওয়া যাচ্ছে না।

বাবা কাল রাত থেকে কিছু মুখে দেয় নি। সারারাত ধরে কেঁদেছে। ওকে খুঁজতেই বাবা বেরিয়ে গেছে। আর আবার…

—হ্যাঁ আর কি?

—বাবা আপনাদের বাড়ি যাচ্ছিল, আমি ওঁকে যেতে দিই নি। আমি জানতাম, আপনি আসবেন।

বচন সিং উতলা হয়ে বলল, কেন? কোন জরুরি দরকার আছে নাকি?

সুন্দরী আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল। ওর চোখে জল এসে গেল। বচন সিং-এর হৃদয় তা দেখে উতলা হয়ে উঠল। সে নিজের পকেট থেকে রুমাল বার করে সুন্দরীর চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে বলল, সুন্দরী তাড়াতাড়ি বল, কী ব্যাপার?

সুন্দরী বচন সিং-এর হাত থেকে রুমালটি নিল। সে রুমাল নিয়ে নিজের চোখ পুঁছতে পুঁছতে বলল, বাবা বলছিল, আমরা এখান থেকে চলে যাব।

—চলে যাবে? কোথায়?

—আমরা অন্য কোন বস্তীতে গিয়ে থাকব।

—কিন্তু কেন?

সুন্দরী আঙুল দিয়ে রুমালের কোনায় গিঁট বাঁধছিল। মনে হচ্ছিল ও যেন নিজের দুঃখ ভুলে যেতে চাইছে। সে জবাব দেবার জন্য মাথা তুলল। কিন্তু ওর গলা দিয়ে কোন স্বর বেরোল না।

বচন সিং সুন্দরীর আঙুলগুলো ধরে নাড়তে নাড়তে বলল, সুন্দরী তাড়াতাড়ি বল।

মনের কথা কোন রকমে বলার চেষ্টাক রে সে বলল, লোকেরা আমাদের এখানে থাকতে দিচ্ছে না।

—কী বললে! থাকতে দিচ্ছে না? কী বললে তুমি?

—রোজই ওরা আমাদের পিছনে লাগছে।

বচন সিং কথাটা ঠিক ভাল করে বুঝতে পারল না। কিন্তু এর চেয়ে আরও স্পষ্ট করে কথাটা বুঝে সেটি সহ্য করার মত শক্তি তার ছিল না। সুন্দরীকে আশ্বস্ত করার জন্যই ও বলল, কিন্তু লোকে

তোমার বাঁদরকে নিয়ে গিয়ে কি করবে ?

সুন্দরীর আর বেশি কিছু বলতে ইচ্ছা করছিল না। সে বলল, কী জানি কি করবে !

ঠিক সেই সময় রোডু এসে ঢুকল ঘরে। বচন সিং-কে 'সৎশ্রী আকাল' বলে নমস্কার জানিয়ে সে ঘরের একপাশে গিয়ে বসল। বচন সিং তাকে জিজ্ঞাসা করল, কী বাঁদরীটার কোন খবর পাওয়া গেল ? রোডু ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে লাগল। মুখ দিয়ে কোন শব্দ বেরুল না।

সুন্দরী তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে রোডুর গলা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, বাবা বল না, কী ব্যাপার ? উত্তেজনায় ওর যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

রোডু ধুতির কোঁচার খুঁট দিয়ে চোখ মুছে বলল, সুন্দরী, তোর লচ্ছো মারা গেছে।

. মারা গেছে ? সুন্দরী আর্তনাদ করে উঠল। রোডুর কাঁধ দুটো ঝাঁকিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল।

—কী করে মারা গেল বাবা ?

—কে ওকে কুয়োর ভেতর ফেলে দিয়েছে।

—হায় হায় ! কুয়োর ভেতর। আমারও যেন মৃত্যু হয়।

একটা মাত্র দূরবীণে যে রকমভাবে দুটো জিনিস দেখা যায় সেই রকম বচন সিং নিজের একটা মাত্র হৃদয় দিয়ে তাদের দুজনের দুঃখ অনুভব করছিল। দুজনেই কেঁদে চলেছে।

কিছুক্ষণ পরে বুড়ো রোডুর মন কিছুটা হালকা হল। সে হাতজোড় করে বচন সিং-কে বলতে লাগল, সরদারজী ! আপনি আমাদের অনেক দয়া দেখিয়েছেন। আমি বোধহয় একশো বার জন্ম নিয়েও আপনার ঋণ শোধ করতে পারব না। আপনি আমার মেয়েকে পশু থেকে মানুষ করে দিয়েছেন। ওর প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে আপনাকে যে কত রকম দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করতে হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আমার ইচ্ছে ছিল, শেষজীবনটা আপনার চরণের তলায় কাটিয়ে দেব। কিন্তু মনে হচ্ছে, আমার

এখানকার অন্নজল উঠল। আমাদের জন্য আপনিও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন, আমরা যেন আর কোথাও চলে যেতে পারি।

কথাগুলি বচন সিং-এর মনে তীরের ফলার মত বিঁধছিল। মনে হচ্ছিল, কেউ যেন হৃদয়টাকে নিয়ে দুমড়ে-মুচড়ে দিচ্ছে। সে বলল, কিন্তু বাবাজী আপনারা চলে যাবেন কেন?

—সরদারজী, কী আর বলব। (সুন্দরীকে দেখিয়ে)

এই বাচ্চা মেয়েটিকে বড় কষ্ট করে মানুষ করেছি। যখন একে বাড়ি এনেছিলাম তখন ও একটা পাখির বাচ্চার মত ছোট ছিল। এত ছোট যে হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে যেত।

রোড়ু তাকে সুন্দরীর দুঃখের কাহিনী সব খুলে বলল। সে এও বলল, সুন্দরীকে সে কীভাবে পেয়েছিল। সে এও বলল, আমার কোন ধারণা নেই, লোকেরা নিজের ছেলে-মেয়েদের কতখানি ভালবাসে। কিন্তু আমার হৃদয়ে এই মেয়েটির জন্য যে কতখানি ভালবাসা তা আপনাকে ভাষায় বোঝাতে পারব না। যখন এ ছোট ছিল তখন ওকে মানুষ করার চিন্তাই আমার বড় চিন্তা ছিল। কিন্তু আপনি জানেন, ও আর এখন আগের বাচ্চা মেয়েটি নেই। আর আমার অবস্থা তো জানেনেই। বড় রাস্তায় পড়ে থাকলে খড়-কুটোরও এদিক ওদিক নড়ার শক্তি হয়। আমার মধ্যে তাও নেই। আমি আর কাকে বিগড়ে দিতে পারি বলুন!

রোড়ু আবার ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে লাগল। সে আবার বলল, কয়েক মাস ধরে দেখছি গ্রামের লোকেরা আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করছে না। বেশ কিছু ছোকরা একত্র হয়ে আমার কুটীরের সামনে দাঁড়িয়ে 'গিরদে'[1] নাচে আর খিস্তি করে। খেউড় করে। আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে এমন সব কথা বলে যে শুনে আমার কলজেটার ভেতর জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যায়। আর আপনার নাম নিয়ে…।

বচন সিং তার মায়ের কথা শুনে আগেই দুঃখ পেয়েছিল। ভাবছিল কীভাবে এই দুর্ভাগ্যের হাত থেকে সে উদ্ধার পাবে। কিন্তু রোড়ুর

---

১. পাঞ্জাবের লোকনৃত্য

কথা শুনে সে নিজের দুঃখের কথা ভুলে গেল। বেশ কিছুক্ষণ সে এই-সব চিন্তায় ডুবে ছিল। তারপর সে বলল, আমি এ-সব কথা শুনে খুবই দুঃখ পেলাম। কিন্তু বুঝতে পারছি না কী করা উচিত। আচ্ছা আপনি কি ঠিক করলেন ?

—চলেই যাব, রোডু চোখ মুছে বলল— সরদারজী ! কী আর বলব। সুন্দরীর চিন্তা যদি না থাকত তা হলে আমি এই জায়গা ছেড়ে কখনই যেতাম না। আমার এই ভাঙা-চোরা কুঁড়েঘরটিকে আমি ভীষণ ভালবেসে ফেলেছি। এই ঘর ছেড়ে যাওয়ার পর আমি জানি না, আমার কি দশা হবে। কিন্তু করবই বা কি ! বাড়িতে যুবতী মেয়ে থাকতে আজে-বাজে কথা সহ্য করিই-বা কী করে। তা ছাড়া সুন্দরীর বিয়েরও একটা ব্যবস্থা করতে হবে। সরদারজী, জঞ্জাল তো লোকে জঞ্জালের ওপরেই ফেলে। তাই না ?

কিছুক্ষণ থেমে রোডু আবার বলল, সরদারজী, এই হীরেকে আমি কঁড়ির চুপড়ির মধ্যে বন্ধ করে রাখতেও তো পারি না। আপনার দয়ায় সুন্দরী লেখাপড়া শিখেছে। একে তো আর কলন্দর-বাজিগরের হাতে তুলে দিতে পারি না। আমি চাই সুন্দরীর বর তার যোগ্য হবে। কিন্তু আমি কি আর এমন কপাল করে এসেছি।

বচন সিং আরও কিছু ভাবছিল। কোন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে সে বলল, না বাবাজী, আমি আপনাদের এখান থেকে যেতে দেব না।

রোডু কোন জবাব দিল না। বচন সিং আবার বলল, ভগবান সুন্দরীকে ধুলো-মাটি ঘাঁটার জন্য তৈরি করেন নি। আমার ইচ্ছে ও আরও পড়াশুনো করুক।

এ কথা শুনে রোডুর মনে হল সে যেন একজন বড় অপরাধী। তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। কোন উকিল তাকে এই সাজা থেকে মুক্তি দেওয়ার কথা বলে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। রোডু কোন-রকমে বলল, সরদারজী, আপনি আমাদের জন্য কী না করেছেন। আমাদের জন্য কি আপনাকে কম দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হয়েছে ? আপনি জীবনে উন্নতি করুন। আপনার বাড়-বাড়ন্ত হোক। কিন্তু আপনি আমাদের জন্যে শুধু শুধু কেন চিন্তা করছেন ? আমার ভাগ্যে

যা লেখা আছে তা ভোগ করতে হবেই। আপনি চিন্তা করবেন না। আমাদের চলে যেতে দিন।

বচন সিং জোর গলায় বলল, কিন্তু বাবাজী, আপনাদের ওপরে যে অত্যাচার হচ্ছে, তা একবারেই বরদাস্ত করতে পারছি না।

রোড়ু একটু নরম হয়ে বলল, আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনার যা ইচ্ছে···আমি তো···কিন্তু আপনি তো আমার অবস্থা সব শুনলেন··· ।

—যা হয়েছে তা সুন্দরী এখানে থাকার জন্য। আমি ওকে কোন স্কুলে ভরতি করে দেব।

সুন্দরী এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল, এমনভাবে সে বচন সিং-এর দিকে তাকাল, যেন মনে হল, জীবনের আশা ছেড়ে দেওয়া কোন রোগীকে কে যেন প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছে। সে মুচকি হেসে বচন সিং-এর দিকে তাকাল। উত্তরে বচন সিংও মুচকি হেসে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

॥ ২২ ॥

বাবা রোড়ুর কথাই ঠিক হল। হ্যাঁ, সুন্দরীর জন্যই যত ঝামেলা। যেদিন সুন্দরী দীওয়ানপুর চলে গেল, সেদিন থেকেই সব রকম কানাঘুষো বন্ধ হয়ে গেল। পালা সিং কিন্তু মনে গভীর দুঃখ পেল। কোথায় সুন্দরীকে সে ভাগাবার তাল করছে সেই সুন্দরী কিনা পাখির মত উড়ে গেল। সুন্দরীর ছায়াটা পর্যন্ত সে দেখতে পেল না।

পালা সিং-এর মনে আগে থেকেই আগুন জ্বলছিল। সে আগুন বচন সিং-এর প্রতি রাগের। যখন থেকে সে জানতে পেরেছে যে বচন সিং তার শিকার ছিনিয়ে নিয়ে গেছে তখন থেকে তার আগুন আরও তীব্র হয়েছে। সুন্দরীকে কি করে আবার ফেরত আনা যায় এই চিন্তায় সে সব-কিছু ভুলে গেল। কিন্তু সুন্দরীকে ফেরত আনার কোন রাস্তাই সে খুঁজে পেল না।

শেষ পর্যন্ত অনেক ভেবেচিন্তে সে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল যতক্ষণ না

বুড়ো রোড়ু কিংবা বচন সিং-এর কোন বড় বিপদ না হয়, ততক্ষণ সুন্দরী লেখাপড়া ছেড়ে এখানে আসবে না। ধীরে ধীরে সে নিজের চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু তার সেই চেষ্টা সঙ্গে সঙ্গে সফল হল না। সফল হতে ঠিক বছর তিন লেগে গেল।

সুন্দরীকে লাহোরের একটা মেয়েদের আশ্রমে ভরতি করে বচন সিং ভাবতে লাগল সে মাথা থেকে একটা ভারী বোঝা হালকা করে ফেলতে পেরেছে। তা ছাড়া সে ভবিষ্যতের অনেক বড় বড় ঝামেলা থেকেও মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু সে জানতে পারল না তার শত্রুরা ভেতরে ভেতরে কী করছে। ধীরে ধীরে সুন্দরীর প্রসঙ্গ স্তিমিত হয়ে এল। সুন্দরীর বিহনে বচন সিং-এর মনে হতে লাগল সে যেন বহু মূল্যবান জিনিস খুইয়েছে।

সে প্রত্যেক মাসে সুন্দরীর লেখাপড়ার সব খরচা পাঠিয়ে দিত। তা ছাড়া বুড়ো রোড়ুরও খোঁজখবর নিত। প্রায় প্রতিদিনই সে তার কুটীরে গিয়ে অন্তত কিছুক্ষণ বসত আর তাকে সান্ত্বনার কথা শোনাত।

সময় তার আপন গতিতে এগিয়ে চলল। সুন্দরী তিন বছর ধরে লেখাপড়া করল। ক্লাস টেনের পরীক্ষা পাস করার পর সে আবার দীওয়ানপুরে ফিরে এল। সে কোথায় এল? কেন এল? প্রেমিক-প্রেমিকার এই তিনটে বছর কিভাবে কাটল। এ সবের বিবরণ আগের লেখা চিঠিগুলো থেকে জানতে পারা যাবে। এই চিঠিগুলো তারা একে অপরকে লিখেছিল। এই পবিত্র আর আদর্শ প্রেমের রঙে রঙিন চিঠিগুলো কিন্তু রসহীন নয়। সেইজন্য উপন্যাসের গল্প বিস্তার করবার আগে পাঠকদের সামনে ওই চিঠিগুলো পেশ করা উচিত বলে মনে করি। সম্ভবত কিছু উতলা পাঠক এই চিঠিগুলো অনর্থক মনে করতে পারেন। তাঁদের কাছে আমার অনুরোধ তাঁরা যেন এই চিঠিগুলো না পড়ে, পরের অধ্যায় থেকে পড়া শুরু করেন। কিন্তু আমি ব্যক্তিগত ভাবে এই দুই প্রেমিক-প্রেমিকার চিঠিগুলো না পড়ে ছেড়ে দিতে পারছি না। কারণ এই চিঠিগুলির মধ্যে ওদের আত্মা ছাড়াও, ওদের প্রেম, উচ্ছ্বাস

আর মানসিক চিন্তাধারা বিন্দু বিন্দু করে ঝরে পড়েছে। মানব-মনে এই চিঠিগুলি গভীর রেখাপাত না করে পারে না।

প্রথম চিঠি

আদরণীয় আমার·····, কন্যা আশ্রম,
লাহোর।

প্রত্যেকটি অধ্যাপিকা আমাকে জীবন দিয়ে ভালবাসেন। আমার ক্লাসের মেয়েরা আমাকে তাদের বোনের মত ভালবাসে। বোর্ডিং-এর সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট তো আমাকে এক মিনিটও তাঁর চোখের আড়াল হতে দেন না। আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না। কিন্তু সব-কিছু হওয়া সত্ত্বেও আমার মনের বেদনা ক্রমেই যেন বেড়ে যাচ্ছে। কিছুই ভাল লাগছে না। আমার অন্তর কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। মনে হয়, আমার কী যেন হারিয়ে গেছে। আর আমার ভিতরের পুরো শক্তি সেই হারিয়ে যাওয়া জিনিসটাকে খুঁজছে। আপনি কি বলতে পারেন আমার এমন কেন হয়? এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে আমি কি করব?

আমি সব সময় চিন্তায় ডুবে থাকি। কিন্তু এখন, যে সময় আপনাকে আমি চিঠি লিখছি, মনের ভেতরে একটা অদ্ভুত সাহস ও বল পেয়েছি। ইচ্ছে করছে আপনাকে শুধু লিখি, লিখি, লিখি। কিন্তু কী যেন একটা ভেবে আমি লেখা বন্ধ করছি। আপনার চিঠির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

আমার বাবাকে আপনি আমার হয়ে 'সৎশ্রী আকাল' জানাবেন। এ কথা না বললেও চলে যে গুরুজী আর আপনি ছাড়া তাঁকে আর কেউ দেখার নেই।

—সুন্দরী

দ্বিতীয় চিঠি

সুন্দরীজী, দীওয়ানপুর।

আপনার চিঠি আমি সময় মত পেয়েছি। ঠিক সেই সময় আমি আপনার চিন্তায় ডুবে ছিলাম। কি রকম চিন্তা? আমি নিজেই জানি না। চিঠি পড়ে মন খুশিতে ভরে উঠল কিনা, মনের ভাব কী হল তা বলতে পারব না। কারণ আমি নিজেও তা বুঝতে পারি নি। লেখার সময় আপনি নিজের যে অবস্থার কথা বলেছেন বোধ হয় চিঠি পড়ার সময় আমারও ঠিক সেই অবস্থাই হয়েছিল। হ্যাঁ, আপনার মন খারাপ হওয়ার কথা পড়ে মনে আমিও দুঃখ পেলাম। কিন্তু এটা কোন নতুন কথা নয়। নতুন জায়গায় গিয়ে আপনজনদের কথা মনে পড়লেই মন খারাপ হয়ে যায়। যে মেয়ে এতখানি বয়স পর্যন্ত কখনও বাইরে পা রাখে নি, সে যদি একেবারে কোন নতুন জায়গায় চলে যায়, তার তো মন খারাপ লাগবেই। এটাই তো স্বাভাবিক। আশঙ্কা করছি, আপনি তাড়াতাড়ি দীওয়ান-পুরের রাস্তাঘাট ভুলে যাবেন। আপনি তো আবার আপনার ধর্ম-পিতাকেও ভীষণ ভালবাসেন। সেই জন্য আপনার মন খারাপ হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক।

তবে আমি একটা কথা বলা জরুরি বলে মনে করছি। আপনি মন দিয়ে লেখাপড়া করবেন। সুন্দরীজী, আপনি এখন একেবারে ছেলেমানুষ নন। নিজের লাভলোকসান নিজেই ভাল বোঝেন। আমি চাই আপনি তাড়াতাড়ি লেখাপড়া শেষ করে নিজের বাড়িতে চলে আসেন। আপনি যার ঘরে যাবেন তিনি যেন সত্যিকারের সুখী হন। আপনাকে যিনি পাবেন তিনি যেন বুঝতে পারেন আপনি শুধু সৌন্দর্যের দেবীই নন, আপনি বিদ্যাবুদ্ধিরও প্রতিমা।

আপনার বাবা ভালই আছেন। আপনি কোন চিন্তা করবেন না।

—বচন সিং

তৃতীয় চিঠি

কন্যা আশ্রম,
লাহোর।

অনেক প্রতীক্ষার পর আপনার চিঠি পেলাম। নিজের চিঠিটা লেটার বক্স-এ ফেলেই আপনার চিঠির অপেক্ষা করছিলাম। যখন চিঠি লিখতে বসলাম, ভাবলাম আজ বেশ কয়েক পাতা লিখব। কিন্তু লেখা শুরু করার পর যা যা লিখতে চাইছিলাম তা লিখতে পারলাম না। জানি না কে আমার কলম ধরে টানছে? বার বার কাগজ নিচ্ছি আর ছিঁড়ছি।

আপনি কি আমার কথা ভাবেন? আপনি কি বলতে পারেন না আপনি আমার সম্বন্ধে কী চিন্তা করেন? কিন্তু আমিও তো একদম খুকী নই! আপনি তো নিজেই বলেছেন আমি একেবারে ছেলেমানুষ নই। আমি আপনার চিন্তার কথা ভাল করেই বুঝতে পেরেছি। আমি দেখেছি, একটি অনাথ মেয়েকে অজ্ঞানতার পঙ্ক থেকে তুলে তাকে সম্মানের আসনে বসানোর জন্য কত বিপদই না মাথায় করেছেন। আমি আপনার এই ঋণ শোধ করা তো দূরের কথা, আপনার এই ঋণের বর্ণনা করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আপনি আমাকে যে বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন, আপনি তার দশগুণ বিপদে পড়েছেন। কি জানি আপনার ওপরে আর কত বিপদ আসবে। কেন, আমি কি এ-সব একেবারে বুঝতে পারি না?

এই অবস্থায় আপনার জন্য যদি আমার চিন্তা না হয় তো কার হবে?

এই-সব কথাগুলো মনে পড়লে ইচ্ছে করে ধরিত্রী আমাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলুন। মিশে গিয়ে আপনার সমস্ত দুঃখ ও চিন্তার আমি অবসান ঘটাই। কিন্তু আমি কি করব? আমি শুধু নির্লজ্জের মত বেঁচে আছি।

আপনি লিখেছেন, অপরিচিত জায়গায় চলে যাওয়ার দরুন আমার মন উদাস হয়ে গেছে। এটা ঠিক নয়। যেখানেই আমি

থাকি-না-কেন, আপনার আশীর্বাদ আমার মাথার ওপরে আছে। তা জ্বালামুখী পাহাড়ের ওপরেই হোক-না-কেন তাও আমার কাছে স্বর্গ। ভরসা দিচ্ছি আমার উদাস হওয়ার কারণ এটা নয়।

কী বললেন, আমি দীওয়ানপুরের গলি রাস্তা ভুলে যাব? মাফ করবেন, আমার হৃদয় ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলার জন্য আপনি ওই কথাটা লিখেছেন। আমি কোন জন্মেই দীওয়ানপুরের গলির কথা ভুলতে পারব না। হ্যাঁ, এই কথা ঠিক, ধর্ম-পিতার প্রতি মমতা সাধারণ কথা না — কিন্তু— আপনার চিঠির শেষ কথাগুলো পড়ে মনে এখন ভীষণ দুঃখ পাচ্ছি। আমি আজ পর্যন্ত কখনও বিয়ের কথা ভাবি নি। আমাকে কি সেই দিনটাও দেখতে হবে যেদিন আমার মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা একেবারে জ্বলে খাক হয়ে যাবে? আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি সে সময়টা আসার আগেই আমি এ সংসারে আর থাকব না। আপনি কি আমার মত অভাগিনীর এই জন্য উপকার করছেন যাতে শেষে আমাকে জ্বলন্ত উনুনে ফেলে দিতে পারেন।

হায়! আমি এ ব্যাপারে অনেক কিছু লিখতে চাই। যদিও এখন লিখব না। এই রকম মূর্খতা করব না। চিঠি শেষ করলাম।

চতুর্থ চিঠি

সুন্দরীজী, দীওয়ানপুর

আপনার চিঠি পেলাম। আমার মূর্খতার জন্য আপনি দুঃখ পেয়েছেন। কথাটা যতই ভাবছি ততই আমার লজ্জা লাগছে। এখন আমি নিজেই বুঝতে পারছি আমি কতখানি অশালীন আর অনুচিত কাজ করছি। আমার মনটা যেন কী রকম বদলে যাচ্ছে। এই ফুলকে আমি এই জন্যে ছিঁড়তে দিই নি যে তা হলে তার সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাবে। যে গাছকে ভালভাবে বাড়বার জন্য আমার পুরো শক্তি নিয়োজিত করেছিলাম, সেই গাছের ফুলের গন্ধ আমাকে পাগল করে দিয়েছিল। এই জন্যই আমি তার উপব নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার

জন্য তৈরি হয়েছিলাম। সুন্দরীজী, মানুষের মন কত চঞ্চল। এই মন কখনও আকাশে ওড়ে আর কখনও পায়ের তলায় একেবারে লুটিয়ে পড়ে। আসলে আমি আমার এই মানসিক দুর্বলতাকে লুকোতে চাইছিলাম। শুধু আপনার কাছ থেকে নয় নিজের কাছ থেকেও। সেই জন্যই তো আমি আপনাকে যা-কিছু লিখতাম, হৃদয়ে পাথর রেখে লিখতাম। যাতে আপনি আমাকে নীচ ও অশালীন প্রকৃতির বলে না মনে করেন।

আমি এখনও পর্যন্ত এই ভাবতাম যে আমার হৃদয়ের ইচ্ছেকে আমি কখনও আপনার সামনে তুলে ধরব না। নিজের সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে এই অন্যায় ইচ্ছেটার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব। কিন্তু আমার মনে মনে সব সময় একটা চিন্তা ছিল, নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে কখনও যেন কাজ না করি। আমি আমার চিঠিতে এই-সব কথার উল্লেখ করেছিলাম। মনে হচ্ছে, ওই কথার অর্থ আপনি অন্যভাবে ধরেছেন। হ্যাঁ, আপনি বার বার 'উপকার' শব্দটা ব্যবহার করেন কেন? আমি আপনার জন্য যা করেছি তা একেবারেই উপকার নয়। এ তো প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। আপনি কিন্তু আমার প্রতি খুব অন্যায় করছেন। এ অন্যায় আমি ক্ষমা করব না। আপনার জন্য আমি যা করেছি তা কি নেহাত মানবিকতার তাগিদ নয়?

কিন্তু সুন্দরী। আমি এখন যে জিনিস নেবার জন্য উদ্বিগ্ন, সেই জিনিসটা নিজের থেকেই আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তার সুখ-শান্তি না নষ্ট হয়, সেই জন্য আমার আসল কথাটা বলে দেওয়া উচিত।

সুন্দরী! আপনার সাংসারিক গুণ আমাকে সর্বপ্রথম সেদিন মুগ্ধ করেছিল, যেদিন আপনাকে আমি গুরুদ্বারের বাইরে একলা বসে লিখতে দেখি। তারপর তো আপনার প্রত্যেকটা গুণ আমাকে মুগ্ধ করেছে। এখন হাজার চেষ্টা করেও আপনার থেকে দূরে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

কিন্তু এই-সব হয়েও, ভগবান বোধ হয় আমাদের দুজনকে এক হতে দেবে না। বোধহয় পুরো জীবন আমাদের আলাদা হয়েই

থাকতে হবে। আমার মনে হয় আমরা আর আগে না এগিয়ে, বরাবরের জন্য আলাদা হয়ে যাই। এই তো ভাল, তাই না?

—আপনার বচন সিং

পঞ্চম চিঠি

কন্যা আশ্রম
লাহোর।

আমার প্রিয়তম!

আপনাকে পেয়ে আমার জীবনধারাই বদলে গেল। আপনি আপনার চিঠিতে যা কিছু লিখেছেন আমিও ঠিক তাই লেখার চেষ্টা করছিলাম। যে সময় আপনার মনের আয়নায় আপনার আসল ছবিটা ফুটে উঠে কাগজের ওপর কিরণ ছড়াচ্ছিল, ওই সময় আমার হৃদয় নদীর বাঁধ ভেঙে আমার যত শঙ্কা, যত চঞ্চলতা, যত দ্বিধাদ্বন্দ্ব সব কিছু সেই সঙ্গে ভেসে যাচ্ছিল। শুধু পড়ে রইল মনের শুদ্ধ আর আদিম ভাবনাটুকু।

আমি আপনাকে কি লেখার চেষ্টা করছিলাম, শুনবেন? আচ্ছা বলছি। আমি আপনার চিঠি পাবার আগেই চিঠি লেখা শুরু করেছিলাম।

আমার সর্বস্ব। আমি কখনও আপনাকে প্রবঞ্চনা করতে পারব না। আমি কখনও এমন অবস্থা বরদাস্ত করতে পারব না, যে আমার মনে এক রকম হবে আর বাইরে আর-এক রকম হবে। এ আমার অপরাধ। কিন্তু এ অপরাধ আমি আর করব না। দুনিয়ায় শুধু আপনাকেই ভালবেসেছি। এই ভালবাসার কবে শুরু তা আমি জানি না। তবে এটুকু জানি, আমার এই হৃদয়ে আপনি ছাড়া আর কারও জন্য জায়গা নেই। এ জন্মেও সেখানে কারুর জায়গা হবে না। কিন্তু পাহাড়ের যে শীর্ষে ওঠার আমার ইচ্ছে আছে, ওই শীর্ষে আমি কি উঠতে পারব। আমি জানি তা কখনই পারব না।

কিন্তু এ-সব জেনেও আমি নিরাশ হই নি। আমার সাহস আছে। আমি শারীরিক দিক দিয়ে ওখানে না পৌঁছালেও, আমার চিন্তাধারা —ভাবনায় সেখানে পৌঁছাবেই। আমার দেহ যদি ওখানে না

পৌঁছয় না পৌঁছক। আমি চন্দন বনের সুগন্ধ থেকেই চন্দন তৈরি করে নিতে পারব। আমার সেই চিঠির মূল বক্তব্য এই ছিল। কি বললেন, আমাদের সামনে অনেক বাধা আছে! না প্রিয়তম, আমি এ কথা স্বীকার করি না। বাধা হল—আমাদের বিয়ে··· আমার সরল প্রিয়তম! এ কথা নিজের মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিন। আমি তো আগেই এ কথার জবাব দিয়ে দিয়েছি। আপনাকে আমি আনন্দের সঙ্গেই বলছি আপনি বিয়ে করে নিন। তাড়াতাড়ি বিয়ে করে নিজের মায়ের অভিলাষ পূর্ণ করুন। আপনার বিয়ের খবর শুনে আমি ভীষণ খুশি হব।

—আপনার সুন্দরী।

ষষ্ঠ চিঠি

সুন্দরী!

আমি কত ভাগ্যবান, আপনার মত অলৌকিক দেবীর ভালবাসা আমি জয় করে নিলাম। সুন্দরী! আপনার পবিত্র মন আর অলৌকিক ভালবাসা আমাকে অন্ধকার জগৎ থেকে আলোয় এনেছে। আমার মনে হচ্ছে, আমি এখন কোন মধুর জগতে বিচরণ করছি। মনে হচ্ছে, আমার ভিতরে একটি মধুর সংগীতের রাগিণী বেজে চলেছে। মনের সমস্ত তন্ত্রীগুলিতে সেই সুর অনুরণিত হচ্ছে। তুলছে এক শাশ্বত ঝংকার। আপনার চিঠির এক-একটি শব্দ আমার কাছে স্বর্গের এক-একটি পারিজাত ফুল। আমার সমস্ত হৃদয় মন তাতে এমন ভাবে ভরে উঠেছে যে সংসারের সুখ আর ঐশ্বর্য তার কাছে কিছুই নয়।

সুন্দরীজী, আপনার চিন্তাধারা সত্যিই কত উঁচু। আপনার মনের আধারে সারা বিশ্বের প্রেম জমা হয়ে রয়েছে। আপনার ছোট্ট হৃদয়ের ভেতর ভালবাসার এত বড় ভাণ্ডার কি করে থাকতে পারে তা আমি বুঝে উঠতে পারছি না।

আমি আপনাকে লিখেছিলাম আমাদের দুজনের মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান রয়েছে। আপনি এ কথার ভুল অর্থ করে ভেবে নিয়েছেন যে আমি আমার আত্মীয়-স্বজনের ভয়ে আপনাকে বিয়ে করতে চাই

না। এ ভয়কে তো আমি অনেক দিন আগেই তিলাঞ্জলি দিয়েছি। আমার লেখার অর্থ এই ছিল যে জ্ঞানী মহারাজের উপদেশ মত আমি স্থির করেছি, আমি আমার জীবন সমাজের উন্নতির জন্য নিয়োগ করব। মা যতদিন বেঁচে আছেন, আমি এখানেই থাকব। তারপর সাংসারিক মায়া-মমতার কথা ভুলে গিয়ে আমি সমাজের কাজে নিজের জীবন সমর্পণ করব।

সুন্দরী। আমি আমাদের এই শয়তান আর মূর্খ সমাজের অবস্থাটা দেখছি। আমি দেখতে পাচ্ছি এই সমাজের অগ্নিকুণ্ডে কত নির্দোষ কোমল জীবন আহুতি দিচ্ছে। এই জন্যই তো বিয়ে করে সাংসারিক মায়ামমতায় জড়িয়ে না পড়ে নিজের কর্তব্য পালনের জন্য সংসার থেকে দূরে সরে যাব স্থির করেছি। যদি আমি আমার এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কাজ করি তা হলে আপনার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। আমাকে বিয়ে করলে আপনাকে হয়তো গোটা জীবন একলাই কাটাতে হবে নতুবা আমার সঙ্গে থেকে আপনাকে সারা জীবন ধরে ক্ষুধায়, পিপাসায় ব্যাধিতে জীবন কাটাতে হবে।

আপনার চিঠি পড়ে আমার সব সংশয় দূর হয়ে গেছে। কিন্তু এই ভেবে আমার লজ্জা হচ্ছে যেন সামান্য অ-আ-ক-খ পড়া ছাত্র হয়েও আমি ক্লাসের চৌকশ মণিটাকে বলছি তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হতে পারে না কারণ এই এক বছরের মধ্যে আমি অ-আ-ক-খ শেখা শেষ করব বলে প্রতিজ্ঞাঃ করেছি সুন্দরীজী। আমি আমার সব প্রশ্নের উত্তর ভাল ভাবেই পেয়ে গেছি। আমি সেদিন নিজেকে আরও ভাগ্যবান মনে করব যেদিন সামাজিক ভাবে আপনার ওপর আমার পুরো অধিকার আসবে আর আপনি যখন আমার হবেন। যদি সারা পৃথিবী আমাকে এ কাজে বাধা দেয় তা হলেও আমি কোন বাধা মানব না। আমাকে যত দুঃখকষ্টই সহ্য করতে হয় করব। মনে করব এতেই আমার জীবনের সার্থকতা।

আপনার বচন সিং।

সপ্তম চিঠি

কন্যা আশ্রম,
লাহোর।

প্রাণেশ্বর !

আমার জীবনধারা যতই আপনার দিকে এগিয়ে চলেছে ততই আমি যেন কোন অলৌকিক রাজ্যের কাছে গিয়ে পৌঁছচ্ছি। হৃদয়ের ভিতর থেকে ভালবাসার নতুন নতুন ঝরনা-ধারা যেন উপছিয়ে পড়ছে।

আমি এই বিষয়টি শঙ্কাতুর দৃষ্টিতে দেখছি এবং একে অন্যের কাছে জবাব চাইছি। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি যে, এখনও পর্যন্ত যাকে শঙ্কা বলে মনে হচ্ছে আসলে সেটি দুই হৃদয়ের মিলন-আকাঙ্ক্ষা— পৃথিবীতে এর গতি রোধ করতে পারে এমন কেউ নেই।

আমার জীবনের সর্বস্ব! আপনার উদারতা আমার আশাকে আরও সুখী আর সৌভাগ্যবান করেছে। আমি যে কত আনন্দ পেয়েছি তা আপনাকে কি করে বোঝাব? কথায় আছে, একটা সীমারেখায় পৌঁছনোর পর নিজের যৌবন, নিজের মহত্ত্ব থেকে প্রত্যেকটি জিনিস আবার নীচে নামতে আরম্ভ করে। কথায় আছে যদি কোন মানুষ হো-হো করে হাসে তা হলে পরে তার হাসি কান্নায় পরিণত হয়। তার চোখ বেয়ে জল পড়ে। যদি এই কথাগুলি সত্যি হয় এই ভেবেই আমার মন অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠছে। আমার মুখ থেকে ভাল করে কথাই বার হচ্ছে না। আমার সমস্ত দেহ জুড়ে কাঁপুনি শুরু হয়েছে। আমি দেখতে পাচ্ছি আমার আনন্দ ও আকাঙ্ক্ষার পূর্তি সীমানা ছাড়িয়ে গিয়েছে। আমার মনে এতটুকু জায়গা নেই যে তাকে সামলে রাখব। জল ভরতি কলসীতে আরও জল ঢাললে যেমন জল উপচে পড়ে তেমনি আমার আনন্দ এমনি করে উপচে পড়ছে।

আঃ! প্রিয়তম; এই অবস্থায় পৌঁছেও কী জানি কেন এক ছোট্ট চিন্তা আমার চারিপাশে এসে আমাকে ঘিরে ধরেছে আর আমি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। কখনও কখনও এই চিন্তা এত বেশি করে

চেপে ধরে যে ওই চিন্তার ভয়ংকর রূপ দেখে আমার মনের ভেতরের সুখ আর আনন্দের ভাণ্ডার ওই দুশ্চিন্তার নীচে চাপা পড়ে যায়। আমার চঞ্চল মন নানা রকমের চিন্তা করতে শুরু করে। —বলে, প্রভাতের ঠাণ্ডা বাতাস যখন দেখে যে বাগানের ফুলের কুঁড়িগুলো চোখ নীচু করে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে আর সুগন্ধ ছড়াচ্ছে তখন প্রেমের আনন্দে বিভোর হয়ে বাতাস নিজেকে ভুলে কুঁড়িগুলোর সঙ্গে খেলা শুরু করে দেয়। কুঁড়িগুলোর সঙ্গে বাতাস জড়াজড়ি আরম্ভ করে দেয়। এই প্রেমকল্লোলকে কুঁড়ির কোমল হৃদয় সহ্য করতে না পেরে খুশি আর উন্মাদনায় নিজেকে ফুটিয়ে ফেলে। তারপর ফোটার সঙ্গে সঙ্গে মাতাল হাওয়ার প্রেম তার কোমল পাপড়িগুলোকে ঝরিয়ে দেয়। ওখানেই তার জীবনের অবসান।

আমার প্রাণেশ্বর, এই কাল্পনিক চিন্তার হাত থেকে আমাকে বাঁচান। আমাকে আপনার ভিতরে এমন করে লুকিয়ে রাখুন যে এই দুশ্চিন্তা এসে আমাকে আর গ্রাস করতে না পারে। জানি না, চিঠিতে কী লিখব ভেবেছিলাম, আর কী লিখছি। মনে হচ্ছে যে লেখার মত আর কোন কথাই নেই। আবার আর-এক দিকে মনে হচ্ছে অনেক কিছু লেখার বাকী রয়ে গেছে। সারা জীবন ধরে যদি লিখি তা হলেও শেষ হবে না। যা-কিছু লিখি, লেখার আগে আপনার ভিতরে তার চমক দেখতে পাই। এই বলা কথা আর নতুন করে কী বলব।

প্রিয়তম! আপনি বিয়ের কথা বার বার কেন বলছেন? লোকে বলে বিয়েই এমন একটা জিনিস যা মানুষের জীবনকে সুখী আর অলৌকিক করে তুলতে পারে। যদি এ কথা সত্যি হয় তা হলে আমি এর থেকে দূরে থাকতে চাই। কারণ যে আনন্দ আর সুখ আমি আপনার ভালবাসায় পেয়েছি সেই সুখ থাকতে অন্য কোন সুখ পাবার ইচ্ছা তো দূরে থাক তা পাওয়ার কথা কামনাও করতে পারি না।

আমি আগেই বলেছি, আমার মনে আর কারও জায়গা নেই।

প্রিয়তম, আপনি যেভাবে নিজের জীবন কাটাবেন বলেছেন, তা আপনি একলা কখনই পারবেন না। একলা আপনার পক্ষে এক-পাও এগোন সম্ভব নয়। আপনার মন কত দৃঢ় আর উদার। যে সমাজের জন্য আপনার এই দুর্ভোগ তার প্রতি এখনও আপনার হৃদয়ে দয়া জেগে রয়েছে। আমার মনে হয় আপনি আগের জন্মে একজন তপস্বী ছিলেন। আপনি জানেন সমাজের প্রতি আমার কী মনোভাব। শুনুন, আমার মনের ভিতরে একটা বিষের মত কী যেন লুকিয়ে আছে। এই সমাজই আমার নির্দোষ হৃদয়েশ্বরের উপরে অনেক অত্যাচার করেছে। আমি এর প্রতিশোধ নিতে চাই। এই সমাজের দু-মুখো পাষণ্ড নেতাগুলোকে এমন শিক্ষা দিতে চাই যে পৃথিবী তা ভুলতে পারবে না। আমি ভেবেছিলাম আপনাকেও আমি এই প্রতিশোধের জন্য তৈরি করব।

কিন্তু আমার প্রিয়তম! আমার জীবন আর আপনার জীবন একেবারে এক হয়ে গেছে। এখন একে যেভাবে লাগাবেন সেই ভাবেই লাগবে। হ্যাঁ, আপনাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে সেই দুস্তর পথে আপনি একা যাবেন কিনা। আমাকে সাথী করে নিয়ে যাবেন, আমি আপনার পথের প্রতিবন্ধক হব না। আপনি কোন শঙ্কা করবেন না। হ্যাঁ, আমার শঙ্কাগুলোকে অমূলক ভাববেন না। একই সাথে এত খুশি আর কেউ হতে পারে না।

আপনার
সুন্দরী।

অষ্টম চিঠি

দীওয়ানপুর

সুন্দরীজী,

আজকে আপনাকে একটা দুঃখের ঘটনা শোনাচ্ছি। জানি না আপনি এই দুঃখ কি ভাবে সহ্য করবেন। আপনার কথা ভেবে আমারও দুঃখ লাগছে। লেখার সময় আমার হাত কাঁপছে। যদি এই দুঃসংবাদ আর কেউ আপনাকে দিত, ভাল হত কিন্তু বোধহয়

আমার কর্মের দোষে এই দুঃখের খবরটা আমাকেই জানাতে হচ্ছে। সুন্দরী, আপনাকে যে কি লিখি…আপনার বাবা, ওঃ সব সময় আপনার নাম করতে করতে আপনার ধর্মপিতা আপনাকে শেষ ভালবাসা পাঠিয়ে আপনাকে দেখার ইচ্ছে মনে নিয়ে এই সংসার থেকে বিদায় নিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে, এই মৃত্যু কী ভয়ানক ভাবেই না হয়েছে। সুন্দরী, আপনাকে আর কী বলব! বেশ কয়েক দিন ওঁর শরীর ভীষণ দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। উনি নিজের কুটীর থেকে বাইরে কমই বেরোতেন। রোজকার মত বিকেলবেলা আমি যখন ওঁকে রুটি তরকারি পৌঁছতে যাই, তখন উনি কাঁদছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করাতে উনি বললেন, সুন্দরীর সঙ্গে দেখা করার জন্য মনটা বড় ছটফট করছে। কি জানি এই দুনিয়ার অতিথিশালায় আর কতদিন আমার মেয়াদ রয়েছে। একবার মেয়েটাকে দেখলে মনে শান্তি পেতাম।

আমি বললাম, বাবাজী, এ আর এমন কী সমস্যা। আমি তাকে কাল সকালে নিজে গিয়ে নিয়ে আসব।

উনি আমাকে বারণ করলেন। বললেন, এতে ওর পড়ার ক্ষতি হবে। তা ছাড়া এখানে ওর অনেক বিপদ। গ্রামের বদমায়েশদের পাণ্ডা পালা সিং আমার পিছনে লেগেই আছে। ও বলছে, ওর সাথে সুন্দরীর বিয়ে দিতে। সে আমাকে অনেক লোভ দেখিয়েছে। আমি যখন তার কথা শুনলুম না, সে আমাকে চোখ রাঙিয়ে অনেক কিছু বলে গেল। সে আমাকে এই পর্যন্ত বলে গেল, যদি আমি তার কথা না শুনি তা হলে সে আমাকে তার লোকজন দিয়ে খুন করবে। সুন্দরী যখন আমার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে আসবে তখন সে তাকে জোর করে নিয়ে যাবে।

সুন্দরীজী, যখন আপনার বাবা আমাকে এই কথাগুলো বলছিলেন তখন ওঁর অবস্থা দেখে আমার সারা শরীর রাগে কাঁপছিল। আমি ওঁকে সাহস দিয়ে বললাম, আপনি এত ঘাবড়াচ্ছেন কেন? আমরা থাকতে কার সাহস, আপনার ও সুন্দরীর দিকে নজর দেয়?

তারপর আমি ওঁকে আমার ওখানে নিয়ে যাবার জন্যে অনেক

চেষ্টা করলাম, উনি শুনলেন না। বললেন, সরদারজী, আমার আর কী? আমার আর কি হবে। আমি তো বুড়ো দুর্বল। গাছের মত কবে যে উপড়ে পড়ি তার ঠিক নেই। আমি গুরুদেবের কাছে দুহাত জোড় করে প্রার্থনা করি, যতক্ষণ হাত পা চলে তুমি আমাকে নাও প্রভু। আমার শরীর একেবারে অচল হয়ে গেছে। সুন্দরীর জন্য আমার আগে বেশি চিন্তা ছিল। আপনার দয়ায় তা দূর হয়ে গেছে।

আমি বললাম, বাবা আমার সঙ্গে লাহোরে চলুন। সুন্দরীকে একবার দেখে আসবেন। এবার সে রাজী হয়ে গেল। পরের দিন যাওয়া স্থির হল।

সেদিন অর্ধেক রাত্রিতে আমি লোকেদের ভীষণ চিৎকার শুনতে পেলাম। আমার ঘুম ভেঙে গেল। কে যেন জোরে বলে উঠল, আগুন লেগে গেছে। আমি হরবড়িয়ে উঠে বাইরে বেরিয়ে পড়লাম। গলিতে গিয়ে শুনলাম, বাবা রোড়ুর কুটীরে আগুন লেগে গেছে। আমি চোখ কান বুঁজে সেইদিকে দৌড় লাগালাম।

গিয়ে দেখলাম, ওখানে অনেক লোক জড়ো হয়েছে। লোকেরা তোমার বাবার আগুনে ঝল্‌সে যাওয়া দেহটা একদিকে হঠিয়ে রেখেছে। আগুনে পুড়ে কুটীরটা একেবারে ছাই হয়ে গেছে। অনেক জল ঢালার পরও কুটীরের আধজ্বলা কাঠগুলোকে নেভানো গেল না। আমি ভিড়ের মধ্যে দিয়ে কোন রকমে আপনার বাবার কাছে গেলাম।

ওঃ সুন্দরীজী, সে যে কি অবস্থা আমি মুখ দিয়ে বলতে পারব না। সে-সব কথা বলে আপনার দুঃখের আগুনে আর ঘৃতাহুতি দিতে চাই না। সে দৃশ্য দেখার আমার সাহস ছিল না। আমি অনেক সাহস সঞ্চয় করে তাঁর গায়ে হাত দিলাম। থানার বড় বাবু আর তিনজন সিপাই ওখানে উপস্থিত ছিল। সকলে ভেবেছিল, আপনার বাবা হয়তো মারা গেছেন— ওঁর দেহে প্রাণ নেই। কিন্তু কিছুক্ষণ পর ওনার শরীর নড়ে উঠল। আমি ওনাকে কয়েকবার ডাকলাম। উনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, সরদারজী!

আমি বললাম হ্যাঁ। আমি ওঁকে আরও কিছু জিজ্ঞাসা করতে গেলাম। থানার বড়বাবু অবস্থা বুঝে, তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন। মনে হল, ওঁর একটু হুঁশ এসেছে। থানার বড়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, বাবা শুনুন···কে আগুন লাগাল ?

আপনার বাবা জবাব না দিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন। মনে হল উনি খুনীর নাম বলে, খুনীকে বদনাম করতে ইচ্ছুক নন। এই ঘটনাকে ঈশ্বরের অভিপ্রায় মনে করে সন্তোষ প্রকাশ করলেন। থানার বড়বাবুর কথার কোন জবাব দিলেন না। ইশারা করার শক্তিও তার আর ছিল না। উনি জনতার দিকে তাকালেন। তারপর ওঁর দৃষ্টি আমার উপর স্থির হয়ে গেল। আমি এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, বাবাজী, আপনি কিছু বলবেন ?

বলার চেষ্টা করেও উনি কিছু বলতে পারলেন না। ওঁর চোখে জল এসে গেল। আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। উনি আমাকে ওঁর কাছে আসার জন্য ইশারা করলেন। ওনার মুখের কাছে কান নিয়ে গিয়ে, শুনতে পেলাম, উনি বলছেন সু···ন্দ···রী। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি সুন্দরীর সাথে দেখা করবেন ?

উনি ধীরে ধীরে হাত ঘোরালেন, যেমন করে ডমরুবাদক তার হাত ঘোরায়। আমি বুঝতে পারলাম উনি কী বলতে চাইছেন। বোধ হয় বোঝাতে চাইলেন, সব খেলা একেবারে শেষ, আমার আর সুন্দরীর সাথে দেখা হবে না। আমি ওঁর মনের ভাব বুঝতে পেরে আবার জিজ্ঞেস করলাম, সুন্দরীকে কিছু বলতে হবে ? উনি কোন কথাই বললেন না। উনি ছল ছল চোখে এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। মনে হল উনি আমার কাছ থেকে কিছুর একটা জবাব চাইছেন। আমি বলে উঠলাম, বাবা আপনি সুন্দরীর জন্য চিন্তা করবেন না। আমি ওকে বিয়ে করব।

আমার এই কথা বলাতেই ওঁর দৃষ্টিতে যেন চমক দেখা দিল। ওনার ঠোঁটের ধারে আমি স্পষ্ট হাসি দেখতে পেলাম। উনি বোধ হয় কৃতজ্ঞতায় ধন্যবাদ দেবার জন্য, হাত দুটো জোড় করার চেষ্টা করলেন। উনি অনেক চেষ্টা করেও নিজের হাত দুটো এক করতে

পারলেন না। কিছুক্ষণের মধ্যে ওঁর হাত দুটো শিথিল হয়ে, ওঁর বুকে পড়ে গেল। ওঁর কাঁধটাও ঝুঁকে গেল। মনে হল, আমার মুখে ওই কথাগুলো শোনার জন্য ওঁর প্রাণ যেন কোনরকমে বেঁচে ছিল। সুন্দরী, উনি তারপর চিরনিদ্রায় ডুবে গেলেন।

সন্দেহ হওয়ায় পুলিশ পালা সিং আর ওর চার বন্ধু সওয়া সিং, বীর সিংকে ধরে নিয়ে গেল।

ওফ্! কী ভয়ানক ঘটনা। এখনও ওঁর সেই চেহারাটা যেন আমার চোখের সামনে ভাসছে। আমার মা এই ঘটনার কথা শুনে কেঁদেই চলেছেন। আমার মনে হয়, উনি মনে মনে ভীষণ দুঃখ পেয়েছেন।

সুন্দরীজী, ঈশ্বরের ইচ্ছা কী বিচিত্র। কখনও প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছা আমার মনের ভেতর স্থান পায় না। প্রতিশোধ নেওয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা। পৃথিবীর কোন শক্তি আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে যেন বাধা সৃষ্টি করতে না পারে। এখানেই আমাদের কৃতিত্ব।

আজকের চিঠি পড়ে আপনার কী অবস্থা হবে আমি বুঝতে পারছি। সেইজন্য আর বেশি কিছু লিখলাম না। আপনার কাছে আমার নিবেদন, আপনি বেশি মন খারাপ করবেন না। আপনি নিজের মনোবল ও সাহস দিয়ে এই দুঃখের মোকাবিলা করবেন।

হ্যাঁ, এই চিঠি লেখার সময় খবর পেলাম পালা সিং ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের পুলিশ মামুলি একটা জামিন দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। এর কারণ, পয়সার খেলা তো আছেই, তারপরে আবার গ্রামের লোকেরাও কম উদার নয়। গ্রামের লোকেরা পালা সিং ও তার বন্ধুদের বাঁচাবার জন্য ভীষণ ভাবে চেষ্টা করছে। এই ব্যাপারটা আমি আগের থেকেই আঁচ করছিলাম।

আপনার বচন সিং

নবম পত্র

প্রাণনাথ !

আপনার চিঠি পেলাম। ওঃ! বাবার মৃত্যুর খবর শুনে পর্যন্ত আমার মনের অবস্থা যে কী হয়েছে তা আমি ঠিক আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। সবচেয়ে বড় আফসোস, বাবার সঙ্গে শেষ সময় দেখা হল না। বাবা যদি একবার আদর করে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিত তা হলে আমি শেষবারের মত আর-একবার পিতৃস্নেহের আস্বাদ পেতাম। কিন্তু তা আমার ভাগ্যে নেই।

আমার হৃদয় জুড়ে প্রতি মুহূর্তে উত্তাল ঢেউ উঠছে। ছিন্নভিন্ন আমার হৃদয় যেন অন্তরের ভেতরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। কিন্তু আপনার কথা মনে হতেই আমি তলিয়ে যেতে যেতেও আশার আলো দেখতে পাচ্ছি।

হায়, ভাগ্যহত এক গরিব মানুষ। যে কিনা কোনদিন কারও সাতে-পাঁচে থাকে নি, যে রাস্তার একটা কুটোকেও ভয় পেত— শয়তানেরা তাকে বাঁচতে দিল না। এই খুনী আসামীদের শাস্তি থেকে বাঁচানোর জন্য লোকেরা আদাজল খেয়ে লেগেছে। এদের নিশ্চয় বড় দুশ্চিন্তা সমাজে যেন খুনী আর শয়তানদের ঘাটতি না পড়ে।

ওঃ, প্রভু! আপনি এই সমাজকেই শোধরাবেন বলে এত উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছেন। এই সমাজের সংস্কারের জন্যই চেষ্টা করে যাচ্ছেন? আপনি কি এত সব দেখবার পরও এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে পারলেন না যে, যাদের মন পাপে ভরতি তাদের আর উন্নতি সম্ভব নয়? আপনি তাদেরই শোধরাবার স্বপ্ন দেখছেন— যাদের মন হিংসার আগুনে জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে গেছে। অহংকারে যাদের মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। যাদের দুই বাহু সাদা রক্তের মধ্যে মরে পড়ে রয়েছে। আপনি এই পাথুরে মাটিতে সংস্কারের বীজ বুনে তাতে ফসল তোলার আশা করছেন?

না, না, আমার প্রাণেশ্বর, এই চিন্তা আপনি মন থেকে ঝেড়ে ফেলুন। যে পাহাড়ে মাথা ঠুকে আপনি পাহারটাকে ভাঙতে

চাইছেন, তা এই ভাবে কখনও ভাঙা যাবে না। বরং আপনিই পরে নিরাশ হবেন। এ পাহাড়কে ভাঙার আগে, পাহাড়ের ভিতর থেকে শক্ত জিনিসগুলো বার করে দেওয়া দরকার। তা হলেই তা ভাঙা সম্ভব হবে। সমাজের এই নীচ প্রকৃতির লোকগুলোর বুক চিরে সাদা রক্ত বার করে মাটিতে ফেলে দেওয়া উচিত। এই রক্তের এক বিন্দুও যতদিন থাকবে, ততদিন— আমাদের অনাগত ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীর ওপর এই রক্ত তার কালো ছায়া মেলে ধরবে। কেউ তাকে রোধ করতে পারবে না।

ছিঃ ছিঃ, আমি রাগের বশে কি সব আজেবাজে লিখে চলেছি। প্রিয়তম! আমার কসুর মাফ করবেন। এখন আমার মাথার ঠিক নেই। আমার ইচ্ছা করে আমার হৃদয়ের ভাবনাগুলোকে এক এক ক'রে আপনার কাছে মেলে ধরি। কিন্তু নির্বুদ্ধিতার জন্যই আমি এ-সব আজেবাজে কথা বলছি।

এইজন্য আমি আমার মন থেকে আমার এই অবিরত চিন্তাস্রোতকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছি। একদম ঝেড়ে ফেলা সম্ভব না হলেও অন্তত খানিকটা এই চিন্তা বাস্তবে পরিণত করার চেষ্টা করব। কিন্তু আপনার কথা ভেবে প্রতিশোধ নেবার যে ইচ্ছা আমার মনে ছিল তা দূর করতে আমি বাধ্য হচ্ছি।

আমি প্রার্থনা করছি, গুরুজী যেন আপনার মনের বাসনা পূর্ণ করেন। আমাকেও ঈশ্বর যেন বল ও সাহস দেন। যদি কখনও আমার মনে হিংসার চিন্তা আসে আমি যেন সাপের মাথায় পা দেওয়ার মত সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে নিবৃত্ত করি। আমি যেন আপনার আদর্শমতই চলি।

আমার জীবনসর্বস্ব! আমি আমার চঞ্চল মনকে ঠিক নিজের বশে রাখতে পারি নি। এই মন আমাকে ভুল পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। কখনও কখনও আমার মনে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে ওঠে। আমি তখন ঠিক নিজের মধ্যে থাকি না। আপনার কাছে আমার নিবেদন, আপনি যেন আমাকে মনের মত করে তৈরি করে নেন। আর আমাকে সব সময় আগলে আগলে রাখেন।

আজকে আমার মন ভীষণ আনমনা হয়ে যাচ্ছে। আর বেশি কিছু লিখব না। আমি জানি আপনার হৃদয় কী বিশাল। আপনার চিন্তাধারা কত মহান। আপনি আমার সব ভুল ক্ষমা করতে পারেন। আপনি এখানে এসে আমাকে নিয়ে যান। আমার ধর্মপিতার চিতাভস্ম দেখার জন্য আমার প্রাণ আকুল হয়ে উঠছে। তা ছাড়া আমার পড়াশোনাও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

আপনার
সুন্দরী।

দশম চিঠি

সুন্দরীজী,

আপনি এত অশান্ত হয়ে পড়েছেন? এত রেগে গেছেন কেন? যদিও আপনি যা লিখেছেন তা সত্যি যুক্তিপূর্ণ। যে যুক্তির সামনে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু আপনি যে পাহাড়ের উদাহরণ দিয়েছেন, তা শুনে আমার হাসি পাচ্ছে। এখানেই আপনি একেবারে বসে গেলেন। আপনিই লিখেছেন এ পাহাড়ে মাথা ঠুকলে নয়, জোরে ঘা দিলে তবে ভাঙবে। এইবার আপনার প্রোগ্রাম তো খালি খালি মাথা ঠোকা, খুনের বদলে খুন করে সমাজকে শোধরাবার আশা করা পাহাড়ে মাথা ঠোকার মতই। আসল সত্য হল এর ঠিক উলটোটা। খাঁটি আদর্শের প্রচার আর উচ্চ চিন্তাধারা দিয়েই সমাজে পরিবর্তন আনা যেতে পারে। ওই শক্ত পাহাড়টা তবেই ভাঙবে।

এই সঙ্গে সঙ্গে আপনার উদারতার জন্য সত্যিই আমি ঋণী। জেনে আরও আনন্দিত হলাম, আপনি আমার আদর্শ অনুসরণ করতে ভীষণভাবে আগ্রহী। আমি আশা করছি, আপনি যদি আমার পথের পথিক হন তা হলে আপনার আজকের চিন্তাধারা দিনকে রাত বলে ভুল করার মতই ভুল বলে মনে হবে।

আমি দেখতে পাচ্ছি, আমাদের সমাজের রক্ত প্রতিদিন সাদা হয়ে যাচ্ছে। আপনি সমাজের পরিবর্তনের জন্য যে পথ গ্রহণ করতে

বলেছেন, তার পরিণাম আরও ভয়ানক। এ যেন পাগলা কুকুরে কামড়ানো কোন রোগীকে স্নান করিয়ে চাঙ্গা করা।

সুন্দরীজী, আমাদের আদর্শ প্রচারের মধ্য দিয়ে সমাজের সাদা রক্তের লোকদের এমন ওষুধ দিতে হবে যাতে তাদের রক্ত থেকে সাদা (নির্জীব) জীবাণু দূর হয়ে গিয়ে তার জায়গায় লাল (সজীব) জীবাণু জন্ম নেয়।

এই কাজের জন্য এবার আমি কোমর বেঁধে লেগে পড়ব ঠিক করেছি। এবার তো আমরা এক আর একে মিলে এগারো হয়ে যাব।

আমি আর চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই আপনাকে নিয়ে আসার জন্য যাব। আমি মাকে রাজী করিয়েছি। মা আমার কাজে কোন বাধা সৃষ্টি করবেন না। আর আপনার কাজের ব্যাপারেও উনি কিছু বলবেন না। যদিও মায়ের সামনে একটা প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছে, উনি বেঁচে থাকা পর্যন্ত আমি দূরে কোথাও যাব না। আমার মনে হয়, আপনি আমার এই কাজে এবার আত্মনিয়োগ করবেন।

এইবার আমার লক্ষ্য কী হবে—আমরা দুজন একসঙ্গে বসে তা ঠিক করব। এখন বাড়িতেই আমাদের একটা ছোট কাজ মিলেছে। এ দিয়ে আমরা আমাদের নতুন জীবনের শুভ মহরৎ শুরু করব। কিছুদিন পরে আমাদের গ্রামের সাহুকার বালা রলারামের মেয়ের বিয়ে। আমি শুনেছি এই বিয়েতে বাঈনাচ মুজরা, ভাণ্ডীর খেলা, মদ্যপান আরও অনেক তামাশা হবে। হাজার হাজার টাকা জলের মত খরচ হবে।

সুন্দরীজী, কী লজ্জার কথা, যখন আমাদের বড় বড় বুড়ো লোকেরা বেশ্যাদের মুশেরা শুনবে আর নিজেদের বোন-মেয়েরাও জানালা দিয়ে ওই-সব দেখবে ; এই লজ্জা এক গণ্ডূষ জলে ডুবে মরলেও যাবে না। আমার মনে হচ্ছে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওদের এই নোংরা কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে পারা যাবে। আর কী লিখব, দিন-পাঁচেকের মধ্যে আপনার কাছে যাচ্ছি।

আপনার বচন সিং

পুনঃ— হ্যাঁ, একটা কথা মনে পড়ে গেল। আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকাল পাঞ্জাবী পত্রিকাগুলোতে আপনার গল্প প্রকাশিত হয়। আপনি তো কামাল ক'রে দিলেন। আমি সেদিন শহরে গিয়ে একটি পত্রিকায় আপনার লেখা দেখলাম। দেখে আশ্চর্য হয়েছি। সমাজের কঠোরতা বর্ণনা করতে, আপনি তো ভীষণ দক্ষ! আমার মন বলছে, আমার সুন্দরী অতি অবশ্য একদিন বড় দরের লেখিকা হবে।

কিন্তু সুন্দরী, আপনার লেখার সাফল্যের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানানোর সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কথা বলতে চাই। আপনার রচনায় কোমলতা আর সহনশীলতা আর একটু বেশি থাকা দরকার। আমি মানছি সমাজের নিগৃহীত মানুষের দাবিই নিপীড়িত লেখকের কলম দিয়ে বার হয়ে থাকে। কিন্তু আমি আপনার কাছ থেকে এমন রচনা আশা করি যাতে হিংসা বা নির্মমতার যেন নামগন্ধ না থাকে। রক্ত দিয়ে কখনই রক্ত ধোওয়া যায় না। আপনি কি ভবিষ্যতে এই ধরনের লেখার চেষ্টা করবেন?

॥ ২৩ ॥

সুন্দরী দীওয়ানপুরে এসে সর্বপ্রথম তার পিতার ভস্মীভূত স্মৃতির প্রতি তার প্রণাম নিবেদন করল। সেখানকার ধুলো নিয়ে সে নিজের মাথায় ঠেকাল। পোড়া কাঠের কিছু ছাই তখনও সেখানে পড়েছিল। সুন্দরীর কাছে এ ছাই সাধারণ ছাই নয়— এ তো তার অতীতের গোটা জীবনেরই ছবি। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে লাহোর যাওয়া পর্যন্ত এক এক করে সমস্ত দৃশ্য তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। বাবার ভালবাসার কথা তার বার বার মনে পড়তে লাগল। এই কথা মনে পড়াতে দুঃখে তার মন ভরে যাচ্ছিল। অনেকক্ষণ ধরে ওখানে বসে এ-সব কথা ভেবে ভেবে চোখের জল ফেলতে লাগল। বচন সিং অনেক করে বলাতে তবে সে সেই জায়গা ছেড়ে উঠল।

বচন সিং আগে থেকেই সুন্দরীর থাকার ব্যবস্থা করে রেখেছিল। সুন্দরীকে নিজের বাড়ি নিয়ে গিয়ে, মায়ের মনে সে দুঃখ দিতে চায় নি।

কিছুদিন হল পাশের গ্রামের কিছু লোক গাঁয়ে একটি মেয়েদের স্কুল খুলেছে। ওই গ্রামের কিছু লোক বচন সিংকে ভীষণ ভালবাসত। চার-পাঁচ জনের চেষ্টায় সেখানে এক নব-জাগরণ আসে। এইজন্য এখানে বচন সিং-এর খুব খাতির। নিজের আদর্শ প্রচারের কেন্দ্র স্থাপনের জন্য এই গ্রামটাই বচন সিং-এর বিশেষ পছন্দ হল।

সুন্দরীকে ওই স্কুলের অধ্যাপিকা নিযুক্ত করা হল। নিজের পছন্দ মাফিক পরিবেশ পেয়ে বচন সিং-এর দুশ্চিন্তা অনেকটা দূর হয়ে গেল। তা ছাড়া দীওয়ানপুর থেকে রবানী গ্রাম খুব একটা দূরে নয়। মাত্র পৌনে এক মাইলের মত রাস্তা।

লালা রলারামের বাড়িতে বরযাত্রী আসার কথা ছিল। বচন সিং ভালভাবেই জানত, এই বিয়েবাড়িতে মস্ত হৈ-হুল্লোড় হবে। এই হুল্লোড়বাজি কী করে বন্ধ করা যায়, তার জন্য বচন সিং কদিন ধরে রাতদিন এদিক-ওদিক দৌড়াদৌড়ি করছিল। কিন্তু সে এ ব্যাপারে পুরো সফল হতে পারে নি। একে তো সারা গ্রামের লোক বচন সিং-এর বিরুদ্ধে। তার উপর বিয়েবাড়িতে আমন্ত্রিত গ্রামবাসীরা এই অপেক্ষায় ছিল, কখন নাচ-গানের আসর শুরু হবে আর তারা একটু আনন্দ ফুর্তি করবে। লালা রলারাম আবার সারা গ্রামের লোককে নেমন্তন্ন করেছিল। গ্রামের লোকেদের কানে এসেছিল যে দিল্লি থেকে একজন মস্ত বড় বাঈজী আসছে। এ খবর পেয়ে তারা তো খুশিতে ডগমগ। ওরা উদ্বিগ্ন হয়ে দিন গুনছিল কবে নাচের দিনটি আসবে।

এদিকে রবানী গ্রামে পৌঁছে সুন্দরী তার বাসায় জিনিসপত্র ঠিক ভাবে গুছিয়ে রাখছিল। বচন সিং ঠিক সেই সময়, সারাদিন দৌড়া-দৌড়ির পর ওখানে পৌঁছাল। বাইরে থেকে তার গলার আওয়াজ শুনে সুন্দরী নিজের কাজ ছেড়ে বাইরে এল। বলল, কী ব্যাপার! দিনভোর তো আপনার দেখাই পেলাম না। কোথায় ছিলেন?

বচন সিং সস্নেহে বলল, কী যে বলি সুন্দরী, আমি দিনভোর দৌড়াদৌড়ি করে একেবারে ক্লান্ত হয়ে গেছি।

এই বলে সে ভিতরে ঢুকে একটা চারপাই-এর ওপর বসে পড়ল। সুন্দরী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কেন?

বচন সিং সার্টের বোতাম খুলে, রুমাল দিয়ে ঘাম পুঁছে বলল, আপনাকে বলেছিলাম না, শুক্রবার দিন রলারামের বাড়িতে বরযাত্রী আসবে।

—হ্যাঁ, বলেছিলেন।

—আজকে বৃহস্পতিবার।

—তা হলে—

—কালকে বরযাত্রী আসবে।

—তা হলে কী করতে হবে বলুন না।

—এবার আমাদের আসল কাজে লেগে পড়তে হবে।

সুন্দরী হেসে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, তা হলে দেরি কেন?

—আমার মনে হচ্ছে আমি এ কাজে সফল হব না।

—কেন?

—যদি একলা রলারামকে রাজী করানোর ব্যাপার হত, তা হলে খুব একটা মুশকিল ছিল না। এদিকে তো ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে যার বিয়ে তাঁর হুঁশ নেই, পাড়া-পড়শীর ঘুম নেই। সারা গ্রামের লোক সেই বেশ্যাটার অপেক্ষায় দিন গুনছে।

—তা হলে কি আমাদের নতুন ব্যাবসা প্রথম থেকেই লোকসান দিয়ে শুরু হবে?

—লোকসানের কথা নয়— পুরো ব্যাবসাটাই বরবাদ।

—তা হলে কী ঠিক করলেন?

—ভাবছি, রলারামের কাছে একবার যাই। যদি কাজ হয়ে যায়…।

—এখন কোথা থেকে আসছেন?

—বেশ কয়েক জায়গা থেকে ধাক্কা খেয়ে— একটা জায়গা থেকে তো নয়, অনেক জায়গায় গিয়েছিলাম।

—তারা কী জবাব দিল ?

—খানিকটা টালবাহানা করল।

—আপনি রলারামের সঙ্গে একেবারে কেন দেখা করে এলেন না ? আবার আপনাকে মাইল খানেক যেতে হবে।

—শুধু আপনার সঙ্গে দেখা করতেই আসি নি, ভাবছি এ গ্রামের থেকে কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত লোককে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

কিছুক্ষণ আরও কথা বলার পর বচন সিং চলে গেল। সুন্দরী কোন্ গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে বচন সিং দীওয়ানপুর চলে গেল। সেখানে সে সোজা রলারামের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছল। রবানী গ্রামের কোন লোক তার সঙ্গে যাবার জন্য রাজি হয় নি। বেশ ধূমধাম করে বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। দর্জিরা একদিকে বসে দানের কাপড় সেলাই করছে। অন্যদিকে গ্রামের মোড়ল 'পঞ্চ হুকুমের' অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। শাহের ছেলে দীনানাথ তাকে কাজ বোঝাচ্ছে। ভিতর থেকে মিষ্টির গন্ধ আসছে। ঢোলের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেপুলেরা হৈ-হুল্লোড় শুরু করে দিয়েছিল।

গ্রামের মুরুব্বীদের সাথে ওখানে পালা সিং আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা বসে ছিল। ওদের দেখে বচন সিং-এর রক্ত গরম হয়ে গেল। কিন্তু সে নিজেকে সামলে নিল। ওকে ভিতরে আসতে দেখে লোকেরা নিজেদের মধ্যে ইশারা করতে লাগল।

বচন সিং সকলকে 'সৎশ্রী আকাল' বলে নমস্কার জানিয়ে এক পাশে গিয়ে বসে পড়ল। সকলেই কাজে ভীষণ ব্যস্ত। কারও মাথা তুলবার সময় নেই। বচন সিং মনে মনে খুবই অস্বস্তি অনুভব করল। সে যে-কাজে এসেছে তা হওয়া তো দূরে থাক্ এখানে কারুর সঙ্গে কথা বলারই ফুরসত পাচ্ছে না।

সে অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করল। ঠিক এই সময় দেখল, জুতোর খট্‌খট্ আওয়াজ করে ভাইজী ভিতরে আসছেন। বচন সিং যদিও ভাইজীর সব কীর্তিকলাপ জানত। কিন্তু সব জেনেও, সে মনে

করল, ভাইজী নিশ্চয়ই তার এই কাজে সাহায্য করবে।

সকলে ভক্তিভরে ভাইজীকে 'সৎশ্রী আকাল' বলে প্রণাম করল আর বলতে লাগল, এখানে বসুন, এখানে বসুন। রলারাম এখন একটু সুযোগ পেল। সে এসে ভাইজীর সঙ্গে কথা বলতে লাগল। বচন সিং সুযোগ পেয়ে সাহসে বুক বেঁধে বলল, শাহজী।

রলারাম তীক্ষ্ণ নজরে বচন সিং-এর দিকে তাকাল। বলল, বলুন বচন সিং, কি ব্যাপার? সে সম্ভবত পালা সি-এর কাছ থেকে বচন সম্পর্কে কিছু শুনে থাকবে। ওর তীক্ষ্ণ নজরে বচন সিং বেশ একটু বিব্রত বোধ করল। ডুবন্ত মানুষ যেমন একটা কুটো ধরে ভেসে উঠতে চায়, তেমনি বচন সিং যেন তার অবাধ্য হৃদয়কে দূরে সরিয়ে রেখে বলল, আমি আপনার কাছে একটি আবেদন নিয়ে এসেছি।

—বলুন!

—আপনি জানেন, এ ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত কোন লাভ নেই। এটি সারা গ্রামের লাভ-লোকসানের ব্যাপার। আর কিছু না হোক, এটা তো হতে পারে গ্রামে আপনি বেশ্যা আমদানি করবেন না। আমাদের মা-বোনেদেরই এতে ক্ষতি হবে।

রলারামের চোখমুখ রাগে লাল হয়ে গেল। সে জোর গলায় বলল, বচন সিংজী, আমি আপনাকে আগেই বলেছিলাম আপনি খামাখা আমাদের শুভ কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না। আর তা ছাড়া, যে কাজে আমার কোন হাত নেই, যা আমার কোন ব্যাপারই নয়, সে কাজ আমি কি করে বন্ধ করতে পারি? আপনি কি জানেন, বেহাই-এর ভালবাসা সরু সুতোর মত। মনের মধ্যে একটু চিড় ধরে গেলে এই নিয়ে সারা জীবন ধরে মন কষাকষি চলবে। ওই যে কথায় বলে না, পাকা দেখার বন্ধন ওই বিয়ে পর্যন্ত আর বিয়ের বন্ধন সারা জীবন।

রলারামের কথার মধ্যেই অন্য একজন বলে উঠল, এটা কি একটা কথা হল? নাচমুজরো তো আমীর বাদশারাই করে। বচন সিং, বাবা, শুভ কাজে বিঘ্ন ঘটিয়ো না। শাহজীর তো ভাগ্যে ওই একটিই মেয়ে। তা এর সুখ দেখবে না তো আর কার সুখ দেখবে। ঠিক

বলছি কিনা ? কী ভাইজী (ভাইজীকে)।

ভাইজী এতক্ষণ এক মনে বসে বসে দাঁত দিয়ে নখ কাটছিলেন। তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন, যা বলেছেন মহারাজ, একেবারে খাঁটি কথা ! 'আন কর কর কে' এমন দিন কি রোজ রোজ আসে।

বচন সিং একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, ভাইসাহেবজী, গুরুমতের কি এটাই বিধান যে, আপনাদের মত মহৎ ব্যক্তিরা আসরে বসে বসে মদ আর বেশ্যার মাহাত্ম্য প্রচার করবেন ? আপনি গুরুদ্বারের গ্রন্থী। আপনার মহিমা এভাবে কলঙ্কিত করা আপনার কিছুতেই শোভা পায় না।

ভাইজী একটু অবাক হয়ে গেল। কিন্তু পালা সিং আর থাকতে পারল না। সে বলল ; গুরুমতে তো এ কথা লেখা নেই যে, যাদের খেতে দেবার কেউ নেই তাদের মুখ থেকে রুটির টুকরো ছিনিয়ে নাও। এরা তো আর ফোকটে পয়সা নিয়ে যায় না। ওরা গান গেয়ে সব লোকের মনোরঞ্জন করে তবে পয়সা নেয়। বাকী রইল মদ। তা এর মধ্যে কী খারাপ জিনিস আছে বলুন তো ? কীকর গাছের ছাল আর গুড় এই দিয়েই তো মদ তৈরি।

বচন সিং পালা সিং-এর কথার কোন জবাব দিল না। ও আর কী জবাব দেবে ? ওর কথা বললেও বিপদ না বললেও বিপদ। এদিকে পালা সিং-এর কাছ থেকে সমর্থন পেয়ে ভাইজীর মনে সাহস এল। তিনি কোমরে পাজামার দড়ির দাগ চুলকোতে চুলকোতে বললেন, আরে মদ তো একটা ওষুধ···আন কর কর কে। কিন্তু বেশি খেলে খারাপ···আন কর কর কে।

বচন সিং-এর তরুণ রক্ত গরম হয়ে উঠল। কিন্তু ও ভাবল, এদের বলে কোন লাভ নেই। কিন্তু ভাইজীর কথার জবাব না দিয়ে সে থাকতে পারল না। সে তার দিকে তাকিয়ে বলল, ঠিক আছে। মদ খারাপ হবে কেন খুব ভাল জিনিস। কিন্তু এই প্রবাদটির মানে কি বলুন তো ? 'ঝুটা মদ মুল না পীচই জেকা পার বসায়ে' ?

খানিকটা ভেবে নিয়ে ভাইজী কানের বীরবলী বালা ঘোরাতে

ঘোরাতে বললেন, মহারাজ, এর অর্থ তো এই, আন কর কর কে, ভাই, যতক্ষণ নিজের ওজর-আপত্তি খাটে ততক্ষণ মদ খেয়ো না, কিন্তু যেখানে মানুষের ওজর-আপত্তি খাটবে না সেখানে আর কী করা যাবে ?

রাগের মধ্যেও বচন সিং না হেসে থাকতে পারল না। ওখানে উপস্থিত সকলেই নিজের নিজের বক্তব্যের পক্ষে এই যুক্তি খাড়া করতে লাগল যে কোন কাজই খারাপ নয়।

বচন সিংও নিজের বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু ও এই ভেবে চুপ করে গেল যে, এখানে ওর কোন জোরই খাটবে না।

সে ভাবল, জল মন্থন করে তো আর মাখন উঠবে না। তার চেয়ে চুপ করে থাকাই ভাল, এই ভেবে সে আস্তে আস্তে ওখান থেকে উঠে চলে গেল। বচন সিং বেরিয়ে গেলে লোকেরা ওর বাপান্ত করতে লাগল।

এই সময় পালা সিং তার এক সঙ্গীর কানে কানে বলল, বীরু, দেখ নি গাধাটার বুদ্ধি ?

—বুদ্ধির কথা ছাড়। ওটা হল সেয়ানা পাগল।

সব জেনেশুনে অমন করছে। আমরা যাই করতে যাই-না কেন, ও ঠিক বাগড়া দেবে। নির্লজ্জের মত এত কাণ্ড করেও দেখ একটুও নরম হয় নি।

—আরে ভায়া, ও কি আর এমনিতে নরম হবার লোক ! বেঁকা তাকুয়া জুতো মারলে তবে সিধে হয়।

—আমার মত হল, এর এই নিত্য নতুন ঝঞ্ঝাট···

পালা সিং আঙুল দিয়ে ইশারা করে বলল, চুপ ! চুপ ! তুই শুধু দেখে যা।

আমার দান যখন আসবে তখন দেখবি, ওর সেদিন যদি কোন অস্তিত্ব থাকে তা হলে আমার গায়ে থুথু দিস। যতক্ষণ পর্যন্ত না এই ঝঞ্ঝাট সাফ না হচ্ছে ততদিন কি আর ওই ঢলানী মেয়েমানুষটা কাবু হবে ?

॥ ২৪ ॥

সন্ধ্যাবেলা। বরযাত্রী এবং সেই সঙ্গে দিল্লীর নাম করা বাইজী মিস অনবরজান এসেছে খবর পেয়ে গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা পিল পিল করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। যাবে না যাবে না করেও আশেপাশের কয়েকখানি গ্রাম একেবারে খালি হয়ে গেল।

লালা রলারামের বাড়ি বরযাত্রী আসা একটা হেঁজিপেঁজি ব্যাপার নয়। তার ওপর, যিনি বরযাত্রীদের নিয়ে এসেছেন, তিনি নিজের এলাকার এক মস্ত বড় সাহুকার[১]।

বিকেল পাঁচটার সময় বরযাত্রীরা গাড়ি থেকে নামল আর খুব জাঁকজমক করে গ্রামে এসে পৌঁছল। অনবরজানকে যে দেখল সে তার প্রেমে পড়ে গেল। সবাই তখন একেবারে পুরো মজনু। অনবরজানের বয়স বড় জোর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি। কিন্তু সুরুচিপূর্ণ প্রসাধনের ফলে ওর বয়স আরও কম দেখায়। ওর সুঠাম বরতনু, গোলাপী পাউডার রাঙানো চেহারা, সুরমা পরা চোখ, লাল ঠোঁট, লম্বা চুল,— যেন সকলের মনকে খুন করার ঠিকা নেবার জন্যই তৈরি হয়েছে।

বরযাত্রীরা গ্রামের বাইরে এক বাগানবাড়িতে গিয়ে উঠল। লোকেরা সব-কিছু ভুলে মুজরা দেখবার জন্য এতখানি উতলা হয়ে উঠেছে যে যে-কোন বরযাত্রী দেখলেই ওরা তাদের গিয়ে ধরে পড়ে বলছে, 'নাচ এখনই শুরু করে দাও।' বরযাত্রীদের আগ্রহও বড় কম নয়। সবাই গিয়ে বরের ভাইকে বলেকয়ে রাজি করিয়ে ফেলল। ওই বাগানেই মুজরার ব্যবস্থা হল।

তৈরি হল এক খোলা আসর। নীচে সতরঞ্জি বিছানো। তার মাঝখানে একটি কার্পেট বিছিয়ে দেওয়া হল। বাজনাদাররা সেখানে বসল।

প্রথম সারিতে বসল বর, তার বড় ভাই, আর তার প্রধান পরামর্শ-দাতা এক বৃদ্ধ পণ্ডিতজী। তাঁদের পাশে আট-দশ জন গ্রামের বিশিষ্ট

১ বেনিয়া।

ব্যক্তি। বাকী বরযাত্রীরা নিজেদের মর্যাদা ও শ্রেণী অনুসারে নিজের নিজের জায়গায় বসে পড়লেন। বরযাত্রীদের বসার জায়গা বেশি করে সাজানো আর কন্যাযাত্রীদের বসার জায়গায় সাজগোজ একটু কম। এই পার্থক্যটি এমন সূক্ষ্মভাবে করা হয়েছিল যে বরযাত্রী আর কন্যাযাত্রীদের আলাদা আলাদা চেনা যাচ্ছিল।

শ্রোতাদের বসানো হয়ে গেলে বরের দাদা, পাশে বসা পণ্ডিতজীর কাছে অনুষ্ঠান আরম্ভ করার অনুমতি চাইলেন। পণ্ডিতজী খুব দরদভরা কণ্ঠে বললেন, 'তথাস্তু।' পণ্ডিতজী মহারাজ জীবনের শেষ ধাপে এসে পৌঁছেছেন। কোমর ঝুঁকে পড়েছে। দেহের ওপরের অংশ সামনের দিকে কুঁজো হয়ে গিয়েছে। হাঁটার সময় মনে হয়, যেন ধরিত্রী মাতাকে নমস্কার করতে করতে চলেছেন। ওঁর ভুঁড়ি ঝুলে একেবারে হাঁটু পর্যন্ত নেমে গিয়েছে। গাল আর চোখের নীচের মাংস পর্যন্ত ঝুলে গেছে। মাথার চামড়াও কয়েকটি জায়গায় শিথিল হয়ে গেছে।

তবলায় বাদলদিনের মেঘগর্জন শুরু হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মেঘের ভিতর থেকে যেন চাঁদের উদয় হল। অনবরজানের প্রথম গানের রেশ মুহূর্তের মধ্যে সভার সকলকে নির্বাক্ নিস্পন্দ করে দিল। কোমর নাচিয়ে, বিনুনি দুলিয়ে, ডাগর ডাগর চোখে কামোত্তেজক বাণ হেনে অমবরজান যেদিকে গেল, সেদিকেই দর্শক-হৃদয়কে ছুরিবিদ্ধ করতে লাগল। শুরু হল তার কাওয়ালি—

"তমাশা তেরী কুঁদ কা
এ মসীহা হম ভী দেখেঙ্গে
কি মুর্দা হোতে হ্যায় কিতনে
ইয়ে জিন্দা, হম্ ভী দেখেঙ্গে।"[১]

কাওয়ালির সঙ্গে সঙ্গে ওর অঙ্গভঙ্গি সমস্ত শ্রোতাদের পাগল করে তুলল। কিন্তু বরের দাদা আর পণ্ডিতজীর একেবারে পাগলের মত

তোমার সৃষ্টির মধ্যে কত যে রঙ্গ
হে বিধাতা তা আমি দেখব
কত লোক যে মারা পড়বে
এখনও যাঁরা বেঁচে আছে, আমি তা দেখব।

অবস্থা। মনে হল যেন তাদের মাথায় পাগলামির বাজ পড়েছে। অনবরজানও গানের ফাঁকে ফাঁকে আড়চোখে দেখছিল তার তীরের ফলা কাকে কাকে আহত করেছে, কারই-বা আঘাতটা সামান্য আর কারই-বা জল খাই জল খাই অবস্থা। কিন্তু ও দেখল আঘাতটা ঠিক জায়গায় গিয়েই পড়েছে। হ্যাঁ, ও ভেবেছিল এখানে আঘাত করতে পারলেই ও সফল হবে। ওই আহত দুই ব্যক্তির ওপর একটু বেশি করে প্রেমকটাক্ষ হেনে, ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসির রেখা তুলে সে আবার গান ধরল :

"কহা মৈনে কি মরতা হুঁ,
কিয়া অফসোস কাতিল নে
কি কল মরনা হ্যায় আজ মরজা
জনাজা হম ভী দেখেঙ্গে।"[১]

করমচাঁদের হৃদয় একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ল। পণ্ডিতজীর অবস্থা আরও খারাপ। করমচাঁদ দশ টাকার একখানা নোট বার করে অনবরজানের দিকে বাড়িয়ে ধরল। অনবরজান এমন অঙ্গভঙ্গি করে করমচাঁদের হাত থেকে নোটখানি তুলে নিল যে করমচাঁদ একেবারে মাতালের মত হয়ে গেল। পাশে বসে বর দাদার অবস্থা দেখছিল। পণ্ডিতজীর ইশারা পেয়ে করমচাঁদ আস্তে আস্তে পিছন দিকে হাত করে পণ্ডিতজীর হাতে কয়েকখানি নোট গুঁজে দিল। পণ্ডিতজী তাড়াতাড়ি অনবরজানের দিকে একখানি নোট এগিয়ে ধরলেন।

নোটটি নেবার সময় অনবরজান আঙুল দিয়ে পণ্ডিতজীকে একটু ছুঁয়ে দিল। ব্যস, এতেই পণ্ডিতজী একেবারে গলে গেলেন।

এইবার চারিদিক থেকে নোট বৃষ্টি হতে লাগল। এমন অবস্থা যে অনবরজানের পক্ষে নোটগুলো কুড়নোই মুশকিল হয়ে পড়ল। ওর

১ বললাম, আমি মরছি,
খুনী আফসোস করে বলল
কাল মরবে তার চেয়ে আজই মর
তোমায় কফিনটা আমি দেখে যাব।

আর নাচ-গান করবার ফুরসতই রইল না। সে পণ্ডিতজী আর করমচাঁদের দিকে এক আজব কটাক্ষ হেনে গাইতে লাগল—

"জরা তীরে নজর ফেঁকো
জিগর অউর দিল ভী হাজির হ্যায়
কি কৈসে মারতে হো তুম
নিশানা হম ভী দেখেঙ্গে।"[১]

পণ্ডিতজী প্রায় বেহুঁশ। সেই অবস্থায় তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, বলিহারি—বলিহারি! সঙ্গে সঙ্গে অনবরজানের হাতটা টেনে নিয়ে মুঠোর মধ্যে নোটগুলি গুঁজে দিলেন। করমচাঁদও কম যায় কিসে। সে নয়ের পিঠে দশ মারল। সেও আরও বেশি করে টাকা অনবরজানকে দিল। ওদের এহেন উদারতা দেখে দর্শকরা খুব খুশি। অনবরজানের এই সম্মোহনী শক্তির তারা খুব বাহবা দিতে লাগল। অনবরজান আর-একটি গান ধরল :

"সাকিয়া ঘন ঘোর পর
কালীঘটা ছাই ন হো
মৈ কী প্যালী বন কে দুলহন
বাগ মে আই ন হো।"[২]

গানের সঙ্গে সঙ্গে অনবরজান বোতল থেকে গেলাসে মদ ঢেলে ভরতি করে শ্রোতাদের দিতে লাগল। প্রথম গেলাসটি সে দিল পণ্ডিতজীকে।

'বাহাবা! সুন্দর! কী আর বলব। সাবাশ!' চারিদিক থেকে এই-সব রব উঠল।

---

১ একটু তোমার তীর দৃষ্টি হানো
মন আর হৃদয় (তোমার কাজে) হাজির।
তুমি কেমন করে মার
সেই নিশানা আমি দেখব।

২ হে সাকী, এই ঘন অন্ধকারে
কালো মেঘ না ছেয়ে যায়
সরাবের গেলাস হয়ে আমার কনে
যেন বাগানে না এসে গিয়ে থাকে।

এদিকে মদ্যপান চলছে, সেই সঙ্গে অনবরজানের গানে সকলের মনে ঘোর লেগেছে। অন্যদিকে টাকার টুং টাং আওয়াজ আর পরিমাণহীন মদের ফোয়ারা। ছোট-বড়, গরিব-আমীর সবাই আকণ্ঠ মদ্যপান করছে। বেড়াল যদি মদ ফেলে দেয় তা হলে ইঁদুরও সেই মদ দিয়ে কুলকুচো করে। যে সারাজীবনে মদ কাকে বলে চোখেই দেখে নি, সেও বিনে পয়সায় মদ পাওয়া যাচ্ছে দেখে আর থাকতে পারে নি। আকণ্ঠ মদ খেয়ে গলা পরিষ্কার করে নিয়েছে। কন্যাপক্ষের অভ্যাগতদের মুকুটমণি সরদার পালা সিংজী ওখানেই ছিলেন। আর তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু গ্রন্থী সাহেবজী তাঁর পাশেই শোভা পাচ্ছিলেন।

জাঠরা যখন মদ খেয়ে নেশায় ঢুলছে তখন শামিয়ানার পিছন দিক থেকে কে যেন বলে উঠল— পাঞ্জাবী দা কোই চোঁদা চোঁদা গান হো জায়ে।

অনবরজান এবার পাঞ্জাবি গান ধরল—

"মৈনু কমলী কমলী আখদে
কমলী বালা তুঁ
মেরে দিল কোলেঁা পুচ্ছ কে দেখ লৈ
বহুত নিহালা তুঁ
হুন কলিয়াঁ সেজ বিছানী আঁ
ভর ভর জাম পিলানী আঁ
মৈঁ সাকী মৈখানে দী
বন মতয়ালা তুঁ।"[১]

লোকে বলে, আমি বোকা, বোকা
তুমি কমলিওয়ালা।
আমার অন্তর ছুঁয়ে দেখ
তুমি আমাকে মহান করেছ।
এখন তো আমি বিছিয়ে দিচ্ছি কুঁড়ির শয্যা
সুরার পাত্র ভরে দিচ্ছি আমি
আমি সাকি, আমি সুরাখানায়
তুমি এখন ফুর্তিতে মেতে ওঠ।

গান গাইতে গাইতে অনবরজান একেবারে সরাবখানার সাকীর রূপ ধরল। এমন কোন বেরসিক আছে যে সে তার হাত থেকে সরাবের গেলাস তুলে তাতে চুমুক দিয়ে মাতাল হতে চাইবে না ?

পালা সিং আর তার সাগরেদরা তো একেবারে মদের পোকা। কিন্তু ভাইজীর ভাগ্যে এর আগে কখনও এক ছটাক বা বড় জোর আধ পোয়ার বেশি মদ জোটে নি। আজ এমন সুন্দর সুযোগ এসেছে যে, খাবার কথা তো আলাদা, এমন কি স্নান করবার মত মদেরও ঘাটতি নেই। সেইজন্য ভাইজী আকণ্ঠ মদ্যপান করতে লাগল।

করমচাঁদ আর পণ্ডিতজী এই কথাই ভাবছিলেন যে, সংসারে আসা সার্থক হয়েছে। অনবরজান বাকী লোকদের গেলাস ভরতি করে দিচ্ছিল কিন্তু এই দু'জনের মুখে গেলাস ধরে তাদের খাইয়ে দিচ্ছিল।

ধীরে ধীরে অনবরজান আর-এক ধাপ এগোল। এইবার সে দুটো গেলাস নিয়ে এল। গেলাস দুটোতে একটু চুমুক দিয়ে সে গেলাস দুটো দুজনের হাতে তুলে দিল। সেই সঙ্গে হানল বিলোল কটাক্ষ। দু'জনেই এতে পুরো ঘায়েল হয়ে গেল।

আস্তে আস্তে জলসার রঙ বদলাতে লাগল। সমস্ত দর্শক তখন অন্য এক পৃথিবীতে পোঁছে গেছে। কেউ-বা চোখ বুজে ঢুলছে। কেউ-বা অনবরজানের সঙ্গে অস্পষ্ট জড়ানো গলায় প্রেমালাপ শুরু করে দিয়েছে। বেশির ভাগেরই বেহুঁশ অবস্থা।

অবশেষে অনবরজান তার লীলা শেষ করল। বাজনাদারদের বাদ্যযন্ত্র বাঁধতে ইশারা করল। সারেঙ্গীবাদক আজ খুব মন দিয়ে বাজিয়েছে। সারেঙ্গীর পেট টাকা আর নোটে ভরতি হয়ে গিয়েছে। বাজনদাররা নিজেদের বাজনা নিয়ে ওরা যে ঘরে উঠেছিল সেই ঘরে চলে গেল। শ্রোতারাও টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। যারা প্রচুর পান করেছিল আসরেই শুয়ে পড়ল। আর উঠতে পারল না।

॥ ২৫ ॥

রাত আটটার সময় বচন সিং রবানী গ্রামে সুন্দরীর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছল। ওর মন নিরাশায় ভরা। ওর অবস্থা দেখে সুন্দরী বড় উদ্বিগ্ন হল। পরম প্রীতির সঙ্গে সে বচন সিং-এর হাত ধরে জিজ্ঞাসা করল, কী ব্যাপার ? ভাল তো ?

এক ঠাণ্ডা নিশ্বাস নিয়ে বচন সিং চারপাইয়ে বসতে বসতে বলল, সুন্দরী, আমি পারলাম না। এরপর সে সুন্দরীকে সব খুলে বলল। বলল, কী ভাবে কাল সারাদিন ধরে ঘুরেছে। কিন্তু সমস্ত জায়গায় তাকে হার স্বীকার করতে হয়েছে। আজকের মুজরোর আসরের অবস্থার কথাও বলল, সে বলল, দীওয়ানপুরে আজ কী ভাবে মদের নদী বয়ে গেছে আর কী ভাবে সোনা-রুপার বৃষ্টি হয়েছে।

সুন্দরীর গোলাপী রঙ যেন হলুদ বর্ণ হয়ে গেল। সে এই ভেবে আরও ব্যথা পেল যে সে তার প্রিয়তমকে এ কাজে একটুও সাহায্য করতে পারে নি। যে কাজ তারা দুজনে একসঙ্গে করবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল, সে কাজ একা করতে গিয়ে বচন সিং শুধু শুধু নিজের শক্তিক্ষয় করেছে।

অনেকক্ষণ ধরে ভাবার পর সুন্দরীর মনে এক বুদ্ধি এল। ফলে ওর সারা শরীর খুশিতে ঝিলমিল করে উঠল। সে হঠাৎ বলে উঠল, আচ্ছা, এবার কিন্তু আমার পালা।

—আপনার ? বচন সিং অবাক্ হয়ে গিয়ে বলল— সুন্দরীজী, আপনি কী করে এই কাজ করবেন ? যে কাজ আমি এতদিন চেষ্টা করেও করতে পারলাম না, সেই কাজে আপনি কী করে সফল হবেন ?

সুন্দরী দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠল, যদি সফল না হই তাতেও ক্ষতি নেই। আমি নাহয় তখন ফিরে আসব। আমার তরফ থেকে তো চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সফল হওয়া না হওয়া গুরুজীর হাত।

—না সুন্দরীজী, আমি আপনাকে এই বিপদজনক কাজে নামতে কিছুতেই পরামর্শ দিতে পারি না।

—শুনুন না…

—হাঁ।

—আমি আর-একটা উপায় ভেবেছি।

—কী?

—ডালপালা না ধরে যদি একেবারে গোড়া ধরি।

—তার মানে?

—তার মানে ওই বেশ্যাটাকে গিয়ে যদি বোঝানো যায়?

বচন সিং খুব জোরে হাসতে হাসতে বলল—বাঃ সুন্দরীজী! 'যে মন্তর দিয়ে তুমি একটা বোলতাকে কাবু করতে পার না, সেই মন্তর দিয়ে তুমি সাপ ধরতে চাও?'

—মানুষ বন্দুকের যে গুলি দিয়ে খরগোশ মারতে পারে না, অনেক সময় সেই গুলিতে হয়তো বিরাট বাঘ মারা পড়ে। আপনি আমাকে অনুমতি দিন।

—আচ্ছা, আপনার মন যা চায় তাই করুন। আমি আপনাকে বাধা দিতে চাই না। কিন্তু শুধু শুধু বেকার চেষ্টা।

—যাই হোক-না কেন…।

—ঠিক আছে, আপনার যা অভিপ্রায়।

—তা হলে চলুন, আমাকে দীওয়ানপুরে নিয়ে চলুন। আমি একবার চেষ্টা করে দেখি।

—কিন্তু এত রাত হয়ে গেছে, এখন। ফিরবেন কেমন করে?

—ফেরার দরকার নেই। বাকী রাতটা আপনার ঘরেই কাটিয়ে দেব।

—আচ্ছা চলুন। এই বলে বচন সিং সুন্দরীকে সঙ্গে নিয়ে দীওয়ানপুরের দিকে চলল।

॥ ২৬ ॥

রাত দশটা বেজে গিয়েছে। অনবরজানের বৈঠকখানায় এখনও বহু ভদ্রলোকের ভিড়। কিন্তু অনবরজান মাথা ধরেছে বলে অনেক কষ্টে তাদের কাছ থেকে ছাড়া পেয়েছে। তার ঝি দরজা বন্ধ করে

বিছানা পেতে দিয়েছে। অনবরজান গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছে।

ওর ঘুমে চোখ জুড়ে এসেছে এমন সময় নীচে দরজায় কড়া নাড়ার খটখট আওয়াজ শোনা গেল। অনবরজান বিরক্ত হয়ে বিড় বিড় করে বলল, পাজীগুলো দেখছি একটু ঘুমোতেও দেবে না। কত কষ্ট করে যে ওদের ঘর থেকে বার করলাম।

প্রথমে তার মনে হল, ঝিকে দিয়ে বলে পাঠায় যে সে শুয়ে পড়েছে। কিন্তু কী মনে করে সে ঝিকে দরজা খুলতে পাঠিয়ে দিল।

আগন্তুকের পায়ের আওয়াজ শুনে অনবরজান উঠে বসল। দেখল ঝিয়ের পিছন পিছন ষোল-সতেরো বছরের একটি মেয়ে আসছে। মেয়েটি লতার মত পাতলা দীর্ঘাঙ্গী, পটে আঁকা চোখ। অনবরজান অবাক হয়ে ভাবল, এই মেয়েটির এখানে কী দরকার!

সে সস্নেহে মেয়েটিকে কাছে আসতে ইশারা করে বলল, এস মা, তুমি এই সময় কোথা থেকে আসছ?

কোন স্ত্রীলোকের মুখে তাকে 'মা'[১] বলে সম্বোধন করতে সম্ভবত সুন্দরী এই প্রথম শুনল। ছোটবেলা থেকেই সে দেখে আসছে যে অন্য ছেলে-মেয়ের মায়েরা তাদেরকে 'মা', 'বাবা', 'খুকী' বলে ডাকে। ওর তখন মনে বড় কষ্ট হত। ও ভাবত আহা, আমার যদি মা থাকত তা হলে এমন করে ডাকত। জ্ঞান হবার পর থেকে ওর কান একটি ছোট্ট শব্দ শোনার জন্য আকুলি-বিকুলি করত। যে কথা বলার জন্য ও এখানে এসেছিল, 'মা' শব্দ শোনার পর সে-সব কথা বলতে সে ভুলে গেল। তার সমস্ত চিন্তা কোথায় উড়ে গেল।

ও রাস্তা থেকেই চিন্তা করছিল জাতির গৌরবকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলছে যে বেশ্যামাগীটা, তার কাছে আমি কেমন করে যাব? যার ঘরে সমস্ত কিছুই পাপ আর দুরাচারে ভরা আমি তাকে কেমন করে স্পর্শ করব?

সে ভেবেছিল দূরে দাঁড়িয়েই সে বেশ্যাটার সঙ্গে কথাবার্তা সারবে। কিন্তু ও নিজের অজান্তে ঘরের ভেতরের চারপাইয়ের কাছে চলে এল।

---

১ বেটি

সেই সময় অনবরজানের ঝি তার ঘরে চলে গিয়েছিল। সুন্দরী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। অনবরজান ফের জিজ্ঞাসা করল, খুকী, আমার সঙ্গে তোমার কী দরকার? ওর প্রথম কথাটিই সুন্দরীর হৃদয়ে গিয়ে পৌঁছেছিল। তার সমস্ত ঘৃণা দূর হয়ে গেল। আবার 'খুকী' ডাক শুনে সুন্দরীর মনের মোহ-দরজা খুলে গেল : সে মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ মা, কাজ আছে।

সুন্দরীর বিনম্র ভঙ্গিটি অনবরজানের খুব ভাল লাগল। মা শব্দটি ওর কানে যেন মধু ঢেলে দিল। সুন্দরীর হাত ধরে তাকে চার-পাইয়ের ওপর বসিয়ে অনবরজান বলল, এবার বল।

সুন্দরী কোন সঙ্কোচ না করে চারপাইয়ের ওপর বসে পড়ল। অনবরজানের দিকে তাকিয়ে সে বলল, মাজী আমি এক আবেদন জানাতে এসেছিলাম, কিন্তু··· ।

সে চুপ করে গেল। অনবরজান তার দিকে এক গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার মনের কথা জানার চেষ্টা করল। কিন্তু সুন্দরী কিছু বুঝতে পারল না। হাত বাড়িয়ে সুন্দরীর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে সে সুন্দরীর কাঁধ নিজের দিকে টেনে নিল—বল খুকী, কথা বলছ না কেন?

বেশ্যার যে হাতকে সে এতক্ষণ অপবিত্র ও ঘৃণিত মনে করে এসেছে সেই হাতের স্পর্শ তার দেহে পেয়ে সে যেন এক পরম আত্মীয়তার উত্তপ্ত স্পর্শ অনুভব করল। সুন্দরী তার আর-একটি হাত নিজের হাতে নিয়ে নিজের মাথা ওর বাহুর সঙ্গে ঠেকিয়ে বলল, মা, আমার কাজটা বড় কঠিন। বলতে আমার লজ্জা করছে।

অনবরজান আস্তে আস্তে নিজের হাতখানি সুন্দরীর হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, না মা। লজ্জা কি? তুই যা বলবি, আমি তা মেনে নেব। বোধ হয় অনবরজান হঠাৎ এই কথাগুলি বলে ফেলেছিল। ফের সে ভাবতে লাগল, একে না জিজ্ঞাসা করে কথা দেওয়া উচিত হয় নি।

সুন্দরী তার পাশে বসল। সে বলল, মা··· এর পর ওর মুখ দিয়ে আর কোন কথা বার হল না। মা শব্দটি উচ্চারণ করার সঙ্গে

সঙ্গে ওর দেহের ভিতরটা অমৃতে ভরে গেল। ওর শিরায় শিরায় মোহ আর ভালবাসার অনুরণন জাগল। যেমন একবার ফুলের গন্ধ শুঁকে মানুষ তৃপ্ত হয় না তাই সে বার বার ফুল শোঁকে, তেমনি সুন্দরী মনে মনে বার বার মা শব্দটি আবৃত্তি করতে লাগল। সে আবার বলে উঠল, মা।

অনবরজান সম্ভবত সুন্দরীর ডাক শুনতে পায় নি। সে সুন্দরীকে নিজের কাছে টেনে নিল আর সস্নেহে ওর চুলে হাত বুলোতে লাগল। কিছুক্ষণের জন্য সুন্দরীর মনেই রইল না ও কিছু বলতে এসেছিল। প্রকৃতির কারিগরের হাতে গড়া এই সুকোমল বালিকাকে অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছিল। অনবরজানের হৃদয়ে তখন একটি রসধারা প্রবাহিত হচ্ছে— সম্ভবত সে রস বাৎসল্য। এই রসের প্রাবল্যে তার হৃদয় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল।

সুন্দরী তার বুকে মাথা রেখে, তার চোখে চোখে চেয়ে বলে উঠল, মা।

অনবরজান এবার মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল, সুন্দরীর চোখের কোণা ভিজে উঠেছে। সে বালিশের তলা থেকে রুমাল বার করে তার চোখ মুছিয়ে দিল। কী জানি এই সময় হঠাৎ তার ঠোঁট বিবশ হয়ে গিয়ে সুন্দরীর মাথার সঙ্গে লেপটে গেল।

সুন্দরী তার দুই হাত দিয়ে অনবরজানের গলা জড়িয়ে ধরল।

অনবরজানের হৃদয় কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠল। তার মনে পড়ে গেল, সুন্দরীকে কিছু জিজ্ঞাসা করা দরকার। সে সুন্দরীর পিঠে হাত রেখে বলল, মা, যা বলছিলে এবার বল। তুই যা বলবি, আমি শুনব।

সুন্দরী অনবরজানের দিকে তাকিয়ে পরিমাপ করার চেষ্টা করল, তার এই প্রতিশ্রুতি কতখানি খাঁটি। সে বলল মা, আপনার এই কাজ করতে ঘৃণা হয় না?

—ঘৃণা? অনবরজান সুন্দরীর চোখের দৃষ্টির মধ্যে কিছু যেন খোঁজার চেষ্টা করল। সে বলল, আমি এই কাজকে ঠিক ততখানিই ঘৃণা করি যতখানি তুমি কর।

—তা হলে আপনি এ কাজ কেন ছেড়ে দিচ্ছেন না, মা ?

—তার কারণ এই পৃথিবীতে আর কোথাও আমার জায়গা নেই।

অনবরজানের চোখে ফুটে উঠল এক নির্দোষ অপরাধীর অভিব্যক্তি।

—তার মানে ? সুন্দরী প্রশ্ন করল।

—এর মানে তুমি বুঝবে না মা।

—কেন মা ?

—সম্ভবত তুমি এখনও কুমারী, তাই না ?

—হ্যাঁ। সুন্দরী নীচের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল।

—এই জন্যই বলছিলাম, তুমি আমার অবস্থা বুঝতে পারবে না। আমি তোমাকে এর কারণও বুঝিয়ে বলতে পারব না। আমার কথা একমাত্র সেই-ই বুঝতে পারবে যার বিয়ে হয়েছে আর বিয়ের পালকি থেকে নামতে না নামতে যে বিধবা হয়েছে, আর বিধবা হতে না হতে শ্বশুর বাড়ির লোকেরা যাকে দুধে বসা মাছির মত করে টান মেরে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। আর ফেলে দিয়েছে বদমায়েশ, জোচ্চোর আর শয়তানের দুনিয়ায়।

এই কথা বলার সময় অনবরজানের সারা দেহ থেকে যেন বিদ্রোহ আর হিংসা ফেটে পড়ছিল। তার কপালের শিরা কুঁচকে গিয়েছিল আর চোখ দেখে মনে হচ্ছিল, সে চোখে রক্তের ধারা নেমে এসেছে।

তার সামনে দাঁড়াতে সুন্দরীর ভয় করছিল। যেন এক ক্ষুধার্ত বাঘিনী গর্জন করছে। তার ভয় হল। সে ভাবতে লাগল, ওই জ্বলন্ত দৃষ্টির সামনে থেকে কীভাবে সরে পড়া যায়।

অনবরজানের কথায় যেন অগ্নিবর্ষণ হচ্ছিল। সে বলে চলেছিল, ওই পৃথিবীতে প্রতি পদে পদে মানুষের রূপ ধোঁকাবাজি, বেইমানী, বন্ধুবিদ্বেষ, ওই পৃথিবীতে নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য, এক টুকরো রুটির জন্য আমাকে দেহের ব্যবসায় নামতে হয়েছে, আর কীই-না করতে বাকী রেখেছি আমি। এখানে কেউ বাবা সেজে, কেউ ভাই সেজে আমার ইজ্জৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চেয়েছে। যেখানে মায়ের প্রাণের টুকরো···মায়ের দুধের বাচ্চাকে তার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কাক আর কুকুরের মুখে ফেলে দিতে কেউ সঙ্কোচ করে না।

এই তুনিয়ায় এই পেশা গ্রহণ ছাড়া আর উপায় কি ? আমি কিছুক্ষণ আগে বোধ হয় বলেছি যে আমি এই পেশাকে ঘৃণা করি, না-না, আমি এই পেশাকে একেবারে ঘৃণা করি না। আমি কেন একে ঘৃণা করব ? যার দয়ায় আজ বড় বড় আমীর, কবীর, বড় বড় লীডার আর চৌধুরী আমার দরজায় এসে সেলাম ঠুকছে। আমি তো এই পেশার এই অলৌকিক ক্ষমতাকে সবই ভগবানের কৃপা বলে মনে করি। এই পেশা আমাকে কী না দিয়েছে ? ইজ্জৎ, ধন-দৌলৎ, সুখ, নাম, যশ— সব-কিছু। শুধু আমি একটি জিনিস থেকে বঞ্চিত হয়েছিলাম সেটি হল আমার সেই সন্তান— যাকে তার জন্মের দিন এক শয়তান জুলুমবাজ চাতুরি করে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে···উঃ ? আমার ভেতরে যে কী আগুন জ্বলছে— আমি···আমি ওই আমি ওকে ! ওঃ ওঃ বলতে বলতে অনবরজান কেঁদে ফেলল ···যেন মনে হতে লাগল কান্নার দমকে ওর দেহটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

তাকিয়ার ওপর মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদতে লাগল।

এই দৃশ্য দেখে সুন্দরীর মাথা ঘুরে গেল। ভয় ও ক্লান্তিতে তার চোখের সামনে সারা তুনিয়াটা ঘুরতে লাগল। অসাফল্যের ক্লান্তিতে তখন তার সারা অঙ্গ ছাওয়া। ওই অবস্থায় অনবরজানকে ফেলে রেখে সে নীচে নেমে এল।

নীচে নেমে সে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকেই গেল। কিন্তু দশ-পনেরো পা গিয়ে আবার থেমে গেল।—তারপর নিজের অজান্তে এক সময় সে আবার অনবরজানের ঘরের দরজার সামনে পৌঁছে গেল। এমন কেন হল ? সে তার কোন কারণ বুঝতে পারল না।

সিঁড়ির দরজা তখনও খোলা ছিল। ভেতরে পা ফেলতে গিয়ে অন্ধকারে কিসের সঙ্গে সে ঠোক্কর খেল। ভয় পেয়ে সে সামনের বস্তুটিকে এমন করে জড়িয়ে ধরল যেমন করে ঘুমন্ত শিশু ভয় পেয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে।

সুন্দরী চলে যাবার পর অনবরজান চোখের জলে তার হৃদয়ের দুঃখ হালকা করার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ খেয়াল হওয়ায় সে তাকিয়া থেকে মাথা তুলে ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখল মেয়েটি ওখানে নেই। অনবরজানের হৃদয়ে কে যেন আঘাত করল। সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচে চলে গেল। নীচে নামতে নামতে অন্ধকারে ও বাইরে থেকে আসা কার সঙ্গে যেন ধাক্কা খেল। সামনের সচল পদার্থটি তার বুকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সে সুন্দরী।

দুজনেই চুপচাপ। ওরা আবার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠল। ওরা সেই আগের ঘরে গিয়ে পৌঁছল। কিছুক্ষণ পরে অনবরজান সুন্দরীকে কোলে তুলে নিল।

একটু পরে অনবরজান বলল।

মা, তোমার নামটা যেন কী ?

—সুন্দরী।

—তুমি কোথায় থাক ? জানি না কেন আমি সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তোমায় ভালবেসে ফেলেছি। তোমাকে যদি নীচে দরজার কাছে না পাওয়া যেত তা হলে আমাকে তোমার পিছু পিছু দৌড়তে হত। হ্যাঁ, তোমার বাবা কি করেন খুকী ?

সুন্দরী বলল, বাবা স্বর্গে গেছেন।

—কী কাজ করতেন ?

—উনি ছিলেন একজন বাজীকর।

—বাজীকর ? বাঁদর নাচাত ?

—হ্যাঁ।

অনবরজান একবার ওর দিকে তাকাল আর ভাবতে লাগল—বাজীকরের ঘরে এমন সুন্দরী মেয়ে। সে আবার ওকে জিজ্ঞাসা করল, আর তোমার মা ?

—আমার মা নেই।

—ওহ্ বড় দুঃখী মেয়ে তুমি, বেচারি ! খুকী, তোমার মা মারা গেছেন কতদিন ?

—আমার জানা নেই।

—জানা নেই ?

—আমার কোন মা ছিল না।

উত্তর শুনে অনবর একটু হাসল। সে আবার বলল, ছোট বেলাতেই মা মারা গেছেন ?

—না।

—তা হলে।

—মা কখনই ছিল না।

—তা হলে তোমার জন্ম হল কী ভাবে ?

—আমার জন্ম হয় নি। তাড়াতাড়ি সুন্দরীর মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে গেল। কিন্তু নিজের এই মূর্খতাপূর্ণ জবাবের কথা ভেবে ওর মনে মনে বেশ লজ্জা হল। সে বলল, না. সত্যি। আমার বাবা আমাকে একটা ঢিবির নীচে থেকে কুড়িয়ে এনেছেন।

এই কথা শুনে অনবরজানের মুখের ভাবের পরিবর্তন লক্ষ্য করে সুন্দরী ভাবতে লাগল, আমি এঁর ঘুম নষ্ট করে দিচ্ছি। এখন আমার যাওয়া দরকার। সে যাওয়ার আগে বলল, আচ্ছা, মা, এবার আমাকে যেতে অনুমতি দিন। আমি আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম। সম্ভবত আপনি ক্লান্ত। পরে এক সময় দেখা করব।

অনবর সুন্দরীর হাত ধরে তাকে বসাল। বলল, খুকী, উনি তোমাকে কোন্ গ্রাম থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আসেন ?

সুন্দরী বলল, অন্য কোন গ্রাম নয়। এই গ্রামেরই বাইরে থেকে।

একটু পরে সুন্দরী সে জায়গার ঠিকানা বলল। সেই সঙ্গে এক এক করে সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনার কথা খুলে বলল।

ওই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরীর মনে হল সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। এর পরে দুজনে দুজনার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল।

যখন দুজনের চোখের জল আর কিছু অবশিষ্ট রইল না তখন তারা দুজনে দুজনের দিকে অপলক দৃষ্টিতে কতক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল। সুন্দরীর মনের ভেতর তখন মোহনদী প্রবল বেগে আছড়ে পড়ছে। সে অনবরজানের গলা জড়িয়ে উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল, মা আপনি ...আপনি...

কিন্তু এই সময় অনবর কোন জবাব দিল না। কী জানি কী ভেবে সে একটু বিচলিত বোধ করল আর সুন্দরীর বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কয়েক পা পিছনে হটে গিয়ে বলল, 'ওঃ মা আমার! তুই আমার মত অপবিত্র আর পাপী একটা মেয়েমানুষকে ছুঁয়ে কী ভুলই না করেছিস। তুই কুলটা মায়ের মেয়ে। ওরে তুই আমার মত পাপী দুরাচারীকে ঘৃণা কর। এই পাপ আর নোংরা ভরা বাড়িতে তোর এক মিনিটও থাকা উচিত হবে না। তুই নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র। যা, তুই এখান থেকে এখনই চলে যা।

অনবরজান দুহাত দিয়ে নিজের মুখ ঢাকল। কিছুক্ষণ আগে ওর হৃদয়ে ভালবাসা যেন উপচে পড়ছিল, সে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল, এখন সেজন্য সে অনুতপ্ত। তার মনে হল, তার মেয়ে আজ জানতে পেরেছে সে এক বেশ্যার মেয়ে। কী জানি এ কথা জানার পর কীই-বা সে ভাবছে। সে পাগলের মত দৌড়ে ঘরের এক কোণে গিয়ে মুখ লুকোলো আর ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে লাগল। যখন ও অনবরজানের দিকে তাকাল তখন দেখল অনবরজান জোরে জোরে কেঁদে চলেছে। কান্নার দমকে ওর নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে।

সুন্দরী ভাবল, এর হয়তো কোন ছেলে-মেয়ে মারা গিয়ে থাকবে অথবা ওর কোন সন্তান হয়তো হারিয়ে গেছে। সেই কথা মনে পড়তেই ও এমনি ভাবে কেঁদে চলেছে। সে খুব আদর করে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, মা, আপনি কাঁদছেন কেন?

অনবর আর নিজেকে সামলাতে পারল না। সে সুন্দরীর গলা জড়িয়ে ধরে সমানে কেঁদে চলল। কাঁদতে কাঁদতে সে যেন পাগলের মত হয়ে গেল। সে কিছু বলতে চাইছিল। কিন্তু তার গলা দিয়ে কোন স্বর বার হল না। সে বলল, ওরে আমার পোড়াকপালী মেয়ে! আমিই তোর সেই মা। যার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তোকে একদিন ওরা জঙ্গলে ফেলে দিয়েছিল।

—কী! সত্যি? এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরী কিছুক্ষণ পর্যন্ত কিছুই বুঝতে পারল না ও কী দেখছে। ওর মনে হচ্ছিল এ-সব বুঝি স্বপ্ন। ও আবার অনবরের গলার আওয়াজ শুনতে পেল। অনবর

তখন উন্মাদিনীর মত বিড় বিড় করে কি বলছে। এ যেন পরীক্ষায় ফেল করে কোন ছাত্র তার মা-বাবার রাগ শান্ত করবার জন্য নিজের সাফাই গাইছে।

অনবরজান সুন্দরীর দিকে তুহাত বাড়িয়ে দিয়ে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে লাগল আর বলতে লাগল— না, না, মা, এতে আমার কোন অপরাধ নেই। আমি জ্ঞানত কোন অপরাধ করি নি। সমস্ত কিছুই আমাকে অন্যে করতে বাধ্য করেছে। তোমাকে সব কথা খুলে বললেই তুমি বুঝতে পারবে যে আমি দোষী, না নির্দোষ ?

কে যেন সুন্দরীর দেহ থেকে এক খাবলা মাংস তুলে নিল। মনে হল তার হৃদয়ে কে যেন বার বার ছুরিকাঘাত করছে। সে তাড়াতাড়ি অনবরজানের পায়ে গিয়ে পড়ল। সে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, মা, আমি জানি তুমি নির্দোষ। কিন্তু আমাকে বল মা, কোন্ শয়তান তোমার এই অবস্থা করল ?

মেয়ের কথার জবাব দেওয়ার জন্য অনবরজান নিজেকে সম্বরণ করল। সে তার কাছে গিয়ে চারপাইয়ের ওপর বসল। এরপর সে প্রথম থেকে তার ভাগ্য-বিপর্যয়ের ইতিহাস সুন্দরীকে শোনাল। শোনাল, প্রথম দিনের সেই কলঙ্কময় ইতিহাসের কথা। যেদিন অনবরজানের নবজাত সন্তানকে শয়তানেরা জঙ্গলে ফেলে দিয়ে এসেছিল।

শুনতে শুনতে সুন্দরীর সারা দেহে আগুনের জ্বালা ধরে গেল। যে সমাজের অত্যাচার দেখে তার মন এতদিন তুঃখভারাক্রান্ত ছিল, যে সমাজ তার প্রেমিক ও ধর্মপিতাকে কষ্ট দিয়েছে সেই সমাজ তার স্নেহময়ী মায়ের এই দশা করেছে শুনে তার আপাদমস্তক জ্বলে উঠল। এই সময় বচন সিং-এর উপদেশের কথা তার মনে পড়ল। এই জন্যে তার ওখানে বসে থাকা মুশকিল হয়ে উঠল। সে উঠে ষ্টীম ইঞ্জিনের মত বড় বড় নিশ্বাস নিতে লাগল। সারা শরীর কাঁপতে লাগল। কিন্তু অনবরের ইতিহাস শোনা তখনও কিছুটা বাকী। এই কথা ভেবে সে নিজেকে সম্বরণ করার চেষ্টা করল। বলল, তারপর কি হল মা ?

অনবর বলতে শুরু করল— মা, তোর ওই ছোট্ট মাংসপিণ্ডটার

জন্য আমার যে কী মায়া পড়ে গিয়েছিল তা কী করে বোঝাব! তা বোঝানোর শক্তি আমার নেই। চিল-শকুনের ক্ষুধার্ত মুখের সামনে ওরা তোকে খোলা আকাশের নীচে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। যে সময় তোর শয়তান বাপ (তারাচাঁদ) আমাকে রোগ অবস্থায় ফেলে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। সে সময় আমার হাতে একটিও পয়সা নেই। রান্নার দু-একটা বাসন ছাড়া ঘরে আর কোন জিনিস নেই। ঘরে যা-কিছু ছিল তা সে প্রথমেই সেগুলো সরিয়ে ফেলেছিল।

সুন্দরী দেখল, তারাচাঁদের নাম উচ্চারণ করার সময় আনবরের এমন চেহারা হয়ে গেল যেমন চেহারা খুন করার আগে খুনীর হয়। সে হাঁফাচ্ছিল। তার বুক কামারশালার হাফরের মত দ্রুত ওঠানামা করছিল। এমন-কি, কথা বলতে বলতে সে কী কথা বলছিল তাও ভুলে গেল। সে উঠে এক গেলাস জল খেল। তারপর বলল, ও পালিয়ে গেল আর ভীষণ উদ্বেগ আর অস্বস্তির মধ্যে আমার সময় কাটতে লাগল। রাত তখন প্রায় দুটো। কাছাকাছি কোন হিন্দু বাড়ি নেই। এই সময় পাশের বাড়ির ছাদ টপকে দুজন মুসলমান স্ত্রীলোক এল। সম্ভবত ওরা আমার ঘরে বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শুনে থাকবে। ঈশ্বর ওদের মঙ্গল করুন। ওরা আমাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। কিন্তু আমার জান বড় শক্ত। এত কাণ্ডের পরও প্রাণটা বেরুল না। আমি দিব্যি বেঁচে গেলাম। ওদের মধ্যে একজন সামান্য দাই-এর কাজ জানত। সে সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে আমার সেবা-শুশ্রূষা করল।

পরের দিন সকালে সেই স্ত্রীলোকদের বাড়ির লোকেরা পাশের এক হিন্দু পাড়ায় গিয়ে খবর দিয়ে এল। তারা সঙ্গে করে হিন্দু পাড়া থেকে কয়েকজনকে সঙ্গে করে নিয়ে এল। ওরা যখন আমার কাছে এল তখন যে স্ত্রীলোকটি আমার জীবন বাঁচিয়েছিল তার স্বামী ওদের বলল, কাল রাত থেকে ওরা আমার সেবা করছে। ও এ-কথাও বলল যে, আগে তার স্ত্রী আমার মুখে জল দেয় তবে আমার জ্ঞান হয়। এরপর আমাকে গরম দুধ আর সেই সঙ্গে আরও কিছু গরম পানীয় এনে দেয় তবেই আমার বহু কষ্টে প্রাণ বাঁচে।

এ কথা শুনে হিন্দু পাড়ার সেই-সব মাতব্বর ব্যক্তিরা কানে আঙুল দিয়ে ওখান থেকে সরে পড়ল আর যাবার সময় বলে গেল, মুসলমানের হাতে জল খাওয়ার পর আমি আর ওদের বাড়ির চৌকাঠ মাড়াতে পারব না। আমি ধর্মভ্রষ্ট।

বেচারা মুসলমানরা তো এই কথা শুনে একেবারে বসে পড়ল। সে সময় আমার বেশ পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে এসেছে। একে তো শুরু থেকেই দুর্ভাগ্য আমার পিছনে পিছনে ঘুরছে। তার ওপর এই চৌধুরীদের নির্দয়তায় আমার হৃদয় একেবারে পাথর হয়ে গিয়েছে। আমি দুঃখে জর্জরিত হয়ে মুসলমানদের বললাম, বীরজী[১], হিন্দুরা যদি আমাকে আশ্রয় না দিতে চায় তা হলে কি আমাকে দশটা দিনও আপনাদের বাড়িতে থাকতে দেবেন না ?

ওদের মধ্যে থেকে একজন বলল, দশদিন কী বলছেন, আপনি যদি চান দশ বছর আমাদের এখানে থাকতে পারেন। আমাদের ছেলে-মেয়েরা সামান্য ক্ষুদ কুঁড়ো খেয়ে থাকে। সবার আগে তা থেকেই আপনাকে দেব। কিন্তু কি করব বলুন! আমাদের তো মনে হচ্ছে এখানে থাকা নিয়ে আপনাদের হিন্দু সমাজ আপত্তি করবে।

রাগে আমার দেহ জ্বলে গেল। আমি বললাম, হিন্দু সমাজ ? যে সমাজে আমার সমস্ত সম্ভ্রম নষ্ট করেছে। যে সমাজ বিনা অপরাধে আমার সম্মান মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছে সেই সমাজকে আপনি কি এখনও মনুষ্য সমাজ বলে মানেন ? না, এই সমাজকে আমি ঘৃণা করি! মৃত্যুর দিন পর্যন্ত আমি ঘৃণা করে যাব। যদি আপনার মনে ঈশ্বরের কোন সন্তানের জন্য সামান্য করুণা হয় তা হলে আমাকে এখানে কিছুদিন থাকতে দিন। এরপর আর একজন বলল, বোন, তুমি আমার কাছে মায়ের পেটের বোনের চেয়েও বড়। যতখানি আমাদের সাধ্য তোমাকে সুখী করার জন্য আমাদের চেষ্টার ত্রুটি হবে না। কিন্তু কি করব! আমরা কুলি-মজুর মানুষ আর এত গরিব যে তোমার রান্না-বান্নার জন্য একজন হিন্দু ঠাকুর রাখা

১. ভাই সাহেব

আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমি ওঁকে বললাম, এর কোন দরকার নেই। আমি আপনাদের হাতেই খাব। আমি হিন্দুদের ঘৃণা করি।

সেদিন থেকে ওরা প্রাণ দিয়ে আমার সেবা করতে লেগে গেল। আমি মন ভরে ওদের আশীর্বাদ করতে লাগলাম। প্রায় দু-হপ্তার মত ওদের বাড়িতে কেটে গেল।

অনবরজান বলে যাচ্ছিল, তোর জন্মের পনের দিন পরে সেই হিন্দু পাড়ার মাতব্বর আবার আমার কাছে এল। আমাকে খুব মিষ্টি করে বলল, বিবি, আমি তো সেই দিন থেকেই খালি তোমার কথা ভাবছি। তোমাকে দিল্লীর এক বিধবা আশ্রমে পাঠাব ঠিক করেছি। ওখানে তুমি তোফা আরামে থাকবে। তা ছাড়া ওরা লেখাপড়াও শেখাবে।

প্রথমে আমি রাজি হই নি। কারণ ওর প্রথম দিনের মূর্তির কথা আমার মনে ছিল। কিন্তু আমার মুসলমান ভাইরা আমাকে বোঝাল। আমি শেষে যাবার জন্য তৈরি হলাম।

পরের দিন সে এল। আমায় একটা টাঙ্গায় করে সে স্টেশনে নিয়ে চলল। ওই দিনই দিল্লীর টিকিট কেটে আমরা ট্রেনে চড়ে বসলাম। ওর শান্ত, নম্র, মিষ্টি কথায় আমি যেন মনে একটু ভরসা পেলাম।

ট্রেন খুব স্পীডে ছুটে চলেছে। আমি জানলার দিকে পিঠ রেখে বসেছিলাম। ও আমাকে সেই আশ্রমের সুন্দর ব্যবস্থার কথা শোনাচ্ছিল। একটু পরে ও একটু চিন্তিত হয়ে বলল, আরে একটা কথা তো আমার এতক্ষণ মনে হয় নি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কী কথা?

ও বলল, ওই আশ্রমের নিয়ম, যে আশ্রমে থাকবে তার কোলে দুধের বাচ্চা থাকলে চলবে না। খুকী, ওই সময় তোকে আমি দুধ খাওয়াচ্ছিলাম। আমি শঙ্কিত দৃষ্টিতে তোর দিকে চেয়ে বললাম, তা হলে?

সে বলতে লাগল— সামনের স্টেশনে আমার এক আত্মীয় থাকে। তুমি যদি বল তা হলে তোমার মেয়েকে ওদের কাছে রেখে আসতে

পারি। যখন ও দুধ ছাড়বে তখন ওকে নিয়ে আসা যাবে। ওর কথা শুনে আমার বড় ভয় করতে লাগল। আমার মন অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল। কিন্তু নানান ছল-চাতুরি করে আমাকে রাজি-করিয়ে নিল। এরপর ও সামনের স্টেশনে নামল। আমাকেও নামতে বলল। স্টেশন থেকে টাঙ্গা ভাড়া করে আমরা একটা গ্রামে গিয়ে পৌঁছলাম— ওই গ্রাম হল দীওয়ানপুর। সেটা অবশ্য পরে বুঝতে পেরেছিলাম।

আমাকে এই গ্রামের ধারে একটা গাছের নীচে বসিয়ে রেখে ও চলে গেল। একটু পরে ফিরে এসে বলল, আমার আত্মীয়ের কাছে তোমার মেয়েকে রাখার কথা বলে এসেছি। তুমি তোমার মেয়েকে নিয়ে ওই ঢিবিটার দিকে যাও। সবচেয়ে বড় ঢিবির নীচে গিয়ে দেখবে একটা ঝোঁপ আছে। ওই ঝোঁপের পাশে মেয়েটিকে রেখে এস। ওরা এসে ওখান থেকে মেয়েটিকে নিয়ে যাবে। ওদের সামনে যাওয়াটা তোমার ঠিক হবে না।

আমার তখন মাথার ঠিক ছিল না। আমাকে দিয়ে সে তার নির্দেশমত সব কাজ করিয়ে নিল। কিন্তু আমি পরে জানতে পেরেছিলাম, ওটা ছিল ওর চালাকি। তোকে কোথাও রাখার জন্য ও কোন ব্যবস্থাই করে নি।

এরপর সে আমাকে ভরসা দিয়ে বলল, কিছুদিন পরে বাচ্চা একটু বড় হয়ে উঠলে ও তাকে আমার কাছে এনে দেবে। আমার এখন মনে হয় সে ওকথা বলে সেদিন আমাকে ভরসা না দিলে হয়তো আমি ওখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়তাম।

দিল্লী পৌঁছে আমরা এক বিরাট বাড়ির সামনে গিয়ে নামলাম। বাড়িটি বেশ দামী আসবাবপত্রে সাজানো। সে আমাকে বলতে লাগল— এটা আমার এক বন্ধুর বাড়ি।

রাত্তির বেলা একজন ঝিকে আমার সঙ্গে দিয়ে ও চলে গেল। আর বলে গেল— ভোরবেলা এসে তোমাকে বিধবা আশ্রমে নিয়ে যাব।

রাত্তিরটা ভালভাবেই কাটল। কিন্তু তোর কথা মনে হতেই

আমার মনটা উতলা হয়ে উঠতে লাগল। সারারাত আমার ঘুম এল না। ঝিটি সারারাত ধরে আমার খুব সেবাযত্ন করল, কিন্তু আমার চোখের জল কিছুতেই বাগ মানল না।

সকালবেলা আমি স্নান সেরে ফিরে দেখলাম এক বুড়ি কুটনি—দেখে মনে হয় আগে নিজেও বেশ্যাবৃত্তি করত— আমার ঘরে এসে বসে আছে। আমি কিছু বলার আগেই ও বলল, বেটী, রাতে কোন অসুবিধে হয় নি তো? আমি তো কাজকর্মের চাপে আর কাল বেরুতেই পারি নি। তবে এই যে বুড়ি ঝিটা দেখছ, খুব ভাল লোক; কাজের লোক। আমি ওর কথা শুনে খুব অবাক হয়ে গেলাম। ওর আপাদমস্তক ভাল করে তাকিয়ে দেখে বললাম, এটা আপনার বাড়ি?

—হাঁ মেয়ে, সবই আল্লার কৃপা।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, লালাজী এখনও আসেন নি? ও বলল, কোন্ লালাজী?

আমি বললাম, ওই যে যিনি আমাকে বিধবা আশ্রমে নিয়ে যাবেন বলে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন।

আমার কথা শুনে বুড়ি হাসতে হাসতে বলল, বেটী, এই বাড়িতে কত যে লালা আর শেঠেরা আসে তার ইয়ত্তা নেই। এখানে প্রতিদিনই অমন হাজার হাজার লোক যাচ্ছে আর আসছে। তবে আমি বুঝতে পেরেছি তুমি কার কথা জিজ্ঞাসা করছ। যে তোমাকে আমার কাছে দিয়ে গেছে তার কথা তো? ও তো কাল রাতের গাড়িতেই বাড়ি চলে গেছে। ওর সঙ্গে আমার যে দরদস্তুর ঠিক হয়েছিল তা চুকিয়ে দিয়েছি। বেটী, ও তোকে একেবারে বিধবা আশ্রমে ভরতি করে দিয়ে গেছে আর কোথাও নয়, তাই না? আরে তুই যাকে বিধবা আশ্রম ভাবছিস সেটা তো একটা বিরাট ধাপ্পা। এটাই তো আসল বিধবা আশ্রম। এখানে আমাদের দেশের হাজার হাজার লাখ লাখ বিধবা এসে থাকে আর ফূর্তিতে জীবন কাটায়।

ওর কথা শুনে আমি কাঠ হয়ে গেলাম। কিন্তু এখন করারই-বা আছে কী। আমি অনেক কান্নাকাটি করলাম। কদিন ধরে অন্নজল

স্পর্শ করলাম না। কিন্তু এতে কারুর মন ভিজল না। বুড়ি দিনরাত আমাকে লালসা আর রঙিন সুখী জীবনের লোভ দেখিয়ে আমার মনকে দুর্বল করে দেবার চেষ্টা করতে লাগল। এতেও আমার মন নরম করতে না পেরে বুড়ি আমার পরিচর্যার জন্য একটি মেয়েকে ঠিক করল। মেয়েটি দিনরাত আমার সেবাযত্ন করতে লাগল। পরে ওই-ই আমাকে এই পথে নিয়ে এল। আমি আমার সঙ্কল্পে অটল থাকতে পারতাম কিন্তু ও আমাকে তার জীবন-কাহিনী শোনাল। সে বলল, ও বামুনের মেয়ে। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে-বউ। কিন্তু এই সমাজ তার ওপর এমন ঘৃণ্য ব্যবহার আর অন্যায় করেছিল যে, আমার মন শেষে নরম হয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত আমি আমার মান-সম্মান সব খুইয়ে এই ঘৃণ্য পেশা গ্রহণ করার জন্য নিজেকে তৈরি করলাম।

এরপর আমিও তাকে আমার সব কথা খুলে বললাম। মনে হল, আমার কথা শুনে সে যেন বিচলিত হয়ে উঠেছে। আমাকে আরও নীচে নামাবার পক্ষে সমস্ত যুক্তিই যেন সে পেয়ে গিয়েছে। সে বলতে লাগল—আরে তুই এই-সব লোকের জন্যে এমন ছটফট করছিস, যেন জলের মাছকে ডাঙ্গায় তোলা হয়েছে। যারা তোকে বিনা অপরাধে স্বর্গ থেকে মাটির ধুলোর ওপর আছড়ে ফেলে দিয়েছে সেই-সব লোক আর এই সমাজ সম্পর্কে আমার এই প্রতিজ্ঞা যে, আমি এই সমাজের নাক কান কেটে থালায় রেখে থালার চারদিকে প্রদীপ জ্বালিয়ে পাড়ায় পাড়ায় দেখিয়ে বেড়াব।

সেদিন থেকে আমার যা-কিছু ধর্ম মান-মর্যাদা যেটুকু তখনও অবশিষ্ট ছিল তা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। গুরদেই পরিণত হল অনবরজানে। সেই দিন থেকে নাচ-গান শিখতে শুরু করলাম। বিধাতা আমাকে প্রথম থেকেই রূপ দিয়েছিলেন। কিছু দিনে মধ্যেই আমি এই কাজে এত পাকাপোক্ত হয়ে উঠলাম যে আমার নামে বহু লোকের ঘুম টুটে গেল।

—খুকী! আজ তুই এই সমাজের অবস্থা একবার দেখেছিস? যখন আমি হিন্দু সমাজের এক পবিত্র নিষ্কলঙ্ক কুমারী মেয়ে ছিলাম

তখন এই সমাজ আমাকে জুতোর ঘা মেরে মেরে ইঁদুরের মত এক কোণে ফেলে রেখেছিল। আর আজ? আজ আমি মুসলমান। আজ আমি বেশ্যা। আজ ওই সমাজ, আর তার ধারক ও বাহকেরা যারা নিজেদের সভ্যতা ও ধর্মের ধ্বজাধারী বলে জাহির করে থাকে আজ আমার বাড়ি এসে আমার জুতো চাটে। এটাকেই তারা এখন তাদের ইজ্জৎ বলে ভাবে। অন্যভাবে বলতে পারি যখন আমি সমাজের এক নীরোগ ও সুডৌল অঙ্গ ছিলাম তখন সমাজই আমাকে নিজের থেকে আমাকে ভেঙে চুরমার করে আবর্জনার স্তূপে নিক্ষেপ করেছে। আজ আমি ওই সমাজেরই নোংরা পচা অংশ—যার মধ্যে পোকা থিক থিক করছে। যার দুর্গন্ধে সুস্থ মানুষেরও কুষ্ঠ রোগ হয়। সেই নোংরায় চুমু খাবার জন্য, চাটার জন্য, মাথায় করে রাখবার জন্য এই সমাজ লোভাতুর দৃষ্টিতে উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে।

জানিস মা, এই যে এত ধূমধাম করে কার বিয়ে হচ্ছে? এ আমার সৎছেলের বিয়ে। তুই যদি আধঘণ্টা আগে আসতিস তোকে একটা মজার তামাশা দেখাতাম। ওই করমচাঁদ বরের দাদা—আমার সৎ ছেলে, যে একদিন রুটির জন্য আমাকে মারতে মারতে আধমরা করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল—কেননা আমি এক রাত এক মুসলমানের বাড়িতে ছিলাম। ওই ছুতো করে সে ওখানে আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। আজ সেই করমচাঁদ এখানে এসেছিল। তার সঙ্গে সেই পণ্ডিতজীও ছিল। শুনতে চাস ওরা কীজন্য এসেছিল? করমচাঁদ এসেছিল তার নিজের মায়ের সঙ্গে প্রেমলীলা করতে। এক বেশ্যার পায়ে মাথা রেখে তার প্রেম ভিক্ষা করতে। আর ওই বুড়ো বদমায়েস পণ্ডিতটা—যে মেয়ে মেয়ে বলে আমাকে মুখে আদর দেখাত আর পরে যে পাপী লোকটা আমাকে তোর বাবার [তারাচাঁদের] কাছে বেচে দিয়ে নিজের যজমান কন্যার ভালবাসার উপযুক্ত প্রতিদান দিয়েছিল। তুই যদি একবার ওদের সেই-সব প্রেম-নিবেদনের ভাষা শুনতিস—'আহা মরি, মরি' 'চোখে চোখে রাখি' 'হায় তোর রঙ্গরস সব লুটেপুটে নিয়েছি!' এই-সব কথা।

যদি শুনতিস কেমন করে ছেলে তার মাকে আবার বাবা মেয়েকে প্রেম নিবেদন করছে, তা হলে আমার মনে হয় তুই মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে যেতিস। যদি কাল দেখা হবে বলে ওদের আজ সরিয়ে না দিতাম তা হলে ওরা আজ কিছুতেই আমার বাড়ি থেকে নড়ত না।

তুই কি আরও শুনতে চাস, আমি এখানে কেন এসেছি? কীজন্য এসেছি?

আমি কি খালি এখানে মুজরো করতেই এসেছি? এই লোকদের সঙ্গে? না, আমি এমন কাজ কখনও করি না। আমি এখানে এসেছি একটা মতলব নিয়ে। যা পূর্ণ না হলে আমার কাছে খাবার হারাম বলে মনে হবে। সুন্দরী, মা, আমার শোন, আমি এই দুজনের রক্ত পান করার জন্য এখানে এসেছি। এইজন্য আমি অনেক দিন ধরে এই বিয়ের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এই কাজটা পাওয়ার জন্য আমি দুজন দালাল লাগিয়ে রেখেছিলাম। আর ওই তিন নম্বর কসাই যে আমাকে বেশ্যাদের কাছে বেচে দিয়েছিল ওকে তো কবেই ঠিক করে দিয়েছি। আজ পর্যন্ত এ কথা কেউ জানে না। সে অনেক কথা। ওকে কীভাবে খতম করা হল সে কথা বলে তোর নরম মনে আর আঘাত দিতে চাই না। হ্যাঁ, আর একটা ইচ্ছে আছে। যা আমি বুকে বেঁধে মরতে চাই। আমি ওই কসাই [তারাচাঁদ]-এর রক্তে আমার হাত রাঙাতে চাই। কিন্তু বড় আফসোসের কথা, হাজার চেষ্টা করেও আমি তার নাগাল পাচ্ছি না। যদি একবার ওকে পেতাম··· ।

এর চেয়ে বেশি শোনার শক্তি সুন্দরীর ছিল না। ওর সারা শরীর পোড়া কয়লার মত ধিকি ধিকি জ্বলছিল। বচন সিং-এর উপদেশ শুনে ওর ধ্যান-ধারণা অনেকখানি বদলে গিয়েছিল। কিন্তু এখন ওর মন থেকে সেই উপদেশের কথা একেবারেই উড়ে গেল। যেমন করে মানুষ ছোট চারা গাছকে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে কিন্তু একদিন ঝড়ের এক ধাক্কায় সে গাছ উপড়ে পড়ে। ওর মনে হল পায়ের নীচে মাটি দুলছে। বাড়ির সমস্ত জিনিসপত্র ওর ডাগর ডাগর চোখের সামনে বোঁ বোঁ করে ঘুরছে।

অনবরজানের কথা শুনতে শুনতে সুন্দরী উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াল। সে বলল, মা, আমি ওর রক্ত পান করব। আমি যদি তোমার মেয়ে হই তবে ওর রক্ত পান করে আমরা আমাদের মনের আগুন নেবাব। আমি এখন থেকেই ওকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করব। বলতে বলতে সুন্দরী ওখান থেকে উঠে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোন উন্মাদ ওকে ভর করেছে। সুন্দরী চলে যাবার পর অনবরজান নিশ্চল মূর্তির মত বসে রইল। ওর মনের মধ্যে নিজের বলা কথাটা গুন গুন করে উঠল।

আজকের ঘটনা তার কাছে স্বপ্ন বলে মনে হল।

সুন্দরী নীচে নেমে দেখল বচন সিং তার অপেক্ষায় এদিক-ওদিক পায়চারি করছে। রাত দু-প্রহর কেটে গিয়েছে। বচন সিং যখন সুন্দরীকে নিয়ে বাড়ি পৌঁছল তখন তৃতীয় প্রহর শুরু হয়ে গিয়েছে।

॥ ২৭ ॥

বাড়ি পৌঁছে ওরা দুজন রাত্রির তৃতীয় প্রহরটি কথাবার্তা বলেই কাটিয়ে দিল। ঘরে এসে ল্যাম্পের আলোয় বচন সিং সুন্দরীর চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেল। ওর চোখ থেকে আগুন ঝরে পড়ছে। ওর ঠোঁটের কোণে এক ভয়ংকর আর হিংস্র হাসির রেখা ফুটে উঠেছে।

সে অতি দ্রুত উঠে সুন্দরীর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, সুন্দরীজী কী ব্যাপার?

—কিছু না। ঠিক আছে।

এই কথা বলে সুন্দরীর মনে হল, তার মনের কথা বচন সিং তার চেহারা দেখে কিছুটা অনুমান করার চেষ্টা করেছে। সে সর্বশক্তি দিয়ে তার হৃদয়ের তুফানটাকে থামাবার চেষ্টা করল। বচন সিং-এর

মন অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য সে বলল, আপনি বরযাত্রীদের কাছে গিয়েছিলেন ?

—না, আমি ঘরেই ছিলাম। সুন্দরীজী! আপনার চোখ লাল টকটক করছে। কী ব্যাপার বলুন তো? অনিদ্রার ছুতো করে আঙুলের ডগা দিয়ে চোখ রগড়াতে সুন্দরী বলল, এ সবই আপনার দয়ার ফল।

—কেমন করে ?

—আপনি যে এমন ধারা কাজই দিয়েছেন।

সুন্দরীর এই উৎসাহপূর্ণ উত্তরে বচন সিং বুঝতে পারল তার মনোবাসনা কিছুটা হয়তো পূর্ণ হয়েছে। তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য ও আবার জিজ্ঞাসা করল, হাঁ হাঁ, বলুন কি হল ?

—যে কাজে গিয়েছিলাম সেটাই হল।

—সফল হয়েছে ?

—পুরাপুরি।

—এটাই তো স্বাভাবিক।

—স্বাভাবিকের থেকেও বেশি।

—অর্থাৎ !

এর জবাবে সুন্দরী শুধু এই কথাই বলল, অনবরজান তাকে কথা দিয়েছে সে আর মুজরো করবে না।

বচন সিং বিশ্বাস করতে পারল না। সে সন্দেহভরা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল, সুন্দরীজী! মনে হচ্ছে, সে আপনাকে ধোঁকা দিয়েছে।

সুন্দরীর চোখে মুখে দৃঢ়তার ছাপ ছিল। সে আবার বলল, হ্যাঁ, ও আর মুজরো করবে না। আপনি জানতেই পারবেন।

সুন্দরীজী! সে যদি আর না নাচে তা হলে আমি বুঝব আপনি অসাধ্য সাধন করেছেন। ধরুন, সে যদি সকালে মুজরো নাই করল কিন্তু বরযাত্রীরা তো পরশু চলে যাচ্ছে। আপনার চেষ্টা করতে হবে যতদিন ও দীওয়ানপুরে থাকবে ততদিন যেন মুজরো না করে।

সুন্দরীর ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠল। সে বলল, আমি এর চেয়েও বড় প্রতিজ্ঞা তাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছি।

—কী?

—ও যতদিন বেঁচে থাকবে, এ কাজ আর করবে না। আমার মনে হচ্ছে সে এই পেশা চিরকালের জন্য ছেড়ে দেবে। মনে করবেন, কালকের মুজরোই ওর জীবনের শেষ মুজরো।

—এ কেমন করে সম্ভব হতে পারে সুন্দরীজী?

বচন সিং-এর সন্দেহ হল সুন্দরী হয়তো তার সঙ্গে মজা করছে। সে সুন্দরীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, শেয়ালকে মড়া খাওয়ান ছাড়িয়ে তাকে শাকাহারী বানানো এক অসম্ভব ব্যাপার।

সুন্দরী ওকে আশ্বস্ত করল। কিন্তু সেই সঙ্গে যে-সব ঘটনাগুলি ঘটেছিল সে-সব কথা কিছু ভাঙল না। তার মায়ের কাছে ও যে প্রতিজ্ঞা করে এসেছিল সে সম্বন্ধেও কিছু বলল না। বচন সিং যদি একবার জানতে পারে তা হলে সে তাকে ঠাট্টা করবে আর তাকে প্রতিজ্ঞাচ্যুত করবে।

বচন সিং আনন্দের চোটে যেন পাগল হয়ে গেল। সুন্দরীর হাতেই প্রথমে এতবড় সাফল্য।

সে বিগলিত হয়ে বলল, সুন্দরীজী। তা হলে তো আমাদের কাজ পুরোপুরি সফল হবেই। প্রিয়তমের কথায় সায় দিয়ে সুন্দরী বলল।

—না, বলুন, এই কাজে আমরা ইতিমধ্যেই সফল হয়ে গেছি।

—সুন্দরী, আমরা দু-জন কি এক হয়ে যাব?

—এক তো হয়েই গিয়েছি।

—না, সুন্দরীজী, আমরা এখনও দুই। এদিক থেকে আমাদের সাফল্য এখন অনেক দূরে। এখনও আমরা সাফল্যের পথে এক পাও এগিয়ে যেতে পারি নি।

—কী বললেন, আমরা এখনও আলাদা? না। আমরা চিরকালের জন্য এক। এই একতা চিরকাল অটুট অমর হয়ে থাকবে।

—আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে যদি দেখেন তাহলে এই কথা ঠিক। কিন্তু সুন্দরীজী! সমাজের দৃষ্টিতে আমরা কিন্তু এখনও এক নই।

সুন্দরী আদর করে বচন সিং-এর হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে

বলল, সমাজ ? কোন্ সমাজের কথা আপনি বলছেন ? আপনি কি সেই সমাজের কথা বলতে চাইছেন, যে সমাজের চোখে ধূর্ততা, ঈর্ষা, শয়তানীর রোগে ছানি পড়েছে ? এই সমাজের চোখে আমরা যদি এক না হই, তা হলে কি সত্যি আমরা এক নই ?

এই সমাজের চোখে যদি এককে দুই দেখায় তা হলে দোষ ওই চোখেরই যা কোটি জন্ম ধরেও নিরাময় হবে না। সমাজ···আপনি কি এই সমাজকে মনুষ্য সমাজ বলে মনে করেন ? কিন্তু আমি···

কথা বলতে বলতে সুন্দরীর মুখ লাল হয়ে উঠল। সে জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে লাগল।

ওর এই অবস্থা দেখে বচন সিং খুব ভয় পেয়ে গেল। যখন সে ভাল করে সুন্দরীর মুখ বিশেষ করে তার চোখের দিকে তাকাল তখন ওর সন্দেহ হল ও পাগল হয়ে যায় নি তো ?

কথায় আছে, যে-সব রোগকে শিবের অসাধ্য রোগ বলে সে-সব রোগ সহজে সারে না। হয়তো কোন ভাল ডাক্তারের হাতে পড়লে কিছুটা উপশম হয় কিন্তু নিয়ম মেনে না চললে আবার নতুন করে উপসর্গ দেখা দেয়। সুন্দরীর অবস্থাও ঠিক ওই রকম। বচন সিং অনেক চেষ্টা করে তাকে ভ্রান্ত পথ থেকে সরিয়ে ন্যায়ের পথে আনার জন্য তার মনকে তৈরি করেছে। এই পথে সে এখনও এসে পৌঁছায় নি বটে কিন্তু অনবরজানকে নিয়ে তার জীবনের নতুন অধ্যায় তার সমস্ত চিন্তাধারাকে আবার পুরনো পথে পৌঁছে দিল। বচন সিং সুন্দরীর হাত ধরে ঝাঁকিয়ে বলল, সুন্দরীজী, আজ আপনার কি হয়েছে বলুন তো ? আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে হিংসার এক প্রতিমূর্তি।

তারপর তার মনে হল, এই ব্যাপারে বেশি কিছু জিজ্ঞাসা করলে সুন্দরী হয়তো নিজেকে সামলাতে পারবে না। এই কথা ভেবে সুন্দরীর মনের গতি পরিবর্তনের জন্য সে বলল, এ-সব কথা ছাড়ুন। হ্যাঁ, সুন্দরীজী, সত্যি কথা। এবার আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী ঠিক করে ফেলা উচিত। এবার কি করবেন ভাবছেন ?

ইতিমধ্যে সুন্দরী নিজেকে সামলে নিয়েছে। নিজের দুর্বলতার

জন্য তার অনুতাপ হচ্ছিল। যে কথার বিন্দুমাত্র আভাস সে বচন সিংকে দিতে চায় না নিজের ব্যবহারে সেই কথা হয়তো প্রকাশ পেয়ে যেত। সে ভাবল এ ব্যাপারে বেশি কথা বললে কী জানি, কি আবার মুখ ফসকে বেরিয়ে যাবে। সুন্দরী এই প্রসঙ্গ চাপা দেওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করল। বচন সিং-এর কথার সে জবাব দিল—আপনি কিন্তু আগের চিঠিতে লিখেছিলেন, যে আপনি কখনও দূরে চলে যেতে পারেন না। কিন্তু এই অবস্থায়…।

—ঠিক আছে। কিন্তু যতদিন এখানে আছি, ততদিন কোন-না-কোন কাজ তো চালিয়ে যেতে হবে। সুন্দরীজী! প্রথম কাজে আপনার সাফল্য দেখে আমার মনে খুবই ভরসা এসেছে। এ সাফল্য আপনার সাহসিকতারই ফল। যে কাজ আমি কয়েক সপ্তাহ ধরে পরিশ্রম করে করতে পারি নি সে কাজে আপনি একবার গিয়েই সাফল্য অর্জন করেছেন। এইজন্য আমি বলছিলাম কি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব…

সুন্দরী বলল, আমি কিছুই করি নি। যেটুকু সামান্য কিছু করেছি তা আপনার শিক্ষা ও সাহচর্যের ফল। নয় তো এই বাঁদরীর আর কতটুকু ক্ষমতা বলুন। হ্যাঁ, আপনি যেন কী বলতে চাইছিলেন?

—আমি যা বলতে চাই তা শুনে কিছুক্ষণ আগে তো আপনার শরীর খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

—তার মানে?

—মানে, আমাদের বিয়েটা হয়ে যাওয়া দরকার। তা হলে আমাদের মনোগত অভিপ্রায় পূরণের কাজে আমরা পুরোপুরি নেমে পড়তে পারব।

সুন্দরী একটু সলজ্জ হেসে বলল, এ ছাড়া কি আমাদের মনোরথ পূর্ণ হবে না বলতে চান?

—না সুন্দরীজী। এ ছাড়া আমাদের সঙ্কল্প সফল হওয়া অসম্ভব।

—কিন্তু আমি তো অসম্ভব বলে বুঝতে পারছি না।

—তা হলে আপনি কি ভাবছেন বলুন।

—আমার মত হল, আমাদের দু-জনের কিছুদিন আলাদা থেকে

কাজ করা উচিত। তারপর আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেলে যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় আমরা এক হয়ে যাব।

—সুন্দরীজী, আপনার কথা শুনে আমার ভয় হচ্ছে। আপনার কথা আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

—প্রেমের পথে ভয়ের কি কোন দাম আছে? আপনার মুখে এ তো বড় অদ্ভূত কথা শুনছি। আমার কথার মানে হল—

বলতে বলতে সুন্দরী চুপ করে গেল। বচন সিং আরও বিচলিত হল। সে বলল, হ্যাঁ, কি মানে?

—আমি বলতে চাই যে আপনি কিছুদিনের জন্য আমাকে ভুলে যান।

—আপনাকে ভুলে যাব? বচন সিং ফস করে বলে ফেলল, সুন্দরীজী, আপনি এ কী বলছেন? অনবরের বাড়ি যাবার আগে তো আপনার মুখে এমন কথা শুনি নি।

—হ্যাঁ, ভুলে যান। সুন্দরী বলল, যদি আমাকে ভুলতে না পারেন তা হলে আমার স্মৃতিকে সুন্দরী জ্ঞানে নিজের হৃদয়ের মধ্যে রেখে দেবেন।

বচন সিং-এর চোখ ভরে জল এল। সে বিহ্বল হয়ে সুন্দরীর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিল—সুন্দরীজী! ভগবানের দোহাই, এরকম কথা বলবেন না। আমার ওপর দয়া করে আমার মানসিক অবস্থাটা একবার বোঝার চেষ্টা করুন।

সুন্দরী বচন সিং-এর হাত দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল আর মনের দুঃখ চেপে বলল, আপনি এ কী বলছেন। আমি আপনার। শুধু আপনার। চিরদিনের জন্য আপনার।

চোখের জল ফেলে আমার ধৈর্যের বাঁধ এমন করে ভেঙে দেবেন না। আমার প্রতিজ্ঞা যেন না ভাঙে।

বচন সিং-এর মনের আগুন নেবাবার জন্য সে সময় সুন্দরীর কাছে যত জল ছিল তা সব নিঃশেষে উজাড় করে দিল। সে সময় সুন্দরী যেন আগুন দিয়ে আগুন নেবাভার চেষ্টা করছিল। সে সময় ওর নিজের মনের আগুন নেভাতেও জলের দরকার ছিল। কিন্তু অন্যের

কাছে জল নেই শুধুই আগুন। এর পরিণাম হল ঠিক সেই রকম. এক বাড়িতে আগুন লেগেছে অথচ আগুন নেবাবার দমকলটাই জ্বলছে।

বচন সিং আবার বলল, সুন্দরীজী, আমাকে আজেবাজে কথা বলে বোঝাবার চেষ্টা করবেন না। আপনার মনের কথা খোলাখুলি ভাবে আমাকে বলুন।

সুন্দরী জোর করে হাসার একটু চেষ্টা করল। বলল, আমি পরিষ্কার করেই বলছি। শুধুমাত্র আমার জন্য আজ পর্যন্ত আপনাকে যে-সব বিপদের মধ্যে পড়তে হয়েছে তা আমার অজানা নয়। যদি বিপদ এখানেই কেটে যেত তা হলে হয়তো আমি সব-কিছু মেনে নিতাম কিন্তু আমি দেখছি আমার জন্য আপনাকে অনেক রকম বিপদ ও দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করতে হবে। এইজন্য আমি চাই যে আপনি কিছুদিনের জন্য আমার কাছ থেকে নিজেকে আলাদা করে সরিয়ে নিন। যতদিন পর্যন্ত আপনার মা বেঁচে আছেন আপনি তাঁর সেবা করুন। আপনি বিয়ে করুন। ঘরে বউ এলে আপনার মা সব দুঃখ ভুলে যাবেন।

বচন সিং-এর বুকে যেন তীর এসে বিঁধছিল। সে এক হাতে নিজের চোখ ঢেকে অন্য হাত দিয়ে সুন্দরীকে চুপ করতে ইশারা করল। সে বলল, ব্যস, ব্যস, সুন্দরীজী! ভগবানের দোহাই, আপনি চুপ করুন আর বলবেন না। আপনাকে ছাড়া আর কাউকে যদি বিয়ে করতে হয় তা হলে বুঝবেন তার অর্থ হবে আমার মৃত্যু। এর বেশি আমি কিছু বলতে পারব না। শুনতেও পারব না।

সুন্দরীর কানে এ-সব কোনো কথাই যাচ্ছিল না। সে কোন্ এক গভীর চিন্তায় ডুবে ছিল। বচন সিং সে সময় ওকে আর কিছু বলা যুক্তিযুক্ত মনে করল না। সে যাবার জন্য তৈরি হল। সে ভাবছিল, কোনো সময় সুন্দরীর মেজাজ যখন ভাল থাকবে তখন সে তার মন থেকে এই ভুল ধারণা দূর করবার চেষ্টা করবে। এদিকে সুন্দরী ভাবছিল কী ভাবে এমন একটা উপায় বার করা যায়, যাতে করে বচন সিং-এর সঙ্কল্পও পূর্ণ হয় আর বচন সিং তার সঙ্গে শুধু আধ্যাত্মিক সম্পর্ক বজায় রেখে একটি ভাল পরিবারের মেয়ে দেখে বিয়ে করে বাকী জীবনটা সুখে-শান্তিতে কাটিয়ে দিতে পারে।

অন্ধকার কেটে গিয়ে ধীরে ধীরে ভোরের আলো ফুটছিল। শেষ রাতটা কোথা থেকে কেটে গেল। বচন সিং উঠে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল। সুন্দরী সোহাগভরা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল : যাচ্ছেন বুঝি ?

—আমি অন্য কোনো সময় আপনার মন থেকে এই-সব আজে-বাজে চিন্তা দূর করার চেষ্টা করব। ভগবান করুন, আমার এই সঙ্কল্প যেন সফল হয়। বচন সিং তার নিজের ঘরে চলে গেল। সুন্দরীর বিনিদ্র চোখ জুড়ে শুধু অনবরজানের ছবি। কখন যে তার চোখে ঘুম নেমে এল সে নিজেই জানে না।

॥ ১৮ ॥

তিন প্রহর ধরে অনিদ্রার পর রাত্রির চতুর্থ প্রহরের ঠাণ্ডা বাতাসে সুন্দরীর চোখ ঘুমে ভরে এল। কিন্তু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখল। কে যেন ওকে ঘুম থেকে তুলে এক রক্তাক্ত দুনিয়ার সামনে ফেলে দিয়ে গেছে। এখানকার মাটি, আকাশ, চাঁদ, সূর্য সব-কিছু রক্ত দিয়ে তৈরি। ওর চোখ-কানের ভেতর দিয়ে কে যেন ওর মগজের ভেতর ছুরি, কাটারি, বর্শা প্রভৃতি ধারালো অস্ত্র ঢোকাচ্ছে। মাটির ওপর চাপ চাপ রক্ত। গাছে বসা পাখিগুলিও রক্ত রক্ত বলে গান গাইছে। নদী কুয়া আর পুকুরের সমস্ত জল রক্ত হয়ে গেছে। ও যেখানেই যাচ্ছে সেখান থেকে ভেসে আসছে বিলাপ ভরা সংগীত। তার কাপড়, চুল, চোখ, জিভ থেকে টপ টপ করে রক্ত ঝরে পড়ছে। সে রক্তের নদী দিয়ে এগিয়ে চলেছে। সে যেন আরও গভীরে নেমে যাচ্ছে সেখানে ছোট ছোট মাছ থেকে শুরু করে বড় বড় কুমীরের পেট পর্যন্ত রক্তে ভরা। তারা সকলেই মানুষের মত কথা বলছে আর রক্ত রক্ত বলে একে অন্যের পিছনে তাড়া করছে। শয়তান, শিকারী ও তার শিকার সকলের মুখেই একটি মাত্র শব্দ—রক্ত, রক্ত, রক্ত।

সুন্দরী বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছিল যে সে এক খুনী নদীর ভিতরে তলিয়ে গেছে। তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। সে ভয় পেয়ে এক অস্ফুট চীৎকার করে উঠল। কিন্তু তার চীৎকার মুখ থেকে বেরুবার আগেই ভেতরে কোথায় চাপা পড়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি পাশ ফিরল আর দেখল তার দু-হাত বুকের ওপর রাখা। ঘরে সূর্যের আলো এসে পড়ে চিক চিক করছে। সুন্দরীর মনে হচ্ছিল ভোর-বেলার সেই রোদ্দুরের রঙ হলুদ না হয়ে লাল রঙের মত। তখনও পর্যন্ত ওর কানে ভেসে আসছে সেই অদ্ভুত আওয়াজ— রক্ত, রক্ত।

সুন্দরী চোখ মেলল। কিন্তু সে ভয় পেয়ে আবার চোখ বন্ধ করে ফেলল। রক্ত! রক্ত! সেই আওয়াজ এসে এখনও পর্যন্ত তার কানের পর্দা যেন ফাটিয়ে ফেলছে। সে আবার চোখ খুলে চারপাইয়ের ওপর বসে পড়ল। বেলা বেশ বেড়ে গিয়েছে। ওর মনে হল সারা বাড়িটা যেন জনতা ঘিরে ফেলেছে আর চারিদিক থেকে চীৎকার উঠছে, রক্ত, রক্ত। ও তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সারা গ্রামের লোক বচন সিংকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। পুলিশ বচন সিং-এর হাতে হাতকড়ি পরিয়ে দিয়েছে। ওর মা কাঁদতে কাঁদতে প্রায় বেহুঁশ হয়ে পড়েছে। এক দিক থেকে কার গলা শোনা গেল— বচন সিং তিন-তিনটা খুন করেছে। এক বেশ্যাকে, এক বুড়ো পণ্ডিতকে আর বরের ভাই করমচাঁদকে।

—তিন-তিনটে খুন! বচন সিং করেছে? সুন্দরীর চোখের সামনেটা অন্ধকারে ছেয়ে গেল। বচন সিংকে পুলিশ থানায় নিয়ে চলল।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সুন্দরী যেন বেহুঁশের মত এগিয়ে চলল। কোন রকমে ভীড় বাঁচিয়ে এগিয়ে গিয়ে সে বচন সিংকে জড়িয়ে ধরল আর চীৎকার করে তার পায়ের নীচে আছড়ে পড়ল। জনতা এগিয়ে গেল। সুন্দরী সেখানেই পড়ে রইল।

বচন সিং-এর কাছেও সমস্ত ঘটনা স্বপ্নের মত মনে হচ্ছিল। কিন্তু সুন্দরীর অবস্থা দেখে ওর মনটা একেবারে ভেঙে গেল। সে কয়েকবার পিছনে তাকিয়ে দেখল— দু-একবার থামার চেষ্টা করল কিন্তু সিপাহীদের ধাক্কার চোটে তাকে আবার এগুতেই হল।

সারা গ্রামে এই খবর ছড়িয়ে পড়ল যে— বচন সিং এক রাত্রে তিন-তিনটে খুন করেছে।

কিছুক্ষণ পরে যখন সুন্দরীর জ্ঞান ফিরল তখন দেখল কাদা মাখা অবস্থায় সে পড়ে আছে। সে রবানী গ্রামে নিজের ঘরেই শুয়ে। রবানী গ্রামের কিছু লোক তাকে অচৈতন্য অবস্থায় তুলে এখানে পৌঁছে দেয়— তার পাশে একজন বসে ছিল। সুন্দরী উঠে বসল। এই সময় কী জানি কোথা থেকে তার কানে একটি আওয়াজ ভেসে এল— বচন সিং তিন-তিনটে খুন করেছে।

সুন্দরী চোখে অন্ধকার দেখল। তার মনে হল তার মাথায় কে যেন বোমা ফাটাচ্ছে।

প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে সে ওই অবস্থায় পড়ে রইল। তার চিন্তা করবার মত আর মানসিক অবস্থা ছিল না। একটু পরে ওর মাথা ঘুরতে লাগল আর সে আবার জ্ঞান হারাল।

কেউ জানে না, সে কতক্ষণ এই অবস্থায় পড়েছিল। যখন ওর দ্বিতীয়বার জ্ঞান ফিরল তখন স্বপ্নের ঘোরে বচন সিং-এর গ্রেফতারের খবর শোনার সময় ওর যেমন মনে হচ্ছিল এখনও ঠিক তেমনি মনে হতে লাগল।

সে পাগলের মত পড়ি কি মরি করে উঠে দীওয়ানপুরের রাস্তা ধরে চলতে শুরু করে দিল। কেউ তাকে থামাতে পারল না। রাস্তা দিয়ে একটা টাঙ্গা যাচ্ছিল সে তার ওপর উঠে পড়ল।

বচন সিং-এর বাড়ি পৌঁছে সে দেখল বচন সিং-এর মা চারপাই-এর ওপর বেঁহুশ হয়ে পড়ে আছে। কজন পাড়াপড়শী তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনার জন্যে চেষ্টা করছে।

সুন্দরী পাগলের মত সবাইকে দেখতে লাগল। কিন্তু তাকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করল না। সেও কাউকে কিছু বলল না। ঠিক সেই সময় বচন সিং-এর মা চোখ খুলল। সুন্দরী দৌড়ে তার কাছে গেল।

সুন্দরীকে সামনে দেখে বচন সিং-এর মা সদাকৌরের মুখ রাগে লাল হয়ে গেল। ওকে হাত দিয়ে দূরে সরিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, চলে যা এখান থেকে মুখপুড়ী কুকুর। আমার সামনে থেকে সরে যা। যত ঝঞ্ঝাট তোর জন্যেই।

যেদিন থেকে আমার ছেলে তোর অপয়া মুখ দেখেছে সেদিন থেকে আমার ছেলেটা বয়ে গেছে। ওরে আবাগীর বেটী, তুই না এলে এমন করে আমার সোনার সংসার ছারখার হয়ে যেত না। দেখিস, ভগবান তোকে মরার পরও কি শাস্তি দেয়!

বলতে বলতে সদাকৌর এত রেগে গেল যে সে চারপাই থেকে উঠে সুন্দরীকে গালাগাল দিতে লাগল।

অন্য সময় হলে এই-সব কথা শুনলে না জানি সুন্দরী কি করত। কিন্তু ওই সময় সুন্দরী সব কথা নীরবে হজম করল— যেমন করে বনের বাঘ নিজের ধারে-কাছে একটা পাখিকেও ঘেঁষতে দেয় না কিন্তু সেই বাঘই চিড়িয়াখানায় খাঁচার ভেতর ভালুক কিংবা বাঁদরকে মুখ ভেংচাতে দেখলে চুপ করে সহ্য করে। সুন্দরী ওখান থেকে উঠে থানার দিকে চলল।

যেমন দেহে আচমকা পাথরের ঘা এসে লাগলে প্রথমটা ব্যথা ঠিক বোঝা যায় না। কিন্তু একটু পরে যখন ক্ষতটা ঠাণ্ডা হয় তখন মানুষ যন্ত্রণায় আকুল হয়ে পড়ে, রাস্তা দিয়ে চলার সময় সুন্দরীর মনের অবস্থা ঠিক এই রকম হল। "হায় হায় শেষ পর্যন্ত খুনের দায়ে" তার শুধু এই কথাটা বারবার মনে হতে লাগল। তার অবস্থাটা তখন সেই হরিণীর মত, যার সামনে কয়েকজন শিকারী

বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে, পিছনের জঙ্গলে আগুন লেগেছে। তার ডান দিকে নদী বইছে আর বাঁ দিকে জনবসতি।

সে যখন নতুন করে নিজের অবস্থাটা খতিয়ে দেখল তখন সে ভয়ে কেঁপে উঠল। তার প্রিয়তম যে তার কাছে এক সাম্রাজ্য, সে কী না আজ মিথ্যা খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়েছে। ওর বুড়ি মার যে আর কেউ নেই। যে-সব আত্মীয়স্বজন এসে সহানুভূতি দেখিয়ে নাকি কান্না কাঁদছে তারা সব বুরের লাড্ডুর মত অন্তঃসার-শূন্য। এর ওপর সারা গ্রামের লোক আগের থেকেই বচন সিং-এর শত্রু। এতে কোন সন্দেহ নেই যে তারা বচন সিং-কে খুনীই ভাবছে।

সুন্দরী দেখল যে সে এমন এক নৌকায় বসে আছে যার মাঝিদের কুমীর আক্রমণ করে কাবু করে ফেলেছে আর নৌকাটি এক ভয়ংকর ঘূর্ণিপাকে পড়ে লাট্টুর মত ঘুরছে। রোড়ুর সাহস ছিল কিন্তু ওই শয়তানেরা তাকে মেরে ফেলল। মাকে সে ফিরে পেয়েছিল কিন্তু অন্ধকার আকাশে বিদ্যুতের মত একবার মাত্র দেখা দিয়ে আবার তিনি চলে গেলেন। এবার সে বুঝতে পারল রবানী গ্রামে আর তাকে থাকতে দেওয়া হবে না। কারণ সারা গ্রাম পালা সিং আর তার পার্টিকে ভয় করে। এই জন্যই রবানী গ্রামের লোকেরা বচন সিং-এর চিন্তাধারাকে মেনে নিয়েও তাকে কোন সাহায্য করে নি। যারা এতদিন বচন সিং-এর হয়ে বড বড় কথা বলত তারা এখন জেনেশুনেও মুখ ঘুরিয়ে অচেনা লোকের মত চলে যাচ্ছে।

এই-সব কথা অনুমান করে সুন্দরী ভাবতে লাগল, এখন আমার এখানে থাকার কোন অর্থ হয় কিনা। থাকাটাও বিপজ্জনক: কিন্তু যাবই বা কোথায়? ঠিক এই সময় যখন প্রাণেশ্বর মৃত্যুর মুখে। দীওয়ানপুরের লোকেরা তো প্রথম থেকেই আমাকে ঘৃণা আর কামভরা দৃষ্টিতে দেখে আসছে।

ও আজ প্রথম অনুভব করল, স্ত্রীজাতি কত দুর্বল, কতখানি অসহায়।

সে এই-সব চিন্তায় ডুবে গেল। অনেক ভেবেচিন্তেও কোন

সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে পারল না। ওর সবচেয়ে দুঃখ এই যে সে নিজের প্রিয়তমকে কোন সাহায্য করতে পারল না। তার নিজের ওপর ঘৃণা হতে লাগল। আর মনে হল, যে আর কোন দুঃখ দেখবার আগে তার জীবনের যেন অবসান হয়। হয়তো এইভাবেই সে তার সমস্ত যন্ত্রণা আর দুঃখ থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু ওর ভেতরের কোন অদৃশ্য শক্তি তাকে আত্মহত্যা করতে দিল না। সে বার বার ভাবতে লাগল— আমার মা ভীষণ তাড়াহুড়ো করে এ কাজ করেছে। তার উচিত ছিল শত্রুদের হত্যা করে; আত্মহত্যা করার আগে একটি চিঠি লিখে যাওয়া। তা হলে আর এজন্য অন্যকে বিপদে পড়তে হত না।

এই-সব ভাবতে ভাবতে সুন্দরী থানায় গিয়ে পৌঁছল। বচন সিং-এর সঙ্গে দেখা করার জন্য সে অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু তার ভাগ্যে শুধু পুলিশের গালাগাল আর ধমক ছাড়া আর কিছু জুটল না। তার কাজ সফল হল না।

সারাদিন ধরে সে এইভাবে ঘোরাঘুরি করে কাটাল। সে গ্রামের কয়েকজন মুরুব্বি লোকের সঙ্গে দেখা করে তাদের কাছে বার বার অনুনয়-বিনয় করতে লাগল তারা যেন কেউ একবার পুলিশকে বলে তাকে বচন সিং-এর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেয়। সে যেখানে যেখানে যাচ্ছিল প্রত্যেক জায়গা থেকে সে শুধু দুটো জিনিসই উপহার পাচ্ছিল, বকুনি আর বিদ্রূপ। শেষ পর্যন্ত অনেক কান্নাকাটির পর সে সন্ধ্যাবেলা রবানী গ্রামে নিজের বাড়ি গিয়ে পৌঁছল।

আকাশের উড়ন্ত কোন পাখির পাখা ছিঁড়ে মাটির ধুলোর ওপর ফেলে দিলে তার যা অবস্থা হয় সুন্দরীরও ঠিক তেমন অবস্থা হল।

সে সারা রাত কিছু মুখে দিল না। ওখানেই পড়ে রইল। আজ আর কেউ তার সঙ্গে কথা বলতে এল না। তারও আর কারও সঙ্গে কথা বলার দরকার হল না।

রাত্রির অন্ধকার তখনও কাটে নি। বাইরে কে যেন তার নাম ধরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকল। লোকটি এক সিপাই। বচন সিং তার হাত দিয়ে একটি চিঠি পাঠিয়েছে। চিঠিটি দিয়ে সিপাই

চলে গেল। সুন্দরী ভেতরে এসে চিঠিটা খুলে পড়তে লাগল। চিঠিতে লেখা—

সুন্দরীজী!

ওঃ, যা স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি তাই হল। এতদিন ধরে যা মনে ভেবে এসেছি, যা সঙ্কল্প করে এসেছি তা একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল। আমার গ্রেফতারের খবর পেয়ে আপনার মনের অবস্থা কীরকম হবে তা আমি ভুলতে পারছি না। উঃ আমার হৃদয় যে কীভাবে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। অনেক কষ্টের পর মনে মনে ভেবে রেখেছিলাম যে হীরেকে হারের লকেট করে গলায় পরব আজ সেই হীরে ধুলায় পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে তা দেখে আমার হৃদয় উনুনের মত দাউ দাউ করে জ্বলছে। পৃথিবী···ওঃ···নির্দোষ পৃথিবীর চোখে ওই হীরের দাম এক কাণাকড়িও হবে না।

সুন্দরীজী! আপনাকে যদি একবার সুখী করতে পারতাম। কিন্তু আমার ভাগ্য বড় খারাপ। আমার মত অভাগার কপালে বিধাতা এত সুখ লেখেন নি। সুন্দরীজী! আপনার চিঠিতে এই শব্দ—যা পড়ে আমি হেসেছিলাম—আজ দেখছি তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। আপনার 'ফুল' আর 'হাওয়া' পূর্ণ উক্তির মধ্যে সত্যি সত্যি গূঢ় ফিলজফি ছিল। আজ আমি তা বুঝতে পারছি।

আমার স্বর্গতুল্য দেবী! আমার মন বলছে আমরা চিরকাল আলাদাই থেকে যাব। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি আমাদের ভাগ্যে একসঙ্গে থাকার সুখ যতখানি ছিল তা আমরা আগেই ভোগ করে নিয়েছি। একসঙ্গে তিন তিনটে খুনের মোকদ্দমায় আমাকে জড়ানো হয়েছে। সুন্দরীজী, এ তো আর সাধারণ মোকদ্দমা নয় যে এ থেকে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা করব।

গ্রামের লোকেরা যে ভাবে মামলাটা সাজাচ্ছে আমি যা শুনতে পাচ্ছি তা যদি সত্যি হয় তা হলে ধরে নেবেন আপনার আমার মিলনের আশা এখানেই শেষ। কিন্তু সুন্দরীজী, আপনি কি আমাকে সন্দেহ করেন? আপনার মন কি বলছে যে আমিই

অপরাধী ? যদি আমায় সারা পৃথিবীর লোক খুনী বলে ভাবে, যদি আদালত আমাকে খুনী বলে ফাঁসির হুকুম দেয়, আমার কোন দুঃখ নেই। কিন্তু সুন্দরীজী, আপনি যদি আমাকে খুনী বলে ভাবেন তা হলে আমার মন বিরাট দুঃখে ভরে যাবে। আমি আর নিজেকে সামলাতে পারব না।

বেশি কিছু লেখার সময় নেই। অনেক কষ্টে এই ছোট্ট চিঠিটা আপনাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছি। যে লোক এই চিঠি নিয়ে যাচ্ছে সে আপনার কাছে উত্তর নেবার জন্য যাবে। চিঠির জবাব এর কাছেই দিয়ে দেবেন। দেখবেন, কেউ যেন জানতে না পারে। কেননা এই বেচারির সম্মান আর চাকরি তা হলে চলে যেতে পারে।

এইসঙ্গে জ্ঞানীজীকে একটি চিঠি পাঠালাম। আজকাল উনি হরিদ্বারে আছেন। উনি এসে আপনাকে এখান থেকে নিয়ে যাবেন। দীওয়ানপুরের আশেপাশে থাকা আপনার পক্ষে বিপজ্জনক।

আর-একটি কথা— আমার সঙ্গে কখনও দেখা করার চেষ্টা করবেন না। আমি কাউকে না কাউকে দিয়ে আপনাকে চিঠি লিখে যাব। চিঠিতেই আপনার সঙ্গে দেখা হবে।

জানেন, আপনাকে দেখলে আমার কি অবস্থা হবে ? আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাবে। আমার মৃত্যু আসার আগেই আমি মরে যাব। তা ছাড়া আপনার অবস্থাও কম শোচনীয় হবে না।

আমি দেখতে চাই, মনকে কতখানি শক্ত করতে পারেন। যদিও আপনাকে আমি এ-সব কথা লিখছি, কিন্তু আমার নিজের অবস্থা খুবই খারাপ। থানায় এক ঘণ্টা অন্তর ঘণ্টা পড়ে। শুনে মনে হয় ওই ঢং ঢং আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে আমার কোন নতুন বিপদ বুঝি ঘনিয়ে আসছে। সে সময় আমি মনের ভেতর একটা তীব্র ব্যথা অনুভব করি— নিজেকে আর সামলাতে পারি না।

সুন্দরীজী, আমার মনের যা অবস্থা তা আপনাকে আর কী-ই বা বলব ? আমি তবু আপনাকে সান্ত্বনা দিচ্ছি কিন্তু আমাকে সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই। যাই হোক, কপালে যা লেখা আছে তা হবেই।

এখন আমার মনে হচ্ছে আমি যেন সত্যি সত্যি আপনার সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলছি। এই কথা বলায় কী সুখ! নিমেষের জন্য সংসারের সারা দুঃখ-কষ্ট, এমন-কি, ভবিষ্যৎ দুঃখের চিন্তাও আমার মন থেকে দূর হয়ে গেছে।

—আপনার বচন সিং

চিঠি পড়তে পড়তে সুন্দরীর মুখের চেহারার পরিবর্তন হতে লাগল। ওর মাথা ঘুরতে লাগল। চোখে ঝলমল করে উঠল প্রতিহিংসার আগুন। তার সারা শরীরে হাসির একটা বিদ্যুতের চমক খেলে গেল।

সে দ্রুত উঠে কলম নিয়ে চিঠির জবাব লিখতে বসল—

আমার জীবনসর্বস্ব!

চিঠি পড়লাম। আপনি এর মধ্যে বিচলিত হয়ে পড়েছেন? একে তো আপনি পুরুষ মানুষ তার ওপর আপনি নির্দোষ। তবে আপনি কেন ভয় পাচ্ছেন? আপনি কি আমার কথা ভেবে এত ভয় পেয়েছেন?

হে আমার উদাসীন প্রিয়তম! আপনি আর দ্বিতীয়বার এ সব কথা লিখবেন না। আমার সঙ্গে যখন আপনার প্রথম দেখা হয় তখন আমার মন ফুলের পাপড়ির মত নরম ছিল। কিছুদিন পরে (যখন বাবার মৃত্যু হল আর আপনার ওপর অত্যাচার শুরু হল) আমার হৃদয় কাঠের মত কঠোর হয়ে গিয়েছিল। আপনার চিঠি পড়ার পর আমার মন লোহার মত শক্ত হয়ে গিয়েছে।

প্রিয়তম, এই দুনিয়ার কাছে আমার দাম এক কাণাকড়িও নয়। এই স্বার্থপর, নোংরা দুনিয়ার মূল্য আমার কাছে কড়িতে চারটেও নয়। কী আর বলব! আপনি আমাকে সুখী করতে পারেন নি তাই না? এটাই আপনার ভুল প্রিয়তম! যে সুখ আপনি আমাকে দিয়েছেন, ওই তো আমার একমাত্র পাওনা। যখনি আপনি আপনার চিঠি 'ফুল' আর 'বাতাস' মিশিয়ে লিখেছিলেন, তখন আমি

ভালবাসা কাকে বলে জানতাম না।

কিন্তু আমি এখন ভালবাসার মহান সুউচ্চ আদর্শ কাকে বলে তা জানি। একেই আমি জীবনের ধ্রুবতারা করেছি। সেদিনের কথা আজ তাই আমার কাছে ফাঁকা আর অনভিজ্ঞতা বলে মনে হয়।

প্রভু, প্রথমে আপনার দেহটাকে আমি ভালবাসতাম। সেইজন্যে আমার অনেক বিপদ হয়েছিল। কিন্তু এখন আমার ভালবাসা আপনার আত্মার সঙ্গে। এখন তাই আর আমার কোন ভয় নেই। এখন আমি জানি স্বয়ং ঈশ্বর পর্যন্ত আমাকে আপনার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন না।

আমার মাথার মুকুট! আপনি কোন্ কথা ভেবে এত চিন্তিত হচ্ছেন? মৃত্যুর কথা ভেবে? যাকে সাংসারিক ভাষায় মৃত্যু বলা হয়? কিন্তু সেটা তো আসলে জীবন-মন্দিরের এক উৎসব মাত্র।

ওগো আমার জীবন-স্বামী, ওখানে গিয়ে আমরা এক আত্মা হয়ে যাব, ওখানে গেলে এই পৃথিবীর হিংসা আর বিষনজর আমাদের প্রেমকে আর বাধা দিতে পারবে না। ওখানে গিয়ে আমরা দাম্পত্য সাম্রাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হতে পারব। ওই সিংহাসনে বসে যখন আমরা আলিঙ্গনাবদ্ধ হব তখন স্বয়ং ব্রহ্মা এসেও আমাদের আলাদা করতে পারবেন না। আপনি কি একেই মৃত্যু বলেন? না, না, এ কিন্তু অন্যায়। প্রিয়তম আমার, এ আপনার খুবই অন্যায়।

আপনার মন কি বলছে যে চিরকালের জন্য আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটছে? না প্রিয়তম, না। আমার মন বলছে আমরা চিরকালের জন্য এক হতে চলেছি।

আপনি যে নির্দোষ সে বিষয়ে আমার সন্দেহ হবে? অসম্ভব কথা। আমি আপনাকে শুধু যে নিরপরাধই ভাবছি তাই নয়, আমি জানি কে আসল খুনী। কিন্তু কে আমার কথায় ভরসা করবে?

আমি জানি. অনবরজানই এই দুটো খুন করে নিজে আত্মহত্যা করেছে। যখন আমি ওর সঙ্গে কথা বলে চলে আসি তখন অনবর বোধ হয় আবার ওই দুজনকে ডেকে পাঠিয়েছিল তারপর সে ওই

কাজ হাসিল করে। কিন্তু আমি বার বার এই কথা ভাবছি যে আদালতে কী করে এই কথার সত্যতা প্রমাণ করব ?

আপনি জ্ঞানী মহারাজকে ডেকে পাঠিয়ে ভালই করেছেন। কিন্তু আপনাকে মৃত্যুর মুখে ছেড়ে দিয়ে আমি হরিদ্বার চলে যাব ? এ আমার পক্ষে অসম্ভব। আপনাকে বাঁচানোর জন্য কি আমি কিছুই করব না ? আমি জানি, আমার মত অবলা নারী কোন কাজেরই যোগ্য না। কিন্তু আপনি যে কাজ শুরু করেছেন তা কি আমি এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেব ? আর কিছু না হোক আমি আমার কলজের জোরেই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাব। এই সামাজিক জঞ্জাল সমাজ থেকে সাফ হয়ে যাবে।

কিন্তু স্বামী আমার ! আপনার মনের জোর যে এত কম তা আমার ধারণা ছিল না। মনকে শক্ত করুন। ভয়কে কাছে ঘেঁষতে দেবেন না। আমি গতকাল থেকে আপনার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করছি। আপনি দেখা করতে বারণ করেছেন। কিন্তু একবার আমার দেখা করার অভিলাষ পূর্ণ করতে চাই। এ জন্য আমি ক্ষমা চাইছি।

প্রিয়তম। আপনি আমাকে শক্ত হয়ে থেকে এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে সাহস দিচ্ছেন। কিন্তু আমার মনের অবস্থা দেখে আপনি আমার কথাগুলো একবার ভেবে দেখবেন। আপনি যদি নিজেকে সুখী করতে চান তা হলে সেই সুখের চাবিটা আমি তখনই পাব যখন দেখব আপনি পুরো সাহসের সঙ্গে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন।

আমি চিরকালের জন্য আপনার কাছে নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়েছি।

আপনার
সুন্দরী।

॥ ১৯ ॥

যেদিন থেকে বচন সিং গ্রেফতার হল সেদিন থেকে সুন্দরী আর ইস্কুলে পড়াতে যায় নি। তার নিজের ব্যাপারে ওর কোন হুঁশ ছিল না। সে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত লোকের বাড়ি বাড়ি, দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াত। কাপড়-জামা বদলাবার কথা পর্যন্ত ওর মনে ছিল না। কিন্তু এত কিছু চেষ্টা করেও ও কাজ হাসিল করতে পারল না। বচন সিং-এর পক্ষে ওর মা মামলার তদ্বির করছিলেন। কিন্তু ওর আত্মীয়-স্বজনদের মনে মনে ইচ্ছে ছিল, যে বচন সিংকে ফাঁসিয়ে দিয়ে ওর যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, বাসন-কোসন, জমি-জমা সব নিজেরা হাতিয়ে নেবে। ওরাই এই উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল।

অন্যদিকে পালা সিং ভাবছিল, কবে সেই দিন আসবে যেদিন সুন্দরীকে নিজের ঘরে এনে তুলতে পারবে। এই পথে যা প্রতিবন্ধকতা এতদিন ছিল তা তো অনেকটাই দূর হয়েছে।

পালা সিং-এর চেষ্টায় বচন-সিং-এর মিথ্যে মামলার জাল সাক্ষী-সাবুদ দিয়ে এমনভাবে বিছানো হয়েছিল যে বচন সিং-এর বাঁচার আর কোন আশা ছিল না। পুলিশী তদন্ত শেষ হল। বচন সিংকে ৩০২ ধারা মতে খুনের অভিযোগে চালান করে দেওয়া হল। শেঠ রলারাম আর তার ছেলে পুলিশের কাছে এজাহার দিল যে বচন সিং অনবরের মুজরো বন্ধ করার জন্য আমাদের প্রত্যেককে ধমকে গেছে আর ভয় দেখিযে গেছে। কিন্তু আমরা যখন ওর কোন কথায় কান দিলাম না ও তখন যাবার সময় বলেছে— আচ্ছা, আমি অন্যভাবে ওর মুজরো বন্ধ করব।

পালা সিং তার এজাহারে আরও লিখিয়েছে, বকুএ'-র একদিন আগে বচন সিং আমার সঙ্গে দেখা করে বলে— আমাকে এমন একটা লোকের সন্ধান দিতে পার যে একশো-দেড়শো টাকা দিলে দুটো খুন

করতে পারবে? আমি যখন ওকে বললাম, খবরদার এ-সব করতে যেয়ো না, তখন সে বলতে লাগল— আচ্ছা, আমি নিজেই করব।

এ ছাড়া পালা সিং-এর বন্ধুদের একজন তার সাক্ষ্যে বলল— আমি ওই রাত্রে ওকে একটা ছোরা হাতে অনবরের বাড়ির দরজার সমানে পায়চারি করতে দেখি। কেউ বলল, খুনের রাতে আমি ওকে স্বচক্ষে অনবরের বৈঠকখানায় ঢুকতে দেখেছি। ওই সময় করমচাঁদ আর পণ্ডিতজী মুজরোর ব্যাপারে কথাবার্তা বলার জন্য অনবরের বৈঠকখানায় হাজির ছিল।

এ ছাড়া এক কর্মকার রক্তাক্ত ছোরা দেখে—(যে ছোরাটি অনবরের ঘরে পাওয়া গিয়েছিল) বলল, এই ছোরা আমার দোকানেই তৈরি। বচন সিং কিছুদিন আগে ছোরাটা কিনে নিয়ে যায়।

সমস্ত মোকদ্দমাটাই বচন সিং-এর বিরুদ্ধে। বচন সিং-এর মা যে উকিল ঠিক করেছিলেন, সুন্দরী ভাবল সবার আগে খুনের রাতে অনবরের সঙ্গে তার কথাবার্তা তাঁকে বলবে কিনা। কিন্তু তারপর ভাবল, আগে সমস্ত কিছু বচন সিংকেই খুলে বলা দরকার।

দু-তিন দিন ধরে দৌড়ঝাঁপের পর সুন্দরী বচন সিং-এর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেল।

॥ ৩০ ॥

জেলের সংকীর্ণ সেলের মধ্যে বচন সিং বন্দী। যে সিপাই-এর মাধ্যমে বচন সিং সুন্দরীকে চিঠি পাঠিয়েছিল তার চেষ্টাতেই আজ বচনের সঙ্গে সুন্দরীর সাক্ষাতের দিন ধার্য হয়েছে।

বিকেল পাঁচটা। যে-সব কয়েদী আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করবে তাদের সেল থেকে বার করে দেউড়ির পাশে গরাদ লাগানো বারান্দায় আনা হয়েছে। এই কয়েদীদের মধ্যে বচন সিংও আছে।

বচন সিং গরাদের ফাঁক দিয়ে কার অপেক্ষায় যেন তাকিয়ে আছে। এমন সময় সে দূর থেকে সুন্দরীকে আসতে দেখল। সে

বুক চেপে ধরে বসে পড়ল। সুন্দরীর অবস্থাও তখন আর চোখে দেখা যায় না। ওর দেহে যেন এক বিন্দু রক্ত নেই। মুখে কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে। ওর পা ঠক ঠক করে কাঁপছে। মনে হচ্ছে সে এই মুহূর্তে বুঝি টলে পড়ে যাবে।

—সুন্দরীজী, আপনার সেই সঙ্কল্প কোথায় গেল? আপনি তো আমাকে মনে জোর রাখতে বলতেন। বচন সিং গরাদের ভেতর থেকে হাত বাড়িয়ে সুন্দরীর হাত ধরে ঝাঁকিয়ে এই কথা বলল। কিন্তু সুন্দরীর যেন বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত। এতদিন ধরে ও এই কথা ভেবে এসেছিল যে ওর খুব মনের জোর। ওর চোখ দিয়ে এতদিন এক ফোঁটা জলও ঝরে নি। কিন্তু বচন সিং-এর সামনে এসে ওর চোখের জলের বাঁধ আর মানল না। ঝর ঝর করে বহে চলল এত দিনের জমা অশ্রু।

—সুন্দরীজী, সময় কিন্তু বড কম। বচন সিং ওকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বলল। সুন্দরী তার ভুল বুঝতে পারল। সে চোখ মুছতে মুছতে বচন সিং-এর দিকে তাকিয়ে বলল—আমি অনেকখানি সময় নষ্ট করে দিলাম।

বচন সিং একটু গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল—না পাঁচ মিনিট কেটে গেছে। এখনও কুড়ি মিনিট বাকী। সুন্দরীজী, এই জন্যই আপনাকে লিখেছিলাম যে দেখা করে কোন লাভ নেই।

—কিন্তু আমি কি করব! সুন্দরী ঠাণ্ডা নিশ্বাস নিয়ে বলল, একটা কাজ ছিল, যার জন্য আপনার সঙ্গে দেখা করাটা বড় দরকার।

—এখানে আবার কী কাজ?

—আমি আপনাকে মিথ্যা কথা বলেছিলাম—আসল কথা আপনাকে বলি নি।

—তার মানে?

তার জবাবে সুন্দরী সেই রাত্তিরের ঘটনার কথা যা এতদিন বচন সিং-এর কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিল সব বলল।

এই কথা শুনে বচন সিং একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। এতদিন পর্যন্ত ওর ধারণা ছিল যে পালা সিং তাকে ফাঁসানোর জন্য এই জঘন্য

কাজ করেছে আর এই তিনটে খুন পালা সিং আর তার পার্টি করেছে কিন্তু তা সত্ত্বেও তার এই কথা ভেবে অবাক লাগছিল যে অনবরের গহনাগাঁটি চুরি করাই যদি পালা সিং-এর উদ্দেশ্য হবে, তা হলে করমচাঁদ আর পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণকে কেন খুন করতে গেল ? কিন্তু এই কথা ভেবে সে মনকে বোঝাল যে এই দুই ভদ্রলোক হয়তো ওই সময় ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছয় আর সেইজন্যই পালা সিং এই দুজনকে খতম করে দিয়েছে।

কিন্তু আজ সুন্দরীর মুখ থেকে এই ঘটনার আসল খুনী কে তা জানতে পারল বচন। সে জানতে পারল, অনবর এই দুজনকে খুন করার পর নিজের বুকে ছুরি মেরেছে। বচন সিং কাঁপতে লাগল। একে তো এত বড় একটা ঘটনা তার ওপর এইসঙ্গে সুন্দরীর মায়ের (অনবর) এমন সাংঘাতিক ভাবে দেহান্ত। এই ঘটনায় ওর বাহ্যজ্ঞান লোপ পাবার উপক্রম হল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত ওর মুখ দিয়ে কোন কথা বার হল না।

আজ বচন সিং আমাকে বেশ্যার মেয়ে বলে মনে করছে। সুন্দরী নিজের মনে এই কথা ভাবতে লাগল। তার দৃষ্টি তখন মাটির দিকে। সে চোখ তুলে তাকাতে পারছিল না।

ওদিকে বচন সিং সুন্দরীর মনের কথা বুঝতে পারল। এইজন্যই ও সুন্দরীর সঙ্গে আর এ নিয়ে কথা বলতে চাইছিল না। সে বলল, আচ্ছা যা হবার তা হয়ে গেছে। কিন্তু সুন্দরীজী, ব্যাপারটা খুবই তাজ্জব। হ্যাঁ, জ্ঞানীজী এখনও আসেন নি ?

—না, সম্ভবত আজ সন্ধ্যা নাগাদ এসে পড়বেন।

—তা হলে কাল সকালের গাড়িতে ওঁর সঙ্গে চলে যাচ্ছেন তো ?

—না, আমি যেতে পারব না।

—কেন ?

—আমাকে আদালতে সাক্ষ্য দিতে হবে।

—কী সাক্ষী ?

—যে কথা আমি আপনাকে বললাম।

এই কথা বলে আমি আদালতে আপনাকে নির্দোষ প্রমাণ করব।

বচন সিং-এর হাসি এল। সে বলল, সুন্দরীজী, আপনার এ কথায় কেই-বা বিশ্বাস করবে? হ্যাঁ, যদি অনবর তার নিজের খুন করার কথা নিজের হাতে কোথাও লিখে রেখে যেত বা মরার সময় পুলিশের কাছে এই মর্মে কোন এজাহার দিয়ে যেত তা হলে হয়তো বাঁচার কোন সম্ভাবনা থাকত। কিন্তু এখন এতে শুধু লোক হাসবে। কোন কাজই হবে না।

সুন্দরী সতেজে বলল, লোকে এই কথা বলে হাসাহাসি করবে যে সুন্দরী এক বেশ্যার মেয়ে, তাই তো? একবার নয়— হাজার বার বলতে দিন আমি কোন পরোয়া করি না।

—না, সুন্দরীজী! আমি তা সহ্য করতে পারব না। আপনি এ-সব গোপন কথা বলবেন না। আপনার আমার প্রতি ভালবাসা যদি সত্যিই খাঁটি হয় তা হলে এই গোপন কথা আপনি গোপন রেখে দিন। আর-একটা কথা। আদালত আপনার এই কথা বিশ্বাস-যোগ্য বলে মনে করবে না। আপনার বক্তব্যের সমর্থনে কোন সাক্ষী নেই। একটু ভেবে নিয়ে বচন সিং আবার বলল, কিন্তু আমার অবাক লাগছে, অনবর কেন কিছু লিখে রেখে গেল না।

সুন্দরী বলল, এখনও পর্যন্ত আমার অনুমান, চিঠি লিখে গেলে ওকে আমার কথা জানাতে হত। সম্ভবত ও চায় নি, লোকেরা জানুক যে সুন্দরী তার মেয়ে। এইজন্যই সে চিঠি লেখে নি। আর ও কী করেই বা জানবে যে এই কারণে আপনাকে···বলতে বলতে সুন্দরীর গলা ভরে এল আর ও কিছু বলতে পারল না।

দুজনের মধ্যে শুধু এই কথাগুলিই হল— দুঃখী হৃদয়ের সুদীর্ঘ কাহিনী শোনা তখনও বাকী ছিল। কিন্তু তখনই সাক্ষাৎকারের সময় উত্তীর্ণ হবার ঘণ্টা পড়ে গেল। আর ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে কয়েদীদের মধ্যে অনেকে নিজেরাই সেলে চলে গেল। যারা গেল না তাদের পুলিশ ধাক্কা মারতে মারতে ওখান থেকে নিয়ে গেল। বচন সিং-এর কাছে সুন্দরী তার যে দুঃখের কথা বলবে বলে এসেছিল তা আর তার বলা হল না। বচন সিং চলে যেতেই সে যেন চোখে অন্ধকার দেখল। বচন সিং-এর কাছ থেকে বিদায় নেবার সময়

বচন সিং তাকে শেষ কথা কী বলে গেল অন্যমনস্কতাবশত তা তার কানেই এল না।

॥ ৩১ ॥

নিরাশা, চারিদিকেই নিরাশা। দূরে যতদূর দৃষ্টি আর কল্পনা গিয়ে পৌঁছতে পারে সুন্দরী শুধু নিরাশাই দেখতে পেল। জ্ঞানীজী পরের দিনই এসে গেলেন। কেস অমৃতসর আদালতে চলছিল। এইজন্য জ্ঞানীজী আর সুন্দরী অমৃতসরে থেকে মোকদ্দমার তদ্বির করতে লাগল। রবানী গ্রাম কিংবা দীওয়ানপুরে থাকা সুন্দরীর পক্ষে কোন দরকারই ছিল না আর তা ছাড়া তা ছিল বিপজ্জনক।

বচন সিং-এর মোকদ্দমা নিম্ন আদালতে চলছিল। সকলের দৃষ্টি ছিল এই মোকদ্দমার দিকে। কারণ মোকদ্দমার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল যে আসামীর বাঁচবার আর কোন আশা নেই। মুজরো নিয়ে বচন সিং-এর সঙ্গে বিরোধ এবং এ নিয়ে ক-দিন ধরে তার নানান জায়গায় ছোটাছুটিই এখন তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এ ছাড়া খুনের রাতে ও যে অনবরের দরজার সামনে পায়চারি করেছিল তারও সাক্ষী আছে। ওর নিজের সাক্ষ্যতেও সে কথার প্রমাণ মেলে। তা ছাড়া যেটুকু বাকী ছিল, পাল্লা সিং আর তার দলের লোকেরা জাল সাক্ষী দিয়ে সেটুকু পূরণ করে দিল।

ওই রাতে সুন্দরী যখন অনবরের বাড়ি থেকে ফিরে এল তখন অনবরজান লোক পাঠিয়ে করমচাঁদ আর পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণকে তার ওখানে ডেকে আনে। অনবরের আমন্ত্রণ ওই দুজনের কাছে তো ঈশ্বরের দয়ার মত। দুজনেই ছুটতে ছুটতে অনবরের বাড়ি এল। অনবর ওদের দুজনকে খুন করার আগে ওদের। সঙ্গে খুব প্রেমের অভিনয় করল। একজন তো আগে থেকেই মদ্যপান করে চোখে অন্ধকার দেখছিল, অনবর তাকে আরও খাওয়াতে লাগল। খেতে খেতে যখন দুজনেই একেবারে বেহুঁশ, তখন অনবর ছুরি বার করে

দুজনের ভবলীলা সাঙ্গ করে দিল আর তারপরে সেই ছুরি বসিয়ে দিল নিজের বুকে।

রোজকার মত সকালবেলা অন্না (অনবরের বুড়ি ঝি) যখন ঘরের ভেতরে ঢুকে ভেতরের দৃশ্য দেখল তখন সে চেঁচিয়ে উঠল। ওর চিৎকার শুনে কয়েকজন ওপরে এসে পড়ল। দেখতে দেখতে বেশ ভিড় জমে গেল। সারা ঘর রক্তমাখা আর তার মধ্যে পড়ে রয়েছে তিনটি মৃতদেহ।

পালা সিং আর তার দলের লোকেরা যখন এই খুনের খবর শুনল তখন তাদের আনন্দের আর সীমা রইল না। ওরা সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে পুলিশ ডেকে আনল। বচন সিংকে তারা এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক বলে প্রচার করল।

খুন কখন হয়েছিল আর কে করেছিল? এই গুপ্তরহস্য একমাত্র সুন্দরী ছাড়া আর কেউ জানত না। কিন্তু শতকরা ৯৫ জনেরই সন্দেহ গিয়ে পড়ল বচন সিং-এর ওপর। কিন্তু এই সন্দেহ হল কেন? শুধু এই কারণে যে বচন তো চেয়েছিল সংস্কার, আন্দোলন গড়ে তুলতে। ব্যর্থ হয়ে ক্রোধে সে অনবরকে খুন করেছে। কিন্তু বাকী দুজনকে তাহলে খুন করতে যাবে কেন? তাদের সঙ্গে বচনের তো পরিচয়ই ছিল না। কিন্তু লোকেরা এই মর্মে কয়েকজনের সাক্ষ্য শুনল যে, যে সময় করমচাঁদ আর পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ মুজরোর কথা বলতে অনবরজানের বাড়ি গিয়েছিল ঠিক সেই সময় বচন সিং হাতে ছোরা নিয়ে অনবরকে খুন করার জন্য ঢোকে। সব ফাঁস হয়ে যেতে পারে ভেবে বচন ওই দুজনকেও খুন করে। এই-সব শুনে লোকের আর সন্দেহই রইল না যে বচন সিংই প্রকৃত খুনী।

বেচারি সদাকৌর শোকে আছাড়ি-পিছাড়ি খেতে লাগল, এদিকে সুন্দরী তখন কোর্ট আর উকিল বাড়ি সমানে ছুটোছুটি করছে।

বচন সিং-এর উকিল আসামী পক্ষের সাক্ষ্যের মধ্যে সুন্দরীর সাক্ষ্য নোট করে নিলেন। বচন সিং-এর চার্জশীট হয়ে গেলে সুন্দরীর সাক্ষ্য নেওয়া হল। সে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা যা ঘটনা ঘটেছিল তা সব খুলে বলল। কিন্তু ওর এই লম্বা ফিরিস্তির সঙ্গে মোকদ্দমার কোন

সম্বন্ধ ছিল না। অনবর কে? পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ আর করমচাঁদের চাল-চলনই বা কেমন? অনবরকে কী কারণে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করতে হয়? সুন্দরী এই-সব কথা পরিষ্কার করে আদালতকে বোঝাবার চেষ্টা করল। কিন্তু ওর কথার সত্যতার প্রমাণ কি? যে তার কথার সত্যতার প্রমাণ দিতে পারত সে তো খুন হয়ে গিয়েছে, সুন্দরীর সাক্ষ্যমত অনবরের হাতে খুন হয়েছে। শুধু একজনমাত্র সাক্ষী এখনও বেঁচে। সে হল তারাচাঁদ। সে কোথায় আছে কেউ বলতে পারে না। মারা গেছে কি বেঁচে আছে কেউ বলতে পারে না।

আসামী পক্ষের উকিল খুব নিরাশ হয়ে সুন্দরীকে বলল, খুকী আজ যদি তোর বাবা বেঁচে থাকত তা হলে এই মামলার হয়তো একটা নিষ্পত্তি করা যেত। তুই যদি কোথাও তোর বাবাকে খুঁজে বার করতে পারিস তা হলে বড় ভাল হয়।

বাকী থাকল কে খুন করেছে? এই মামলায় সুন্দরীর সাক্ষ্যে কোন যে ফল হবে না তা বোঝা গেল। কিন্তু তা সত্বেও সুন্দরী নিজের এজাহারে স্পষ্ট বলে দিল যে, তার মা (অনবর) ওই দুজনকে খুন করার জন্য তার সামনেই প্রতীজ্ঞা করে। কিন্তু আদালতে সে কী করে এ কথা প্রমাণ করবে?

আদালতের চোখে সুন্দরীর সমস্ত কাথাই মিথ্যা সাক্ষ্য বলে সাব্যস্ত হবে।

সমস্ত কিছু জানা সত্ত্বেও সুন্দরীর সাক্ষ্যে আসামীর কোন সুরাহা করা গেল না। মোকদ্দমা সেসনে দায়রা সোপর্দ করা হল।

এই সারা দৌড়ঝাঁপের ফল এই দাঁড়াল যে আগে লোকে সুন্দরীকে অচ্ছুৎকন্যা বলত এখন তাকে সবাই বেশ্যার মেয়ে বলতে লাগল।

আদালতের আইন পয়সাওয়ালা লোকের চাকর আর গরিব লোকের মালিক। সে আইন বড় লোকের হুকুমে চলে থাকে আর গরিবকে নিজের হুকুম মত চালায়।

মোকদ্দমা চলার সময় বচন সিং-এর সঙ্গে সুন্দরী, সদাকৌর আর জ্ঞানীজীর একবার দেখা হয়েছিল। এই বেদনাদায়ক দৃশ্যের বর্ণনা করে আমি পাঠকদের আর দুঃখ দিতে চাই না।

আর কয়েকদিন শুনানীর পর মহান আদালত বচন সিং-এর ফাঁসির হুকুম দিল। হতভাগিনী সদাকৌরের এ খবর সহ্য করার মত শক্তি ছিল না। খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সে জ্ঞান হারাল। বচন সিং-এর পক্ষ থেকে হাইকোর্টে আপীল করা হল।

সুন্দরীর কাছে এই আঘাত সাধারণ আঘাত নয়। কিন্তু তার ভেতরে প্রতিশোধের আগুন তখন দাউ দাউ করে জ্বলেছে। ওই আগুন তার মনকে তখন আরও দৃঢ় করে দিল।

॥ ৩২ ॥

অমৃতসরের একটি ছোট গলিতে বাড়ি ভাড়া করে জ্ঞানীজী আর সুন্দরী থাকতে লাগল।

বচন সিংকে বাঁচাবার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। ফাঁসির বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা হয়েছিল। কিন্তু সুন্দরী জানত যে, সে তো শুধু উপলক্ষ্য মাত্র। এতে কোন ফলই হবে না।

তারাচাঁদকে খোঁজার জন্য তার মনের ব্যগ্রতা দিন দিন বেড়েই চলেছিল কিন্তু তা শুধু বৃথা চেষ্টা।

ওর থেকে থেকে নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য আফসোস হতে লাগল যে সে অনবরের কাছ থেকে কেন তারাচাঁদের ঠিকানা জেনে নেয় নি। চেহারা না দেখে ও তারাচাঁদকে কী ভাবে খুঁজে বার করবে? অনবর শুধু এইটুকু জেনেছিল যে, এক সময় তারাচাঁদ শিয়ালকোটের কোন এক সরকারী অফিসে চাকরি করত। এই খবরটুকুর ওপর ভিত্তি করে সুন্দরী শিয়ালকোট গিয়ে সব সরকারী অফিস ঘুরতে লাগল। এই ভাবে ক'টা দিন শুধু নষ্ট হল। কিন্তু আঠারো-উনিশ বছর আগেকার কথা লোকে কী করে মনে রাখবে? ওখান থেকে সুন্দরীকে নিরাশ হয়ে ফিরতে হল।

কিন্তু সুন্দরী সাহস হারাল না। সে যথারীতি দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল। পয়সা রোজগারের জন্য সে আবার লেখা শুরু করল।

যে লেখা অনেক দিন সে বন্ধ রেখেছিল। সে দিনরাত কোন-না-কোন কাজে লেগে থাকত। ওর খাওয়াদাওয়া, জামাকাপড়, কোনদিকেই নজর ছিল না। ও খুব উদ্বেগের সঙ্গে হাইকোর্টে রায়ের অপেক্ষা করছিল আর এই অপেক্ষায় কয়েকটি মাস কেটে গেল। এই সময়ের মধ্যে তার অনেক গল্প পাঞ্জাবি পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হল। এই-সব গল্পের ছদ্মনামী লেখকের আসল নাম জানার জন্য লোকে খোঁজখবর করতে লাগল।

জ্ঞানীজীর সুন্দরীর জন্য সারাক্ষণ চিন্তা। তিনি সর্বদা আধ্যাত্মিক উপদেশ দিয়ে সুন্দরীর অশান্ত হৃদয়কে শান্ত রাখার চেষ্টা করতেন। কিন্তু সুন্দরীর অন্তরে জ্বলছে প্রতিহিংসার আগুন। এইজন্য ওই আধ্যাত্মিক উপদেশ তার মনে দাগ কাটে নি। সুন্দরীর শরীর দিনে দিনে দুর্বল হয়ে যেতে লাগল। কিন্তু তার মন আরও শক্ত আরও মজবুত হয়ে উঠল। ও সারা পৃথিবীকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করল। জীবন তার কাছে অসহ্য ও অনাবশ্যক হয়ে উঠল।

হঠাৎ একদিন বচন সিং-এর চিঠি পেয়ে ওর মনটা ছাঁৎ করে উঠল। —খামের ওপর বচন সিং-এর হাতে লেখা ঠিকানা দেখে সে দুরু দুরু বুকে খামটা খুলল আর চিঠির প্রথম লাইন : সুন্দরীজী! শেষ ভালবাসা। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর মাথা ঘুরতে লাগল। কিন্তু সে নিজেকে সামলে নিয়ে চিঠিটা পড়তে শুরু করে দিল—

'আপীল নাকচ হয়েছে। আর ফাঁসির দিন ঠিক হয়ে গেছে—আগামী মঙ্গলবার··· ।'

সুন্দরীর হাত থেকে চিঠিটা মাটিতে পড়ে গেল। তার হাত-পা অবশ হয়ে এল। কিন্তু ও ঠোঁট কামড়ে আর একবার মনটাকে শক্ত করল— জ্ঞানীজীর আধ্যাত্মিক উপদেশ এই সময় ওর খুব কাজ দিল। সে আবার পড়তে শুরু করল।

আহা! সুন্দরীজী! জানেন, এখন আমার মনের কী অবস্থা? আমার দুর্ভাগ্যের জন্য আমার যা অবস্থা হয়েছে তা কেউ উপলব্ধি করতে পারবে না। ওঃ! এই পৃথিবীটাকে আজ কী নির্দয় বলে মনে হচ্ছে। গরাদ দেওয়া সেলে সাধারণ কয়েদীর মত নয়, আমি

এখন ফাঁসির সেলে রয়েছি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমি মুক্ত আর নিজের এই পৃথিবীর মুক্ত আকাশে আমি নিজেকে উড়ে বেড়াতে দেখছি। একের পর দুই, দুই এর পর তিন—চোখের সামনে নানান দৃশ্য ভেসে উঠছে। কোন্ দৃশ্য? ছোটবেলায় জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত যে-সব দৃশ্য দেখেছি।

যখন সুপারিনটেণ্ডেণ্ট আমার সেলের কাছে এসে আমাকে প্রথম ফাঁসির হুকুম শোনালে তখন আমার মনের অবস্থা কী হল? ওর মুখ থেকে চার অক্ষরের একটা শব্দ বার হতে যেটুকু দেরি সেই সময়টুকুর মধ্যে আমার কাছে পৃথিবীটাই বদলে গেল। ওই সমস্ত সেলের দেওয়াল, শিক দেওয়া দরজা, ঘরের মেঝে সমস্ত কিছু 'ফাঁসি' 'ফাঁসি' বলে চিৎকার করে আমার কান ঝালাপালা করে দিচ্ছিল। বাইরে বন্দুক কাঁধে সান্ত্রী গুন গুন করে গান গাইছে আর এদিক থেকে ওদিক পায়চারি করছে— সে যেন ফাঁসির রাগ ভাঁজছে। সামনের তুঁত গাছে একটা কাক বসে বসে ডাকছিল। মনে হচ্ছিল ফাঁসি শব্দ ছাড়া ও যেন আর কিছুই জানে না।

আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁপছিল। না, আমি কাঁপছিলাম না। আমার শরীরের কোন অঙ্গ কাঁপছিল না। কিন্তু আমার মনের ভেতর এমন একটা অনুভূতি হচ্ছিল, যাতে আমার হৃদয়, মন, আমার সমস্ত চিন্তাধারা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। মাটি, ছাদ, সামনের মাঠ, বাইরের গাছ সমস্ত কিছুই তখন কাঁপছে। বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে আমার একই রকম অবস্থা রইল। তারপর ধীরে ধীরে অন্য এক দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সামনে দেখলাম প্রশান্ত দেবীমূর্তি—তার রঙ সরষের ফুলের মত পীতবরণ। মনে হল তাঁর দেহটি ডাক্তার-খানায় শুইয়ে রাখা এক কঙ্কাল। কিন্তু ওই হলুদ চেহারা থেকে একধরনের দ্যুতি প্রকাশ পাচ্ছে। এই মূর্তি দেখে আমার মন ভরে গেল। আমি ভুলে গেলাম যে আমি ফাঁসির আসামী। ওই মূর্তি আমার সুন্দরীর।

ঠিক পরের মুহূর্তে সে চেহারা কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। চোখের সামনে ভাসতে লাগল ফাঁসির দৃশ্য। তার পাশে কৃষ্ণকায়

ভয়ংকর মুখের এক জহ্লাদ দাঁড়িয়ে। সে সযত্নে ফাঁসির দড়িতে তেল মাখাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলাম। নানা রকমের চিন্তা আমাকে গ্রাস করতে লাগল। আমি যেন খুব ঘাবড়ে গিয়ে সেই জহ্লাদকে বললাম, বন্ধু আমার! একটু দাঁড়াও। এত তাড়াতাড়ি কোরো না। আমার যে কিছু কাজ এখনও বাকী পড়ে আছে। আমাকে এই কাজ শেষ করতে দাও। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই কাজগুলো সেরে ফেলছি। কিন্তু জহ্লাদের যেন তর সইছিল না। সে বলল, ওহে, আমাকে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে হবে। তোমাকেও তাড়াতাড়ি তোমার কাজ সেরে ফেলতে হবে। ও তাড়াতাড়ি রেশমের দড়িটা ঠিক করতে লাগল।

তার জবাব শুনে আমার মনটা হতাশায় ভরে গেল। আমার অবস্থা তখন সেই ট্রেন যাত্রীর মত যে নাকি আসবাবপত্র নিয়ে একটা গোরুর গাড়ি করে ট্রেন ধরতে যাচ্ছে কিন্তু এদিকে ট্রেন সিটি দিয়ে দিয়েছে আর গার্ড সাহেবও সবুজ নিশান দেখিয়ে দিয়েছে।

ওঃ সুন্দরীজী, আপনি আপনার কোন এক চিঠিতে মৃত্যুর যে প্রশংসা করেছিলেন তাতে আমি বেশ প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলাম। আমিও মৃত্যু সম্পর্কে ও রকম চিন্তা করতাম। কিন্তু ফাঁসির হুকুম শোনার পর সে কথা ভুলে গেলাম। সেই মৃত্যু প্রথম থেকে হাজার গুণ ভয়ংকর হয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

আমি আপনাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বারণ করেছিলাম। এতে করে আমার দুঃখ আরও যে বেড়ে যাবে। কিন্তু এখন দেখছি আর তেমন অবস্থা নেই। মনে হচ্ছে আমার সমস্ত দুঃখের উপশম আপনি। শুধু মরার আগে একবার শুধু আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে পারলে আমি শান্তিতে মরতে পারব।

সুন্দরীজী! এ কথা কে লিখছে? এই বুদ্‌বুদ কোথা থেকে উঠছে। আমার মনের মধ্যে বসে কে কথার পর কথা সাজিয়ে লিখে চলেছে? ওই চার গজ দড়ি কি এক ঝটকায় সব শেষ করে দেবে?

এই দড়ির এক ঝাঁকানিতে উদ্গত এই অশ্রুবন্যা কি একেবারে শুকিয়ে যাবে ? যে হাত আজ বিদ্যুতের মত লিখে চলেছে আজ থেকে ছ-দিন পরে তা কি শুকনো কাঠের মত হয়ে যাবে ? আমার হৃদয়-মন্দিরে যে অলৌকিক দেবীমূর্তি সমাসীন ঘটনাচক্রের নিষ্ঠুর হাতুড়ির আঘাতে ওই মূর্তি কি চুরমার হয়ে যাবে ?

হায় আমি কী মূর্খ ! ঘরে আগুন লেগেছে, আর সে আগুনকে আমি অঞ্জলি ভরে জল দিয়ে নেভাবার চেষ্টা করছি।

সুন্দরীজী ! আজ এখানেই শেষ করছি। আমার দুঃখের কাহিনী শেষ হবার নয়। যার সত্যিকারের পিপাসা পেয়েছে স্বপ্নের ঘোরে জল খেলে তার সে পিপাসা তো দূর হবার নয়। আপনার সঙ্গে এখানেই আমার সম্পর্ক শেষ—কিন্তু না। এই সম্পর্ক যতদিন-না সৃষ্টি ধ্বংস হয় ততদিন অটল থাকবে।

দেখুন সুন্দরীজী, আপনার চিঠির পুরো তাৎপর্য আমি আগে ধরতে পারি নি। এখন বুঝতে পারছি। আপনি কি আমার মৃত্যুর পরে বেঁচে থাকতে চান না ? আমি আপনাকে এই পরামর্শ দিচ্ছি আপনি কখনও এমন কাজ করবেন না। আপনি যদি আর কোন কথা না শোনেন তা হলে আপনাকে একটা কথা মনে করিয়ে দিতে চাই— আপনার মাথার ওপর এক দুঃখী মানুষের ভার রয়েছে— সে আমার নিরাশ্রিতা মা। জীবন-মৃত্যুর মাঝামাঝি অবস্থায় এখনও যে বেঁচে রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি ওর সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারছেন, ততক্ষণ আপনার এমন কাজ করার কোন অধিকার নেই। যখন আমরা লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এক সঙ্গে থাকব তখন এই সামান্য দু-দিনের বিরহ সহ্য করা কি খুব কঠিন ? আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করে থাকব কিন্তু যে কর্তব্যভার আমি আপনাকে দিয়ে গেলাম তা পূরণ না করে আপনি আমার কাছে কিছুতেই আসতে পারবেন না।

সোমবার আমার আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করার দিন ধার্য হয়েছে। এইজন্য মঙ্গলবার সকালে জ্ঞানীজীকে সঙ্গে করে আপনি এখানে চলে আসবেন। আর সুন্দরীজী ! আমাদের এবারের এই

দেখা নিয়ে কোন ঝামেলা পোহাতে হবে না। সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব দয়া করে আমাকে এইটুকু অনুমতি দিয়েছেন।

ওঃ! সুন্দরীজী! আমি কি চিঠি এখানেই শেষ করব? এই চিঠি শেষ করা যে কী কষ্ট! এই চিঠি শেষ করামাত্র আমার কাছে এই পৃথিবীর সব-কিছু শেষ হয়ে যাবে।

কাগজ শেষ হয়ে গিয়েছে—কোথাও আর একটুও সাদা জায়গা নেই। অক্ষরে অক্ষরে এই চিঠি ভরে গেছে। মাথার কাছে জমাদার দাঁড়িয়ে ধমক দিচ্ছে যে তাড়াতাড়ি যেন চিঠিটা শেষ করে ফেলি। সুপারিনটেনডেন্টের আসার সময় হয়ে গিয়েছে।

আমার সুন্দরীজী! আপনার প্রেমভরা মূর্তি হৃদয়ের ভেতর রেখে আমি এই চিঠি শেষ করছি।

আমার শেষ ভালবাসা নেবেন।

আপনার
বচন সিং

॥ ৩৩ ॥

ফাঁসির হুকুম হয়ে যাওয়ার পর বচন সিং দিনরাত নানান রকম চিন্তা-ভাবনায় ডুবে থাকত। নদীর স্রোতের মত তার মনে নানান ভাবনা জাগত আবার আপনা আপনি চলে যেত। শেষের দিকে তার চোখের সামনে ফাঁসি আর মৃত্যুর দৃশ্য ভেসে বেড়াত। কিন্তু আজ তার জীবনের শেষ দিন। আজ তার মন আর আগের মত একটুও বিচলিত নয়। মনে হল আজ তার সমস্ত শক্তি একেবারে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। ওর মনে হচ্ছে যেন ফাঁসি হওয়ার আগেই ওর মৃত্যু হয়েছে। এবং সে কোন দ্বিতীয় পৃথিবীতে গিয়ে পৌঁছেছে। পাশেই বোধ হয় কোন তেলের ঘানি চলছে। তার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে ওর মনে হচ্ছে যে কোন বিধবা তার স্বামীর মৃত্যুতে বিলাপ করছে। ঘরের এক কোণে একটি টিকটিকি টিক টিক করছিল, কিন্তু বচন

সিং-এর মনে হচ্ছে কোন মা— মরা ছেলে কোলে করে আর্তনাদ করছে। সামনের ময়দানে যখন দু-চারটে পাখি চিঁ চিঁ করতে করতে উড়ে গেল তখন তার মনে হল যেন মৃত্যু তাদের তাড়া করেছে আর তারা আর্তনাদ করতে করতে পালাচ্ছে।

লাহোর সেনট্রাল জেলের এই নোংরা সেলের মধ্যে বসে ওর নিজের অভাগিনী মায়ের কথা মনে পড়ল। যে মা কাল তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তার সুন্দরীর কথা মনে পড়ল। আজ সুন্দরী তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। সে তার গবাদ দেওয়া নোংরা ঘরে বসে বসে ভাবতে লাগল— এখন হয়তো সুন্দরী গাড়ি থেকে নেমেছে। টিকিটবাবুকে টিকিট দেবার সময় ওর রোগা হলুদ হাতটি কেঁপে উঠছে। জলে ভরে গেছে চোখ। সেজন্য ও পরিষ্কার রাস্তা দেখতে পাচ্ছে না। জ্ঞানীজী ওকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ধৈর্য ধরতে বলে টাঙ্গায় বসিয়েছেন। টাঙ্গা জেলের দিকে এগিয়ে চলেছে। রাস্তার দু-ধারের গাছগুলো যখন দূরে সরে যাচ্ছে তখন সুন্দরীর এক এক করে তার সুখের দিনগুলির কথা মনে পড়ছে। সে বলছে, বিদায় আমার বন্ধুরা। তোমাদের চিরকালের জন্য বিদায় দিলাম। এবার টাঙ্গা এসে জেলের দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে। সবার আগে সুন্দরীর দৃষ্টি পড়েছে কালো ফটকটার ওপর। তা দেখে তার দুঃখ আরও বেড়ে গেছে। ফটকের সামনে লাল পাগড়া বাঁধা সেপাইকে যমদূতের মত মনে হচ্ছে। সম্ভবত সুন্দরী এই-সব দৃশ্য আর সহ্য করতে পারছে না। আর অজ্ঞান···

এই সময় ভারী বুটের আওয়াজ ওর কানে এল। সে উঠে দাঁড়াল। বাইরে এক সুপারিনটেনডেন্ট, এক ডাক্তার, দুজন দারোগা আর অনেক সিপাহী দাঁড়িয়ে ছিল।

সেলের দরজা খুলে গেল আর কেউ কিছু বলার আগে বচন সিং বুঝে গেল ফাঁসির সময় হয়ে গেছে।

হাতকড়ি দেখে সে দু-হাত সামনে বাড়িয়ে দিল আর এক সিপাহী তার দু-হাতে হাতকড়ি পরিয়ে দিল। ওকে আগে রেখে সবাই পিছনে পিছনে চলতে লাগল।

বচন সিং যদিও মাটির ওপর দিয়ে চলছিল কিন্তু ওর পায়ের নীচে মাটি সরে গিয়েছিল আর ও যেন হাওয়ায় ভেসে ভেসে চলছিল। তার মনে হচ্ছিল তার মাথার ভেতরটায় মস্তিষ্ক বলে আর কিছুই নেই। ওর বুকের ভেতরে হৃদয় নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার ভিতরে এমন কিছু তখনও অবশিষ্ট ছিল যা তার এই মরার মত দেহটাকে কিছু অনুভব করার মত শক্তি দিয়েছিল। তার চোখ পাথরের মত হয়ে গেল। কিন্তু সে চোখ তখনও যেন কিছু দেখতে চাইছিল। ওর হাতকড়ি বাঁধা হাতের আঙুল দিয়ে ও কখনও কখনও শৃঙ্খলটাতে হাত বুলিয়ে অনুভব করতে চেষ্টা করছিল যে তা লোহা, না পাথর।

এবার বচন সিং এমন এক জায়গায় নিজেকে দাঁড়ানো দেখল যে জায়গাটি সে আগে কখনও দেখেনি। কিন্তু না দেখা থাকলেও সে এই জায়গাটি সম্পর্কে আগে মনে মনে কল্পনা করে নিয়েছিল। এটা ফাঁসির মঞ্চ।

এই জায়গাটি দেখামাত্র বচন সিং-এর সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে তার মানসিক অবস্থা বদলে গেল। ওর চোখের সামনে আর-কিছু রইল না— শুধু অন্ধকার ছায়া তার সামনে ভেসে উঠল।

ও কতক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়েছিল মনে নেই। এই সময় ওর কানে এল কে যেন বলছে— ওয়েল মিস্টার বচন সিং, আপনি কিছু কি বলতে চান ?

সে জবাব দিল, কাকে ? জবাবটা ওই-ই দিল, না অন্য কেউ ? সে কিছুই বুঝতে পারল না। ওর মনে হল সে জবাব দিয়েছে কিন্তু তার জবাবটা বোঝাতে পারেনি। এরপরে আবার সেই আগের গলার স্বর ভেসে এল।

—আচ্ছা ওকে ডাকো।

বচন সিং কথাটা শুনতে পেল। যেন কিছুক্ষণের জন্য সে সম্বিৎ ফিরে পেল।

একটু পরে সে পিছন থেকে একটা চিৎকার শুনতে পেল। —গলাটা চিনতে পারল বচন। সে পিছন ফিরে দেখল—সুন্দরী। তার মাথা

জ্ঞানীজীর কাঁধে। তার দিকেই ওকে নিয়ে আসা হচ্ছে। জ্ঞানীজীর কাতর অনুরোধে বচন সিং-এর হাতকড়ি খুলে দেওয়া হল। এবার সুন্দরী বচন সিং-এর সামনে এসে দাঁড়াল—সে নিজের সারা শক্তি দিয়ে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করল। জ্ঞানীজী এক হাত দিয়ে বচন সিং-এর হাত ধরে রেখেছিলেন। আর এক হাত দিয়ে ধরেছিলেন সুন্দরীকে। তারা তুজনে তুজনের দিকে পাথরের মত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। ওদের তুজনের চোখ তুজনের চোখ দিয়ে গড়া। একের চোখের তারায় অন্যের সূক্ষ্ম প্রতিবিম্ব। তুজনে যেন তুজনের চোখের ভেতরে নিবদ্ধ হয়ে গেল।

এই সময় সুন্দরী তার গলায় এক ঠাণ্ডা স্পর্শ অনুভব করল।

সে দেখল জ্ঞানীজী রুমালের গিঁট খুলে একটি করে ফুলের মালা তুজনের গলায় পরিয়ে দিলেন। সুন্দরী দেখল তার একটি হাত বচন সিং-এর হাতে। তুজনের হাত নিজের হাতে নিয়ে জ্ঞানীজী বললেন, হে সৃষ্টিকর্তা! এই তুজনের প্রেম যেন সৃষ্টির শেষ দিন পর্যন্ত অটুট থাকে। আর স্বর্গে একসঙ্গে মিলে অনন্তকাল ধরে তোমরা দাম্পত্য জীবন কাটাও।

এরপর ইংরেজ অফিসার মাথা থেকে টুপি খুলে ফেললেন। বাকী লোকেরা (যারা মুসলমান) তারা মাথা নিচু করে সমস্বরে বলল,

'আমীন! আমীন!'

এরপরে ক্ষণেকের জন্য তু-জনের আবার সম্বিৎ ফিরে এল। তারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করল। এক মিনিট, পাঁচ মিনিট, শেষে দশ মিনিট কেটে গেল, কিন্তু ওদের বাহুবন্ধন শিথিল হল না।

সুপারিনটেনডেন্টের ইশারা পেয়ে জ্ঞানীজী বললেন—

কাকা বচন সিং! মা সুন্দরী! খুকী!

কিন্তু ওরা তুজন তুজনকে ছাড়ল না। সম্ভবত তুজনেই তখন অচৈতন্য। পরে জ্ঞানীজী সুন্দরীর হাত ধরে বললেন, মা!

সুপারিনটেনডেন্ট বচন সিং-এর হাত ধরে বলল—মিস্টর বচন সিং!

ওর বাহুবন্ধন শিথিল হয়ে গেল। বচন সিং বিচলিত অবস্থায় সোজা হয়ে দাঁড়াল। এই সময় একজন ওর মাথায় একটা কালো

টুপি পরিয়ে দিল। সুন্দরী পড়ে যাচ্ছিল। জ্ঞানীজী তাকে ধরে রাখলেন। সুপারিনটেনডেণ্টের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তাড়াতাড়ি একটা চারপাই নিয়ে গিয়ে তিনি সুন্দরীকে বসালেন।

যখন সুন্দরীর জ্ঞান হল তখন রাত্রির অন্ধকারে চারিদিক ঢাকা। ইঞ্জিনের ফস্ ! ফস্ ! আওয়াজ, যাত্রীদের চিৎকার, ফেরিওয়ালার পেড়া চাই, মিঠাই চাই স্বর, সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধতে সুন্দরীর অনুমান হল সে কোন এক রেল স্টেশনে এসে পৌঁছেছে। বুঝতে পারল সে এখন স্টেশনের ওয়েটিংরুমে।

সুন্দরী উঠে বসল। উঠে জল চাইল। জ্ঞানীজী ঘটি নিয়ে জল আনতে গেলেন। সুন্দরীর আজকের ভুলে যাওয়া ঘটনার কথা আবার মনে এল। এই সময় ওর মনে হল তার মাথাটায় কে যেন কয়মণ ভারী বোঝা চাপিয়ে রেখেছে। তার মাথায় নানান চিন্তার উদয় হতে লাগল। মনে হল সে যেন একটা ভারী পাথর বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আমি কী ছিলাম কী হয়ে গেলাম—আজ আমি সব-কিছু হারিয়ে পৃথিবীতে একলা আর নিরাশ্রিত। এই-সব চিন্তা তার মাথায় তখন নেই। ওর অবস্থা এমন একটি বাড়ির ছাদের মত যার নীচের পিলার ধসে পড়েছে।

কিছুক্ষণ ধরে সে পথভোলা পথিকের মত এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। এই সময় জ্ঞানীজী জল নিয়ে এলেন। জল খেয়ে ও কিছুটা সুস্থ হল। ওর মস্তিষ্ক এতক্ষণ কাজ করছিল না, এবার আবার কাজ করতে লাগল। এর সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখের সামনে থেকে পৃথিবীর রূপটা বদলে গেল। ওর মনে হল ও যেন একটা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে চাপা পড়েছে। বচন সিং-এর সঙ্গে ওর শেষ সাক্ষাৎকারের কথা মনে পড়ল। কিন্তু ওর মনে হতে লাগল সবটাই যেন স্বপ্ন।

—ওকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। এই কথা মনে হতেই ও চিৎকার করে দু-হাতে মুখ ঢেকে বেঞ্চের ওপরে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল। জ্ঞানীজীর কাছ থেকে সকলে শুনল যে সুন্দরীব নিরপরাধ স্বামীর আজ ফাঁসি হয়ে গেছে। চারপাশে যাত্রীদের ভিড় জমে গেল।

তারা সকলে সুন্দরীকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল।

সুন্দরী এই সময় ইচ্ছে করছিল সে প্রাণ খুলে কাঁদে। কিন্তু সে কাঁদতে পারল না। তার চোখে জল এল না। ওর সর্বাঙ্গ থেকে যে আগুন ঝরছিল তা হয়তো ওর সমস্ত চোখের জলকে শুকিয়ে ফেলেছে, সে উঠে ওয়েটিং রুমের বাইরে গেল। যতদূর দৃষ্টি যায় সে আশেপাশের যাত্রীদের মন দিয়ে দেখতে লাগল। ওর মনে হতে লাগল প্রতিটি লোকই বেইমান, বিশ্বাসঘাতক। সে ভাবতে লাগল, ঈশ্বর যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন সমস্তই এই মানুষেরা ধ্বংস করবে। ঊর্ধ্বে আকাশের দিকে তাকিয়ে তার মনে হল, আকাশের বুকে যে-সব কালো মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে তারা যেন তাকে সহানুভূতি জানাচ্ছে। সুদূর আকাশের দু-একটি তারা টিম টিম করে জ্বলছে। সম্ভবত ওরাও আর সুন্দরীর দুঃখ সহ্য করতে পারছে না। এইজন্য তারা মেঘের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে। উঁচু উঁচু গাছগুলোও মাথা নেড়ে যেন তার দুঃখে সহানুভূতি জানাচ্ছে। মনে হল সমগ্র প্রকৃতি যেন ওর দুঃখে গভীরভাবে দুঃখী।

তার দেহে হঠাৎ বিদ্যুতের মত শক্তির সঞ্চার হল। আশেপাশের লোকদের দিকে বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বলল, তোমরা কী দেখছ? আমার রক্ত খেয়েও তোমাদের পেট ভরল না? তোমরা এর থেকে আমার আর কী ক্ষতি করবে? তোমরা আমার আর কিছুই তো অবশিষ্ট রাখ নি। আমার সর্বস্ব খেয়েও তোমাদের এখনও আশা মেটে নি?

জ্ঞানীজী ওর হাত ধরে ওকে এক জায়গায় বসাবার চেষ্টা করলেন। বললেন, মা, এবার একটু চুপ কর। একটু সামলে নে।

যাত্রীরা ওখান থেকে সরে গেল। জ্ঞানীজী তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন,— দেখছি, এইভাবে তুই নিজের বিপদ বাঁধাবি। যা হবার হয়ে গেছে···।

সুন্দরী জ্ঞানীজীর কথায় হেসে বলল,— কী বললেন, বাবা? আমার জীবন' নিয়ে টানাটানি হবে? না। আমি এখন মরব না। আমার এখনও অনেক কাজ বাকী। তা শেষ করার আগে আমি

মরব না। হ্যাঁ, বাবা ওর দাহ সংস্কারের কী হল ?

—হয়ে গেছে মা। তোর জ্ঞান ফেরাবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু…

—আচ্ছা, ঠিক আছে।

এরপর দুজনে অমৃতসরের ট্রেনে উঠল।

অমৃতসরে পৌঁছে যখন দুজনে মুসাফিরখানা থেকে বেরুল তখন সুন্দরী জ্ঞানীজীকে বলল— পিতাজী, আমি আপনাকে আর আটকে রাখতে চাই না। কিছুদিনের জন্য আপনি আমায় একা থাকতে দিন।

—তোমাকে একলা ছেড়ে দেব ? জ্ঞানীজী অবাক হয়ে খানিকক্ষণ সুন্দরীর দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, কী জন্য মা ?

—আমি দীওয়ানপুরে যাব।

—কিন্তু ওখানে তোমার কী দরকার ?

—আপনি জানেন না। উনি আমার ওপর ওঁর মায়ের দেখা-শোনার দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন। আমি তাই কিছুদিন ওঁর মার কাছে থাকব।

—তা হলে চল আমি তোমাকে দিয়ে আসছি।

—না পিতাজী, আমি একলাই যাব। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর জ্ঞানীজী ওকে একলা যেতে দিতে বাধ্য হলেন। শেষে এই কথা হল যে সুন্দরী দীওয়ানপুরে চলে যাবে আর জ্ঞানীজী দু-একদিন অমৃতসরে থেকে হরিদ্বারে ফিরে যাবেন।

॥ ৩৪ ॥

স্টেশন থেকে বেরিয়ে সুন্দরী নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ভাবতে দীওয়ানপুরের পথ ধরল। সে সময় সে একমনে শুধু বচন সিং-এর কথাই ভাবছিল। বচন সিং-এর কথা মনে হওয়ায় তার তখন শুধু কান্না আসছিল কিন্তু আগের মত আর সে ছটফট করছিল না।

রকম লোহা আগুনে দিলে তা অন্য ধাতুর মত সহজে গলে যায় না বরং তা আরও শক্ত আর মজবুত হয়ে ওঠে তেমনি বচন সিং-এর মৃত্যু সুন্দরীর মন আরও হিংস্র আর মজবুত করে তুলেছিল।

কোনো বিপদের সম্ভাবনার কথা ভেবে মানুষ যতখানি দুঃখ পায় আসল বিপদে পড়লে দুঃখ কিন্তু অতখানি হয় না। ঠাণ্ডা জলে স্নান করার আগে লোকে জলে নামতে ভয় পায় কিন্তু এক-আধটা ডুব দেওয়ার পর তারাই আবার দিব্যি অনেকক্ষণ ধরে জলে পড়ে থাকতে চায়। দুঃখ যতখানি তীব্র হবে ভেবেছিল সুন্দরীর দুঃখ তত তীব্র হল না। আর একটি কথা হল সুন্দরীর হৃদয় দুঃখ সহ্য করবার মত কিছুটা শক্তও হয়ে উঠেছিল।

সদাকৌর সেদিন সুন্দরীকে নানাভাবে তিরস্কার করতে ছাড়ে নি। কিন্তু বচন সিং-এর আদেশের কথা স্মরণ করে তাকে সব কিছু সহ্য করতে হল। দীওয়ানপুরে পৌঁছে সবার আগে সে সদাকৌরের বাড়িতে গেল। যখন ও সদাকৌরের বাড়ির দরজায় গিয়ে কড়া নাড়ল তখন রাত আটটা। ভেতর থেকে আওয়াজ এল— কে ?

সুন্দরীর বুকটা ধড়াস করে উঠল। সে জবাব দিল— বিবিজী ![১] আমি সুন্দরী।

সে জানত সদাকৌর প্রথম থেকেই তাকে ভীষণভাবে অপমান করে বসবে। বচন সিং যখন বেঁচে ছিল তখনই সে সুন্দরীর সঙ্গে যা ব্যবহার করত আর এখন তো একমাত্র ঈশ্বর ভরসা। কিন্তু আজ তিরস্কার সহ্য করার জন্য সে প্রথম থেকেই তৈরি হয়ে ছিল।

দরজা খুলে গেল। হাতে প্রদীপ নিয়ে সদাকৌর ওর সামনে এসে দাঁড়াল। সদাকৌরের দৃষ্টিশক্তি এত ক্ষীণ হয়ে এসেছিল যে দিনের বেলাও লোক চিনতে তার খুব কষ্ট হত। সুন্দরী তার মুখ থেকে অগ্নিক্ষরা গালিগালাজগুলো শোনবার জন্য উদগ্রীব হয়েই ছিল। সে অপেক্ষা করছিল সদাকৌরের মুখ থেকে কোন্ গালা-গালিটা প্রথম বার হয় তা দেখবার জন্য। কিন্তু সদাকৌর যখন দু হাত বাড়িয়ে সুন্দরীকে অভ্যর্থনা জানাল তখন সে অবাক হয়ে গেল।

১ সম্ভ্রান্ত মহিলার প্রতি সম্ভাষণ

সদাকৌর বলল, এস মা, এস। তোমার মঙ্গল হোক।

সুন্দরী সদাকৌরের পায়ে আছাড় খেয়ে পড়ল। সদাকৌর তাকে পা থেকে তুলে গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'খুকী, আজ তোর সিঁথির সিঁদুর ঘুচে গেল।'

সুন্দরী আর কিছু বলতে পারল না। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। অনবরজানের সঙ্গে দেখা করার পর আজ দ্বিতীয়বার তার মায়ের জন্য মনটা উতলা হয়ে উঠল।

বচন সিং কাল তার শেষ সাক্ষাৎকারের সময় সদাকৌর সম্পর্কে যে কথাগুলি সুন্দরীকে বলেছিল, সুন্দরী সদাকৌরকে সে কথাগুলি বলল। সুন্দরীকে বচন সিং বলেছিল, আমার কথা মনে করে তুমি মাকে বুকে করে রেখে দেবে। সুন্দরী এই-সব কথা এক এক করে সব সদাকৌরকে খুলে বলল। দুজনে দুজনের দুঃখের কথা শুনতে শুনতে মনে হতে লাগল বচন সিং যেন আজও তাদের মধ্যে বেঁচে রয়েছে।

অর্ধেক রাত পর্যন্ত দুজনে দুজনার দুঃখের কথা বলে কাটিয়ে দিল। দুজনেই ভাবতে লাগল, আজ যদি ভগবান এই সাক্ষাৎকার না ঘটিয়ে দিতেন তা হলে আমার কি অবস্থা হত— আমি কী করে এই দুঃসহ বোঝা বুকে করে বেঁচে থাকতাম। কথায় কথায় সুন্দরী জেনে নিল, সদাকৌরের টাকাপয়সা তো আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই মোকদ্দমায় তার গহনাগাঁটিগুলোও বিক্রি হয়ে গেছে। কিছু জমি-জমাও বাঁধা পড়েছে। কিছু জমি যা অবশিষ্ট আছে তাও শরিকী জমি। সদাকৌরের এখন একটা কানাকড়ি দেবারও ক্ষমতা নেই— এক টুকরো রুটিও মিলবে কি না তাতেও ওর সন্দেহ।

এ ছাড়া সদাকৌরের কথায় সুন্দরীর মনে হল পালা সিং তার দেওর জেঠাকে শেখাচ্ছে ওর জমি-জমা হাতিয়ে নিতে আর তারা এই উদ্দেশ্যে তৈরি হচ্ছে।

সুন্দরীর জর্জরিত হৃদয়ে আঘাত লাগল। পালা সিং-এর ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য তার মন আকুল হয়ে উঠল। কারণ তার জন্য সুন্দরীর ওখানে থাকাটা মুশকিল হয়ে উঠেছিল। বচন সিং-এর কাছে

করা তার প্রতিজ্ঞা, সদাকৌরকে দেখাশোনার দায়িত্ব, সে সব-কিছুই ভুলে গেল। কিছুক্ষণ পরে সদাকৌর ঘুমিয়ে পড়লে সুন্দরী পা টিপে টিপে উঠে দাঁড়াল আর কুলুঙ্গি থেকে দেশলাইয়ের বাক্সটা তুলে নিয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

তখন রাত বারোটা। চারি দিক অন্ধকারের কালো পর্দায় ঢাকা।

যে কুয়াটার ধারে পালা সিং অধিকাংশ সময় থাকে সুন্দরীর সে জায়গাটা চেনা ছিল। সে তাড়াতাড়ি সেই দিকে চলল। পিছন দিকের দেওয়ালের একটু ছেঁদা দিয়ে ঘরের ভেতরের সব-কিছু দেখা যেত— সে ওখানে গিয়ে লুকিয়ে রইল। ভেতরে একটা তেলের প্রদীপ জ্বলছে। যার আলোয় সুন্দরী দেখল পালা সিং আর তার দুই চেলা বসে বসে মদ খাচ্ছে আর গল্প করছে। বীর সিং বলছে— সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না।

পালা সিং বলল—কিন্তু তুই ওকে সত্যি সত্যি কাল জীবা সিং-এর বাড়ি যেতে দেখেছিস, না নেশার ঝোঁকে গুল মারছিস?

—মাইরি, গুরুর দিব্যি, আমি নিজের চোখে দেখেছি।

—তা হলে আর ওকে বেঁচে ফিরে যেতে দেওয়া হবে না। কালকেই কবজা করতে হবে। রোজ রোজকার ঝামেলা একেবারে চুকে যাক।

—আরে ভায়া, ওকে এনে তুলবেটা কোথায় শুনি?

—আরে উল্লুক কাঁহাকা, এনে কোথাও রেখে দেবার জায়গার কি কমতি আছে? কালকেই ওকে তুলে আন— ব্যস।

—কিন্তু ভায়া! ও আদালতে কবুল করেছে যে ও বেশ্যার মেয়ে।

—ফালতু কথা ছাড় তো। শিখরা এই-সব আজেবাজে ব্যাপারে পরোয়া করে না।

—আমার পরামর্শ হল, জীবা সিং-এর বাড়ির পিছন দিকটার দেওয়ালটা কাঁচা। ওই দেওয়ালে সিঁধ কেটে…

—ব্যস ব্যস, ঠিক আছে।

সুন্দরীর বুঝতে আর বাকি রইল না যে কী ব্যাপারে কথা হচ্ছে। ওরা আরও কিছুক্ষণ ধরে এভাবে মনের অভিপ্রায় প্রকাশ করল আর মদ খেতে খেতে ওখানেই শুয়ে পড়ল।

সেই অবসরে সুন্দরী এদিক ওদিক থেকে কিছু শুকনো ঘাস এনে জড়ো করে দু-তিনটা বাণ্ডিল তৈরি করল।

এর পর সে তার কাজ শুরু করল।

একটু পরে ওই কুটীর ধূ-ধূ করে জ্বলতে লাগল। তার লেলিহান অগ্নিশিখা অনেক দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল। সারা গ্রামের লোক ভয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল।

সুন্দরী পাশে দাঁড়িয়ে পাগলের মত হাসছিল— আজ ওর মুখে এক ভয়ানক ধরনের হাসি। যা দেখে সম্ভবত মৃত্যুও ভয়ে কেঁপে উঠবে।

সারা গ্রামে হৈ-চৈ পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি লোকজন এসে পৌঁছল। কিন্তু ওরা এসে পৌঁছবার আগেই ঘরের ছাদ ধসে পড়ল।

—এই তো ও এখানেই ছিল, এই তো এখানেই ছিল, বলতে বলতে কিছু লোক আগুন নেবাবার চেষ্টা শুরু করে দিল আর কিছু লোক অপরাধীকে খুঁজে বার করবার জন্য এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগল।

কে একজন বলল, সে একটি মেয়েকে নদীর দিকে দৌড়তে দেখেছে। সমস্ত লোক সেদিকেই দৌড়ল।

এই সময় আবার রব উঠল— দেখ, ওই পুলটার দিকে তাকিয়ে দেখ।

লোকে পুলের দিকে দৌড়ল। কিন্তু অন্ধকারে কেউ কিছু দেখতে পেল না। একটু পরে পুলের উপর থেকে আওয়াজ ভেসে এল— আমি খুনী··· এস, কার সাহস আছে এগিয়ে এস, আমাকে ধর। আমি দু জনের মৃত্যুর বদলা নেবার জন্য তিন জনকে খুন করেছি। আমি কোন নির্দোষ লোককে খুন করি নি। যে আমার মুকুট পায়ের নীচে ফেলে দিয়েছে, যে আমার বুড়ো বাপকে খুন করেছে আমি তাকেই মেরেছি। মনে রেখ শয়তান। একজন সতী জীবিত থাকতে তার ক্রোধ থেকে তার পতিঘাতীকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। গুরুজী সারা গ্রামের লোকের ওপর এর প্রতিশোধ নেবেন— যারা মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে আমার স্বামীর জীবন নিয়েছে আর আমার বাবার

খুনীদের বাঁচিয়ে দিয়েছে গুরুজী তাদের ক্ষমা করবেন না। কিন্তু আমি আসল অপরাধীদের তো উচিত শিক্ষা দিয়ে দিয়েছি। এস, এবার আমাকে ধরবে এস।

লোকে দেখল, সামনে নদীর পুলের ওপর দাঁড়িয়ে সুন্দরী...

গলা ফাটিয়ে সে তখন এই কথাগুলি বলে যাচ্ছে।

এই সময় পুলিসও ওখানে গিয়ে পোঁছল। আগে আগে পুলিসের সিপাহী আর পিছনে পিছনে গ্রামের লোকেরা পুলের দিকে এগিয়ে চলল।

ওরা অবাক হয়ে দেখল যে সুন্দরী শান্ত ভাবে পুলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সে একটুও নড়ছে না।

জনতা পুলের ওপর উঠল। সুন্দরী তখনও নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে জনতার অভিশাপ কুড়োচ্ছে।

পুলিসের সিপাহী তাকে ধরার জন্য আগে যেই এগিয়ে গেল অমনি সুন্দরী সেই পুল থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পুলের ওপর জনতা। তারা তখন হাত কামড়াচ্ছে।

পুলের ওপর দাঁড়িয়ে-থাকা লোকেরা দেখল, ও পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শান্ত বহতা নদীর জল সাদা হয়ে উছলে পড়ল। তার পর আবার সব চুপচাপ হয়ে গেল। পুলের নীচে গিয়ে লোকেরা লাল লণ্ঠন নিয়ে চারি দিকে খোঁজ করতে লাগল। লোকেরা তাকে খুঁজে বার করার জন্য অনেক চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু ওরা কিছুই দেখতে পেল না। সে চিরকালের জন্য ওদের দৃষ্টির আড়ালে মিলিয়ে গেল।

সবাই তাকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখেছিল। কিন্তু সে মরে গেল কি তীরে কোথাও গিয়ে উঠে পড়ল তা কেউ বলতে পারল না।

কিছুদিন পরে সুন্দরীর নামে পুলিস থেকে হুলিয়া বার হল। তাতে যে তাকে ধরে দিতে পারবে তার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হল। পুলিস ও গ্রামের লোক তার খোঁজ করতে লাগল।

অসমাপ্ত পর্বের বাকি অংশ

এই বই-এর প্রথমে পাঠকেরা পড়েছেন একদিন রাত্রে 'গুপ্তেশ্বর' নামে এক যাত্রী শ্যামদাসবাবুর ঘরে বসে তাঁকে একটি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পড়ে শোনাচ্ছিল। উপন্যাসটি বেশ বড। কিন্তু তা হলেও শ্যামদাসবাবু একেবারে একসঙ্গে পুরো উপন্যাসটি শুনতে চেয়েছিল।

যাত্রী উপন্যাসটি পড়তে লাগল আর শ্যামদাস শুনতে লাগল। এই ভাবে কখন রাত শেষ হয়ে গেল।

যে সময় যাত্রী প্রায় পুরো উপন্যাস পড়া শেষ করে ফেলেছে— খালি সামান্য কিছুটা বাকি তখন ভোর হয়ে গিয়েছে— সূর্যের সোনালী আভা ঘরে এসে ছড়িয়ে পড়েছে।

যাত্রীর এই উপন্যাসের শেষ পর্বটি শুনতে বেশ কিছু সময় কেটে গেল— কেননা, এই পর্বটি নানান সাইজের কাগজের ওপরে লেখা। কিছুটা লেখা হয়েছে স্কুলের খাতার এক পৃষ্ঠায়, আবার কিছুটা খবরের কাগজের মার্জিনে।

এই পাতাগুলো ঠিকঠাক করে নিয়ে যাত্রী পড়া শুরু করল। হঠাৎ ওর নজর পড়ল শ্যামদাসের মুখের দিকে। শ্যামদাসের চোখ বেয়ে পড়ছে শ্রাবণদিনের অঝোর ধারা। তার মুখ মৃতের মত হলুদ। ঠোঁট উঠছে কেঁপে। যাত্রী তার হাত ধরে বলল, এ কী, আপনি কাঁদছেন? শ্রীমানজী, এ তো আর বড় ধরনের কোনো ট্র্যাজেডি নয়।

মনে হল, শ্যামদাস যেন তার কথা শোনেই নি। তার কান্না থামল না।

যাত্রী কাগজের বাণ্ডিলটা টিপয়ের ওপর রেখে বলল, আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি শেষ পর্ব এখন আর পড়ছি না। তা ছাড়া এটি এখনও শেষ হয় নি।

শ্যামদাস চোখ মুছে বলল, না, না, আপনি পড়ে যান। ঠিক আছে। তার পর সে যাত্রীর হাত তুটো ধরে বলল, ওঃ, সত্যি, আপনার এ কাহিনী বড় করুণ।

যাত্রী পাণ্ডুলিপির কাগজগুলো গুছিয়ে নিয়ে আবার পড়া শুরু করল।

॥ ৩৫ ॥

(পূর্বের ঘটনার দু-বছর পরে)

লোকে শুধু 'গুপ্তেশ্বর' নামটার সঙ্গেই পরিচিত। কিন্তু তার চেহারা কেউ দেখে নি। বেশ অল্পদিনের মধ্যেই, ধরতে গেলে দু বছরের মধ্যেই সে প্রচণ্ড খ্যাতি আর যশ অর্জন করে। সব পত্র-পত্রিকায় গুপ্তেশ্বর লেখা পাঠাত ডাকে। আর সেই-সব পত্র-পত্রিকার সম্পাদককে জানিয়ে দিত যে তার পারিশ্রমিক যেন ওই নামে ওই ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই ঠিকানা হল : শ্রীমতী সদাকৌর। কেয়ার অফ : স্বর্গীয় সরদার জীবা সিং। পোঃ দীওয়ানপুর, জেলা অমৃতসর। অনেক পাঠক-পাঠিকা পত্র-পত্রিকা থেকে খোঁজ নিয়ে ওই ঠিকানায় চিঠি লিখে গুপ্তেশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সারা গ্রামের লোক গুপ্তেশ্বর যে কে তা জানত না। যে ভদ্রমহিলার কাছে পারিশ্রমিকের টাকা যেত তার কাছ থেকেও এ ব্যাপারে কোনো সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যেত না যাতে গুপ্তেশ্বরের কোনো খোঁজ খবর করা সম্ভব হয়।

গুপ্তেশ্বর অমৃতসরের ভাঙ্গতাওয়ালে দরওয়াজায় আট আনা মাসিক ভাড়ায় একটা ছোট্ট ঘরে থাকত।

কেউ তাকে কখনও কারও সঙ্গে কথা বলতে দেখে নি। দিনের বেলাতেও সে সব সময় ঘরের ভেতর ছিটকিনি দিয়ে লেখাতে মগ্ন থাকত। আর রাতের বেলা সে শহরের বাগান আর পার্কগুলো ঘুরে বেড়াত। অনেক বাগানের মালিরা তাকে সে সময় গান গাইতে কিংবা কাঁদতে দেখেছে। অনেকে তাকে 'মস্ত্' বলে ডাকত।

কখনও কখনও সে জনবহুল জায়গাগুলো ঘুরে বেড়াত। কখনও পথচারীদের ডেকে ডেকে নানান প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত। তার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে বেশির ভাগ লোক তাকে দেখলেই অন্য পথ ধরত। কেউ কেউ আবার তার কাছে এসে দু-দণ্ড কথা বলেও যেত।

ওর ঘরে তেমন কোনো জিনিসপত্র ছিল না। ঘরের এক কোণে ওর শোওয়ার জন্য ধুলোর ওপর পাতা একটা চট ছিল। আর এক

কোণে ছিল তিনটি ইট দিয়ে তৈরি রান্নার একটা উনুন। এই উনুনের পাশে একটি ছোট তাওয়া। একটি থালা আর কিছু শুকনো কাঠ রাখা ছিল। শোবার জায়গার কাছে একটা ইট দাঁড় করিয়ে রেখে তার ওপর একটি প্রদীপ রাখা হয়েছিল। তার সামনে বসে হাঁটুর ওপর কাঠের সেলেটের মত একটা জিনিস রেখে তার ওপর কাগজ রেখে সে লিখত।

পাশের ঘরগুলোতে টাঙ্গা মিস্ত্রি, কামার, ছুতোর মিস্ত্রি, বড়ি আর হালুইকরদের দোকান ছিল।

আজ সকাল থেকেই সে নিজের ঘরে বসে লিখছিল। তার পা পর্যন্ত একটি ছেঁড়া কম্বলে ঢাকা। দেখে মনে হয় সে রাতে লেপের কাজ এই কম্বল দিয়েই চালায়। তার ডান দিকে অনেক আজেবাজে কাগজ পড়ে ছিল। সেই-সব কাগজের এক পিঠে ছেলেমেয়েদের ইস্কুলের টাস্ক লেখা, আর এক পিঠে গুপ্তেশ্বরের হাতের লেখা। ঠাসা অক্ষরে পাতাগুলো নীল হয়ে গিয়েছে।

বিকেল হয়ে গিয়েছে। সারাদিন লেখার পর সে কলম রেখে দিয়ে পাতাগুলো গুছিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। দরজার কাছে এসে সে একবার আলস্যভরে আড়ামোড়া ভাঙল। কোমর সোজা করে হাতের আঙুলগুলো একবার মটকে নিল।

পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাগুলো গোনা শেষ হয়ে গেলে সে আজ যেটুকু লিখেছিল তার ওপর একবার চটপট নজর বুলিয়ে নিল। আর একবার তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল এই কথাগুলো—

"এই পর্বটাই— অন্তিম পর্ব। কিছুটা এখনও বাকি। আজই লেখাটা শেষ করব। তার পর এই নিরন্তর দুঃখময় জীবন থেকে আমার ছুটি। কিন্তু আহা! আমার আর একটা কাজ যে এখনও বাকি রয়ে গেছে। আমি হাজার চেষ্টা করেও সফল হতে পারলাম না। আমি তো মিছিমিছি অন্ধকারে তলোয়ার চালাচ্ছিলাম। ভাগ্যে যদি সাফল্য না লেখা থাকে তো আমি আর কি করব। হ্যাঁ, এইরকম একটা অসাধ্য কাজের পিছনে বেশি সময় নষ্ট করতে পারব না। যা হবার নয় তা হবে না।"

এর পরে কিছুক্ষণের জন্য কিছু একটা ভেবে নিয়ে সে কোনো এক গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। যেমন গাড়ি ছেড়ে দেওয়ার একটু পরে যাত্রীর যদি মনে পড়ে যে তার পকেটে মানিব্যাগটা নেই, তেমনি কাগজ শেষ হয়ে গেলে তার মনের অবস্থা ওই রকমই হয়ে গিয়েছিল।

ঘরের এক কোণে যেখানে অনেক লেখা কাগজপত্র পড়ে ছিল তার মধ্যে কাগজগুলো রেখে দিয়ে, মাথার নীচে হাত দুটি রেখে সে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল।

শহরে পয়সাই সব-কিছু। সেখানে পয়সা ছাড়া নিশ্বাস নেওয়াই কঠিন। আর ওর পকেটে সেই পয়সাই নেই। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই ও বেরিয়ে পড়ল যেমন করে পাখা-কাটা পাখি খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে।

এ ছাড়া আরও দুর্ভাগ্যের কথা এটা শীতকাল। শীতের হাত থেকে বাঁচবার জন্য ওই গরিব মানুষের একটি ছেঁড়া কোটই শুধু সম্বল। তাও সেটা ঢোল্লা। সেলাই ছেঁড়া, বোতাম খোলা। ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচবার জন্য দুদিকে ছেঁদা করে সুতো দিয়ে কোটটি বাঁধা। পরনে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা এক জাঙিয়া। ওর পায়ের নীচেটা ধুলো-কালিতে এমন অবস্থা হয়ে আছে যে দেখে মনে হয় যে ও যেন রেলের কোনো মজুর। ওর মুখ আর হাতেরও ওই অবস্থা। কিন্তু ফর্সা রঙের জন্য ওকে ততখানি কদর্য দেখাচ্ছিল না। ওর পায়ে কোনো জুতো ছিল না। পায়ের তলাটা ফেটে ফেটে গিয়েছিল।

সে শীতে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে কাগজের খোঁজে কয়েক জায়গায় ঘোরাঘুরি করল। কিন্তু সব-কিছুই ব্যর্থ হল। অর সবচেয়ে বেশি রাগ হল ওর ভাগ্যের ওপরে। ও নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরে এল বটে কিন্তু ওর ভিতরের আগুন ধিক ধিক করে জ্বলতে লাগল। ঘরে এসে ওর মনে হল এই পাণ্ডুলিপিটা সে উনুনে ফেলে দেবে। তার পর তার দুঃখময় জীবনের ওপর সে যবনিকা টেনে দেবে। এ কাজের জন্য সে নিজেকে প্রস্তুত করল। সমস্ত কাগজ একত্র করে সে উনুনে ঢোকাল। কিন্তু চৌকির নীচে থেকে দেশলাইয়ের বাক্সটা তুলে দেখল সেটি খালি। এতে ওর রাগ আরও বেড়ে গেল।

সে আগুনের সন্ধান করতে বাইরে বেরিয়ে গেল।

এই সময় ওর চিন্তাধারা পালটাতে শুরু করল। ও অনেকক্ষণ ধরে দেওয়াল ধরে ধরে বাইরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। ভেতরে ঢুকে সমস্ত পাণ্ডুলিপির কাগজ উনুন থেকে বার করে সে আগের জায়গায় রেখে দিল আব ভাগ্য অন্বেষণেব জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

যেতে যেতে ওর মনে পড়ল জুয়াড়ী দলের এক মহাজনের কথা। সে মহাজনের কাছে গিয়ে একটা টাকা ধার চাইল। টাকাটা সে পেল বটে কিন্তু শর্ত থাকল, সুদে আসলে তাকে দু টাকা ফেরত দিতে হবে।

সে সোজা বাড়ি চলে এল। সমস্ত পাণ্ডুলিপির কাগজ এক জায়গায় করে বগলে নিয়ে সে রেল স্টেশনে গিয়ে পৌঁছল। কয়েক ঘণ্টা পরে সে লাহোর বাজারে গিরে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। তার চারি দিক নৈরাশ্যের জালে ছেয়ে গেছে। কেউ ওর পাণ্ডুলিপি নিতে চাইল না। একে তো ওই রদ্দি কাগজের বাণ্ডিল। তার পর লেখকের ওই হতচ্ছাড়া চেহারা দেখে প্রকাশকরা যে দর দিতে চাইল তা শুনে ও মনে মনে দারুণ আঘাত পেল। দশ-পনের টাকা! ব্যস। ও যদি প্রকাশকদের বলত যে সে গুপ্তেশ্বর তা হলে তারা তার পায়ে লুটিয়ে পড়ত। কিন্তু ও তা বলতে পারল না। পলাতক খুনীর মত সে সকলের চোখের সামনে থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল।

ফেরার সময় তার কাছে শুধু একটা সিকি পড়ে ছিল। তাও সেটি অচল। সে বিনাটিকিটেই ট্রেনে চেপে বসল। গাড়ির বেঞ্চের ওপরে একটি খবরের কাগজের কয়েকটি পাতা পড়ে ছিল। সামনে বসা এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে পেনসিল চেয়ে নিয়ে সে মার্জিনের সাদা জায়গাগুলোতে লিখতে লাগল—কোথাও আর এতটুকু ফাঁকা জায়গা পড়ে থাকল না। এই সময় যাত্রীর হাতে পাণ্ডুলিপির শেষ পৃষ্ঠাটি ছিল। ওই খবরের কাগজ— তার মার্জিনে সে লিখেছিল সেই লাইনগুলো পড়ে যাত্রী থেমে গেল। সে পাণ্ডুলিপির কাগজগুলো টিপয়ের ওপর রেখে দিল। কারণ এটাই এ উপন্যাসের শেষ পর্ব।

এইটি পড়া শেষ করার পর গুপ্তেশ্বর একবার শ্যামদাসবাবুর দিকে তাকাল। তার মুখের চেহারা হলুঁদ হয়ে গিয়েছে। গুপ্তেশ্বর সহানুভূতিভরা গলায় বলল, অনিদ্রার জন্য আপনার শরীর হয়তো খুব খারাপ হয়ে থাকবে। আপনি একটু শুয়ে পড়ুন।

—না, না, আপনি পড়ুন। শ্যামদাসবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল।

—ব্যস, গুপ্তেশ্বর জবাব দিল। উপন্যাসটি এখানেই শেষ। শুধু উপসংহারের একটুখানি বাকি।

—শেষ হয়ে গেল? শ্যামদাস যেন মনের কোনো গোপন ব্যথা চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করল— আর কত বাকি আছে?

গুপ্তেশ্বর শ্যামদাসের ক্লান্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে বলল, আর সামান্য একটু। বাবু জিজ্ঞাসা করল— কিন্তু গুপ্তেশ্বর সাহেব, মাফ করবেন। আর-একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি। এই উপন্যাসের প্লটটা কি কাল্পনিক···

গুপ্তেশ্বর বলল— না। এটি একটি সত্যি ঘটনা। আমি একজনের কাছ থেকে কাহিনীটি শুনেছি। আমি শুধু ওই সত্য ঘটনার ওপর উপন্যাসের রঙ চড়িয়েছি। সম্ভবত উপন্যাসের পক্ষে এই রকম একটা প্লট পাওয়া সত্যি লাভজনক। এই ধরনের উপন্যাস পড়লে জীবন ভরে ওঠে।

গুপ্তেশ্বরবাবু রুমাল দিয়ে ঘাম মুছে বলল—কার কাছ থেকে এ উপন্যাসটি শুনেছেন আপনার কি মনে আছে?

—হ্যাঁ। স্বয়ং সুন্দরীর মুখ থেকে।

—আচ্ছা! এ-সব সুন্দরীই আপনাকে বলেছে? ওর সঙ্গে আপনার কোথায় দেখা হল? বলতে বলতে শ্যামদাসবাবু ঘাম মুছল।

—এক গ্রামে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

—আর আপনি উপন্যাস লিখে ফেললেন?

—হ্যাঁ, কাহিনীটি আমার কাছে খুব হৃদয়গ্রাহী বলে মনে হয়েছিল।

শ্যামদাসের মুখে ক্রোধের চিহ্ন ফুটে উঠল। রাগ সম্বরণ করে সে বলল, মাফ করবেন, আপনি যে ধরনের উঁচুদরের লেখক তাতে করে

এমন একটা শস্তা কাহিনীর ওপর আপনার কি করে নজর পড়ল? আপনি তো কল্পনাশক্তি দিয়েই এর চেয়ে অনেক ভাল প্লট তৈরি করতে পারেন।

—ঠিক আছে। কিন্তু এর চেয়ে বেশি সাফল্যের জন্য আমি কোনো চেষ্টা করি নি।

—মাফ করবেন। আমার একটা খারাপ স্বভাব যে আমি যা ভাবি মুখের ওপর বলে দিই। আপনার সাহিত্য-প্রতিভার আমি অন্ধ ভক্ত। কিন্তু আপনার কথাটা আমার কাছে ভাল ঠেকছে না। আপনার কথায় আমার একটা গল্প মনে পড়ে গেল। একবার এক সাঁতারু সাঁতার দেখাবার একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিল। যখন লোকেদের হাততালির মোহে সে উলটো-সিধে সাঁতার কাটতে লাগল তখন এক সময় দমবন্ধ হয়ে ও ডুবে মরে গেল। জল খেয়ে পেট ফুলে ওঠার পর যখন জলের ভেতরে ডুবে গেল তখন যে-সব দর্শক তামাশা দেখতে এসেছিল তারা হাততালি দিতে দিতে বলতে লাগল —দেখ ভাই! ঠিক মড়ার মত লাগছে— ঠিক মড়া— তা আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে ওই বেচারী হতভাগী মেয়েটি যে বেঁচে থাকতে প্রতি মুহূর্তে শুধু কষ্ট পেয়েছে তার ওই দুঃখময় জীবন-কাহিনী নিয়ে তাকে না জানিয়ে অমন করে আপনার কিছু লেখা উচিত হয় নি। সেই যে কথায় বলে না— খাসি কাঁদে প্রাণের তরে আর কসাই কাঁদে মাংসের তরে।

—দয়ালু গুপ্তেশ্বর সাহেব! আমার কথাটা হল আপনার প্রতিভার ওপর এতে একটা কলঙ্কের দাগ পড়ে গেল। আর মনে হল আপনি অত্যন্ত কঠোর। ওর গরম চোখের জল আর ঠাণ্ডা দীর্ঘনিশ্বাসকে বিক্রি করার চেষ্টা না করে আপনার উচিত ছিল ওই হতভাগিনী মেয়েটার কোনো উপকার করা। চোখ নামিয়ে গুপ্তেশ্বর বলল, সত্যি, আমার ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু নিতান্ত বাধ্য হয়েই আমাকে এমন করতে হয়েছিল।

বাবু বলল, সেটা তো কোনো খারাপ কিছু নয়।

একমাত্র ঈশ্বরই অভ্রান্ত। কিন্তু মনে হচ্ছে সুন্দরী মরার কিছু

আগে আপনাকে নিজের দুঃখ-দুর্দশার ইতিহাস বলে গেছে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। জলে ডোবার ঠিক দুদিন আগে সে আমার কাছে তার জীবনকাহিনী বলে যায়।

—তা হলে ওর নদীতে ডোবার খবর আপনি কী করে জানলেন?

—ওই সময় আমি ওই গ্রামেই ছিলাম।

শ্যামদাসের মনে হল কে যেন ছোরা দিয়ে তার গা থেকে মাংস কেটে কেটে নিচ্ছে। তার নাড়ীতে নাড়ীতে, অঙ্গে অঙ্গে একটা ব্যথা উঠছে। একটু থেমে সে বলল, সাবাশ! গুপ্তেশ্বর সাহেব! আপনি সত্যি অসাধারণ কাজ করেছেন। এখন যে পাতাগুলো খালি আছে তাতে লেখকের মুখবন্ধে আপনি আপনার পরিচয় লিখবেন তাই তো? কিন্তু আপনি আজই লেখা শেষ করে ফেলুন। আর একটা প্রার্থনা। আমার আশা, আপনি এ প্রার্থনা না-মঞ্জুর করে আমার হৃদয়টা অমন করে ভেঙে খান খান করে দেবেন না। প্রার্থনাটা এই যে, আপনি আজ থেকে আপনার এই সেবকের বাসাতেই থাকুন। আপনার পবিত্র সাহচর্যে এসে আমার মত পাপীর জীবনধারাটা কিছু বদলে যাবে। আর ওই হতভাগিনী মেয়েটির বিষয় আপনি আর যা যা জানেন আমাকে বলুন।

গুপ্তেশ্বর খুশি হয়ে জবাব দিল, আমি যদি এই উপন্যাসটি শেষ করতে পারতাম তা হলে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতাম।

—কী? তার মানে?

—তার মানে এই উপন্যাসের অসমাপ্ত পর্বের মত আমার জীবনেরও অন্তিম পর্ব এখন বাকি আছে।

—হায়! হায়! কী বললেন? আপনি··· আপনি···।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার বেঁচে থাকার আর অর্থ নেই। আমি··· আমি এক··· বলতে বলতে গুপ্তেশ্বর আবার থেমে গেল। শ্যামদাসকে বার বার জিজ্ঞাসা করাতেও সে আর কিছু বলল না।

একটু পরে গুপ্তেশ্বর আবার বলল,

—আমি আপনাকে আর-একটু কষ্ট দিতে চাই।

—এ তো খুব সৌভাগ্যের কথা। বলুন, আপনার কি আদেশ?

একটুখানি চুপ করে থেকে গুপ্তেশ্বর বলল— আজ মনে হচ্ছে আপনি মানুষের বেশে সাক্ষাৎ এক দেবতা। আপনাকে যে মনে মনে আমি কতখানি সম্মান করি তা আপনাকে ভাষায় বোঝাতে পারব না। আমি আপনাকে একটু কষ্ট দিতে চাই। আমার মনে হচ্ছে ঈশ্বর আপনার মত লোককে মানুষের উপকারের জন্য পাঠিয়েছেন। আপনি আমার একটা উপকার করবেন ?

তার কথা শুনে শ্যামদাসবাবু অধোবদন হয়ে রইল। সে বলল, সারা জীবনের জন্য আমাকে আপনার গোলাম ভাববেন। আমার দ্বারা আপনার যা উপকার হতে পারে তা নিঃসংকোচে আমাকে হুকুম করুন। কিন্তু ভগবানের দোহাই আমাকে আপনি অমন করে প্রশংসা করবেন না। আমি এক নীচ আর পতিত মানুষ। জীবনে যা পাপ করেছি, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপের কথা কখনও ভুলব না। সেই পাপের কথা যদি আপনাকে বলি তা হলে ভয়ে আপনার রোম খাড়া হয়ে উঠবে। এইজন্যই বলছি, আপনি যে-সব উপমা আমার জন্য প্রয়োগ করেছেন, আমি তার যোগ্য নই। এই-সমস্ত সম্মানসূচক কথা আপনার সম্পর্কেই খাটে।

কৃতজ্ঞতায় গুপ্তেশ্বরের চোখে জল এসে গেল। সে ধন্যবাদ দেবার জন্য মাথা নিচু করে বলল—

আপনি আমাকে অনেক উঁচুদরের মানুষ বলে মনে করছেন। আমি তার হাজারগুণের এক গুণও নই। আপনার এই বিনয় দেখে বুঝতে পারছি আপনি কত ভদ্র।

—আমার কাছে আপনি পরমাত্মারই রূপ।

—গুপ্তেশ্বরের চোখ নিচু হয়ে গেল।

শ্যামদাসবাবু বলল, তাড়াতাড়ি হুকুম করুন। গুপ্তেশ্বর বলল, লাহোরে রুটিওয়ালাকে আমি যে রুমালটা দিয়ে এসেছিলাম আপনি কোন রকমে আমাকে সে রুমালটা আনিয়ে দিন। লাহোর রেল স্টেশনের সামনেই তার দোকান। দ্বিতীয় কথা হল, যদি এই উপন্যাসটি ছাপাবার ব্যবস্থা করতে পারেন তো করুন। যা পারিশ্রমিক পাওনা হবে তা উপন্যাসের শেষে যে ঠিকানা দেওয়া আছে সেখানে

পাঠিয়ে দেবেন।

বাবু শ্যামদাসের শরীরে মনে হচ্ছিল যেন আর হাড়-মাংস নেই। সে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। তার চোখ গুপ্তেশ্বরের চোখে নিবদ্ধ। যে রকম ভাবে কেউ রাস্তা ভুল করে কিছু দূর এগিয়ে যাবার পর খেয়াল হলে আবার পিছনে ফেরে, গুপ্তেশ্বরের কথায় শ্যামদাসবাবুর যেন তেমনি ধ্যান ভাঙল। সে বলল, ক্ষমা করবেন— আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। হ্যাঁ, আপনি যেন কী বলছিলেন ?

যাত্রী তার কথাগুলোর আবার পুনরাবৃত্তি করল।

শ্যামদাস তার অন্তরে দাউ দাউ করে জ্বলা দাবানলকে প্রশমিত করে বলল, আপনার হুকুম আমি মাথা পেতে নিচ্ছি। আমি আপনার এই দুই হুকুম তামিল করতে পারলে খুশি হব। হ্যাঁ, আপনি কি যেন নামটা পড়ছিলেন, সদাকৌর, তাই না ? উনি কি আপনার কোনো আত্মীয় ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আর আপনার দৌলতখানা ?[১]

—আমার দৌলতখানা এখন আপনার শ্রীচরণ। এইজন্যই একে আমি গরিবখানা বলতে পারছি না।

—এ তো আপনার ভদ্রতার কথা। কিন্তু আপনি থাকেন কোথায় ?

গুপ্তেশ্বর কাগজগুলো এক জায়গায় গোছাতে গোছাতে বলল— আমার মনে হচ্ছে, আপনি খুব ক্লান্ত। এইজন্য এখন একটু বিশ্রাম করে নিন। আপনাকে তো আবার কাজে বেরুতে হবে।

—না, আজ তো রবিবার। যাক এ-সব কথা। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বাবু আবার বলল, ও হ্যাঁ, আপনার রুমাল। আজ রবিবার। আমি ভাবছি ওটা আমি নিজে গিয়েই নিয়ে আসব। রুটিওয়ালার নাম ঠিকানা তো আপনি বলেই দিয়েছেন।

গুপ্তেশ্বর রুটিওয়ালার ঠিকানা আবার বলে দিল। বলল, বাবুজী ! আপনি এখানে কতদিন আছেন ?

—তা সতেরো-আঠারো বছর হয়ে গেল।

১. বাড়ি

—তা হলে তো এই শহরের সবাইকে আপনি চেনেন ?

—হ্যাঁ, আপনার কৃপায় অনেকেই আমাকে জানে।

গুপ্তেশ্বর একটু সাহস করে বলল, আপনি কি আমায় একজনের খোঁজ করতে একটু সাহায্য করবেন ? আমি তাকে দু-আড়াই বছর ধরে খুঁজছি। কিন্তু তার কোনো হদিশ পাই নি। আর আপনি শুনে হাসবেন যে, আমি যাকে খুঁজছি তার চেহারাটাই কোনোদিন দেখি নি। তার চেহারাটা কেমন তাও জানি না। ওর চেহারাটা কেমন জানলে আমি এর মধ্যে ঠিক খুঁজে নিতে পারতাম।

বাবু বলল, আপনি ওর সম্পর্কে যা জানেন, আমাকে বলুন। আমার মনে হয়, কোথাও না কোথাও খোঁজ পেয়ে যাব। রেলের কাজে কত নিত্যনতুন লোক এখানে আসে। পৃথিবীতে এমন কি কোন মানুষ আছে যাদের রেলকর্মীদের নজরে পড়তে হয় না ? আপনি ওর সম্পর্কে যা জানেন তাড়াতাড়ি বলে দিন।

গুপ্তেশ্বর বলে দিল, আমি শুধু ওর নামটাই জানি—আর কিছু নয়।

—ওর নাম কি ?

—তার নাম তারাচাঁদ··· হায় হায় এ কী ? মনে হচ্ছে রাতে আপনার ঘুম হয় নি। তাই বোধ হয় আপনার শরীরটা আজ ভাল নেই। এ-সব কথা এখন থাক। আপনি আজই লাহোরে চলে যান। পরে দেখা যাবে। আপনি এখন কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন। আপনার চেহারা দেখছি একেবারে হলদে হয়ে গিয়েছে।

রুমালে মাথা মুছে, একটু কেশে গলার আওয়াজটা ঠিক করে নিয়ে বাবু আবার বলল, না, না, আপনি ভাববেন না। মাঝে মাঝে আমার এমন হয়। একটু পরেই ঠিক হয়ে যাবে।

—হ্যাঁ, এই তারাচাঁদ আগে কোথায় থাকত ?

—আগে থাকত শেয়ালকোটে··· (বাবুর মুখের দিকে দেখে) না, শ্রীমানজী ! আপনার আওয়াজ থর থর করে কাঁপছে। আপনি উঠে খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ুন।

বাবু শ্যামদাস আরও বেশি বিচলিত হয়ে উঠল। সে রুমাল বার করে মুখে হাওয়া করতে করতে বলল, ওঃ··· ওকে আমি খুব

ভালভাবে জানি। এই সময় শ্যামদাসের মুখ মড়ার মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ওর হাত ছুটো মনে হচ্ছে সেঁধিয়ে যাচ্ছে। ও হাফানি রোগীর মত নিশ্বাস ফেলছিল।

—আপনি ওকে চেনেন? খুব ভাল করে চেনেন?

গুপ্তেশ্বর খুশি হয়ে জিজ্ঞাসা করল। সে এত খুশি হল, যেন মনে হচ্ছিল সে হারানিধি ফিরে পেয়েছে। সে আর থাকতে পারল না। উঠে দাঁড়াল। শ্যামদাসবাবুর অস্বস্তির কথা তার মনেই রইল না। সে তাড়াতাড়ি বলল, দয়া করে তাড়াতাড়ি বলুন, ও কোথায় থাকে? আপনি কি ওর সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দিতে পারেন?

—একবার কেন, একশোবার পারি। ওর সঙ্গে আমাব খুবই জানাশোনা। গুপ্তেশ্বরের দিকে তাকিয়ে শ্যামদাস এই কথা বলল।

গুপ্তেশ্বরের তখন আনন্দ আর ধরে না। খুশিতে উতলা হয়ে সে জিজ্ঞাসা করল: ও কোথায় থাকে? কী কাজ করে?

—লাহোরে থাকে। আর সরকারী দপ্তরে কাজ করে।

—দয়া করে আজকেই ওর সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দিন। কখন দেখা করাবেন?

—আমার ইচ্ছে সন্ধ্যাবেলাই ওকে নিয়ে আসব।

—ওঃ বাবুসাহেব! হাজার বার ধন্যবাদ। কোটি কোটি ধন্যবাদ। আপনি তো আমাকে একেবারে কিনে নিয়েছেন। আপনি আমার জীবনের অনেক বড় সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন। আমি বুঝতে পারছি আপনার শরীর খুব খারাপ কিন্তু তবু আমি আপনাকে অনুরোধ না করে থাকতে পারছি না। আপনার যত কষ্টই হোক-না কেন, আপনি আজই তার সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দিন।

একটু পরে দুজনেই বিশ্রামের জন্য চারপাইয়ের ওপর শুয়ে পড়ল। কিন্তু সারা রাত ধরে তাদের ঘুম এল না।

যখন খাওয়ার সময় এল তখন চাকর খাবার তৈরি করল। দুজনে স্নান করে খাওয়াদাওয়া সেরে নিল।

গুপ্তেশ্বরের উপন্যাসের অসমাপ্ত পর্ব শেষ করার জন্য অনুরোধ

করে শ্যামদাস সওয়া বারোটার ট্রেনে লাহোর চলে গেল।

গুপ্তেশ্বরের মুখ আজ সাফল্য ও খুশিতে ঝলমল করছিল। সারা জীবনেও সে এরকম খুশি কোনদিন হয় নি।

আজ তার কাগজের অভাব নেই। লেখার উপকরণও রয়েছে প্রচুর। লেখার জন্য ভাল ঘরও রয়েছে। ওর মন আজ এমন খুশি সম্ভবত তেমন খুশি কখনও হয় নি। কিন্তু আজ ওর কাছে লেখার মত কোন বিষয়ই নেই। যখন শিকারি শিকার পেয়ে যায় তখন তার কাছে শিকার ধরার যন্ত্রপাতি কাজে লাগে না। আজ যখন শিকার করার সমস্ত সরঞ্জাম তার হাতের সামনে রয়েছে তখন শিকার ধরার শখ তার ঘুচে গেছে! খাবার খেয়ে সে চারপাইয়ের ওপর শুয়ে পড়ল। কিন্তু তারাচাঁদের সঙ্গে তার দেখা হবার কথা ভাবতে ভাবতে তার কিছুতেই ঘুম এল না।

সে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছিল কখন শ্যামদাসবাবু তারাচাঁদকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। সে এই ছ-সাত ঘণ্টা, মিনিট আর সেকেণ্ড গুনে গুনে কাটাল। ওর দৃষ্টি ছিল সব সময়ে সামনের দেওয়ালে টাঙানো ঘড়িটার দিকে।

অবশেষে পাঁচটা বাজল। গুপ্তেশ্বর বাইরে দরজার কাছে গিয়ে পায়চারি করতে লাগল। তার মন উতলা হয়ে উঠছিল। কেউ টাঙ্গায় চড়ে আসছে, যাচ্ছে। ওর ছটফটানি একটু একটু করে বেড়েই চলল।

অবশেষে একটা টাঙ্গা এসে থামল। কিন্তু শ্যামদাসবাবু একলাই টাঙ্গা থেকে নামলেন। সে এসে গুপ্তেশ্বরের উতলা অবস্থা দেখে বলল, উনি আসছেন।

শ্যামদাসবাবু এ সময় হাঁফাচ্ছিল। তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। তার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছিল। ওর অবস্থা দেখে গুপ্তেশ্বরের খুব চিন্তা হল। সে বলল, আপনার এ অবস্থা কেন? এখনও পর্যন্ত আপনার শরীর ভাল হয় নি?

শ্যামদাসবাবু নিজের দুর্বলতা ঢাকার চেষ্টা করলেন। কোনরকমে হাসবার চেষ্টা করে বললেন, না, না ওজন্য কিছু ভাববেন না। গাড়ি

লেট দেখে আমি লরিতে করে চলে এসেছি। পথে কোথায় একটা অ্যাকসিডেণ্ট হয়। লরিটা একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগায়। বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে। আমার সেরকম চোট লাগে নি। কিন্তু এই দুর্ঘটনার দৃশ্য দেখে আমার মনটা কীরকম করছে।

গুপ্তেশ্বর ভীষণ বিচলিত হয়ে বলল, তা হলে আপনি ভেতরে চলুন। বিশ্রাম করবেন। আমি চাকরটাকে বলছি, গরম গরম দুধ এনে দেবে। আর…

গুপ্তেশ্বরকে থামিয়ে দিয়ে শ্যামদাস বলল, না শ্রীমানজী। আমার এদিক থেকে কোন কষ্ট নেই। আমি একটু স্টেশন যাচ্ছি। আমার জেনারেল অফিসার আজ একটা প্রাইভেট কাজে স্টেশনে আসছেন। আমাদের দু-চারজন টিকিটবাবুর তাই স্টেশনে থাকাটা দরকার। এই নিন আপনার রুমালটা।

গুপ্তেশ্বরকে রুমালটা দিয়ে আর কোন কথা না বলে শ্যামদাসবাবু টাঙ্গায় চড়ে বসল। যাওয়ার সময় বলে গেল, মিস্টার তারাচাঁদ ছটা-সাতটা নাগাদ এসে যাবেন। আপনি ওঁর জন্য অপেক্ষা করবেন। আমার মনে হয় উনি সম্ভবত চারটে পঁয়তাল্লিশের ট্রেন ধরেছেন।

দেখতে দেখতে টাঙ্গাটি পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সওয়া ছ'টার জায়গায় সাতটা বেজে গেল কিন্তু তারাচাঁদ এখনও পর্যন্ত এল না। গুপ্তেশ্বর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রাস্তায় যে-সব পথচারী যাওয়া-আসা করছিল তাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল।

অন্ধকার বেড়ে চলেছিল। এই সময় গুপ্তেশ্বর দেখল, এক দীর্ঘকায় ব্যক্তি সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করছে, 'বাবু শ্যামদাসের বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন?'

গুপ্তেশ্বর বুঝতে পারল এই ব্যক্তিই তারাচাঁদ। সে বলল, আসুন। আপনিই কি মিঃ তারাচাঁদ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বলতে বলতে সে তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে এল। গুপ্তেশ্বর ভেতরে এসে তাকে বসতে বলল।

তারাচাঁদের পরনে ছিল ওভারকোট। চোখের অসুখের জন্য

কিংবা অপর কোন কারণে তার চোখে ছিল সান গগ্‌ল্‌স। তার মাথার পাগড়িটা অদ্ভুত ভাবে পরা। ওভারকোটের কলার দুটো তুলে দেওয়া। তাতে মনে হয় যে সে শীতকে বড় ভয় পায়।

অনেকক্ষণ ধরে দুজনে চুপচাপ মুখোমুখি বসে রইল। এই নিস্তব্ধতাকে ভাঙার জন্য গুপ্তেশ্বর বলল, আচ্ছা, আপনিই কি তারাচাঁদ? সে কোন কথা বলল না। শুধু মাথা নেড়ে হাঁ বলে উত্তর দিল।

গুপ্তেশ্বর আবার বলল, আমি এতদিন ধরে আপনারই খোঁজ করছিলাম। অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, আপনার রক্ত পান করার জন্যই আমি এখনও পর্যন্ত বেঁচে রয়েছি। বলতে বলতে গুপ্তেশ্বরের আওয়াজ তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠল। চোখ উঠল লাল হয়ে।

তারাচাঁদ আগের মতনই শান্ত হয়ে বসে ছিল। সে গম্ভীর গলায় বলল, আমি আপনার কথার অর্থ বুঝতে পারলাম না।

গুপ্তেশ্বর এবার রাগে কাঁপতে লাগল। তার শিরায় শিরায় প্রতিহিংসা ফুটে উঠল। সে নিজেকে সামলাতে পারল না। বলল, কি বললি শয়তান, তুই আমার কথার মানে বুঝতে পারছিস না? ঠিক আছে। এই কথার মানে বোঝাবার জন্যই তো আমি এতদিন ধরে তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

তারাচাঁদ আবার বলল, কিন্তু কোন কথা শুরু করার আগে আমি কি আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে পারি?

নিশ্চয়? গুপ্তেশ্বর চেঁচিয়ে উঠে বলল, তুই গুরদেই বলে কোন মেয়েকে চিনতিস?

—চিনতাম। কিন্তু তার সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক?

কী সম্পর্ক বলব বলেই তো তোর খোঁজ করছিলাম! হাঁ, তোর সঙ্গে ওর কী সম্পর্ক ছিল?

—সে ছিল আমার স্ত্রী।

—ও এখন কোথায়?

তারাচাঁদ কোন জবাব দিল না।

গুপ্তেশ্বর আবার জিজ্ঞাসা করল, ও মারা গেছে কি বেঁচে আছে,

তুই কোন খবর জানিস ?

তারাচাঁদ আগের মত চুপ করে বসে থেকে জবাব দিল— আমি শুনেছি ও মারা গেছে।

—কার কাছ থেকে শুনেছিস ?

তারাচাঁদ চুপ করে রইল।

গুপ্তেশ্বর আবার চিৎকার করে উঠল— না, তুই মিথ্যেবাদী। তুই শয়তান। ও মারা গেছে কি বেঁচে আছে তুই কিছুই জানিস নে। তোর এই খবর নেওয়ার কখনও দরকারই হয় নি। তুই শুধু এইটুকুই জানতিস যে তুই ওকে মৃত্যুর মুখে ছেড়ে দিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলি ? এরপর ওর কী দুর্দশা হল না হল তা তুই কিছুই জানিস নে।

তারাচাঁদের এ সময় আপাদমস্তক কাঁপছিল। তার মুখ থেকে কোন কথা বার হল না।

রাগের চোটে গুপ্তেশ্বরের পক্ষে আর বসে থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। হাতের মুঠি দুটো বন্ধ করে সে বাঘের মত তারাচাঁদের দিকে এগোল। এক হাতে তার গলাটা চেপে ধরে অন্যহাতে তার কোট ধরে জোরে ঝাঁকিয়ে বলল, বজ্জাত! মক্কার! কথা বলছিস না কেন ? তুই ভাবছিস এরকম ঘৃণ্য কাজ করার পরও তোকে জ্যান্ত ছেড়ে দেব ? মনে রাখবি দুনিয়ার কোন শক্তি এখন তোকে আমার হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না। (দাঁত পিষে) আমি এইটা (জামার ভেতর থেকে একটি শাণিত ছুরি বার করে) তোর বুকে বসিয়ে অঞ্জলি ভরে তোর রক্ত খাব। তবেই আমার হৃদয়ের আগুন নিববে। আমার মন ঠাণ্ডা হবে। কিন্তু এটা শ্যামদাসবাবুর বাড়ি। এখানে তোর মত এক চণ্ডালকে ডেকে এনে বড় অন্যায় করেছি। এই পবিত্র জায়গায় তোর মত পাপী লোকের রক্তপাত করলে আমারই পাপ হবে। কিন্তু এখন আর আমি সে-সবের পরোয়া করি না। আমার ভরসা এই যে, যখন শ্যামদাসবাবু তোর কীর্তিকলাপের কথা জানতে পারবেন তখন আমাকে কৃতকর্মের জন্য শুধু ক্ষমাই করবেন না আমাকে প্রশংসাও করবেন। কারণ আমি এক নরঘাতক দৈত্যকে

খুন করে পৃথিবীর বোঝা হালকা করে ফেলেছি।

—বল্, তাড়াতাড়ি বল্। আর তুই যদি কিছু বলতে না চাস তা হলে আমিও কিছু জিজ্ঞাসা করব না। আমার শুধু এইটুকু জানলেই যথেষ্ট যে তুই আমার মায়ের খুনী—তার···

শয়তান! মরার আগে তোর যদি কিছু বলার থাকে তো তাড়াতাড়ি বল্। তোকে আমি পাঁচ মিনিট সময় দিলাম।

তারাচাঁদ আগের মতনই কাঁপতে লাগল। তার চোখ নীচের দিকে স্থির হয়ে ছিল। গুপ্তেশ্বর বার বার বলা সত্ত্বেও সে তার কথার কোন জবাব দিল না। গুপ্তেশ্বর সে সময় বজ্রকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল:

শয়তান! শোন্, ভাল করে শুনে নে। যে লোক এক নিরাশ্রয় অবলার সঙ্গে বেইমানী করে, তাকে নিজের জালে জড়িয়ে তার ইজ্জৎ ধুলোয় লুটিয়ে দেয়—যে প্রসূতি অবস্থায় তাকে আর তার নিরপরাধ শিশুকে সারা দুনিয়ার দুর্ভাগ্যের শিকার করার জন্য ফেলে রেখে পালিয়ে যায়, যার জন্য একটি নিরপরাধ নারী মানসম্ভ্রম বিসর্জন দিয়ে বেশ্যা হয়ে যায়, সেইরকম দুরাচারীকে মানুষ বলার কারও অধিকার নেই। আর তোর মত পশুর বেঁচে থাকারও কোন অধিকার নেই।

তারাচাঁদ পাথরের মূর্তির মত বসে ছিল। গুরদেই আবার জিজ্ঞাসা করল, কী, এই চণ্ডালকে বাঁচিয়ে রেখে এই দুনিয়ার ভার বাড়িয়ে লাভ কি? বল্, ঠিক কিনা? তাড়াতাড়ি বল্। তোর মত পাপীর কি বেঁচে থাকা উচিত?

সে ঘাড় নেড়ে জবাব দিল—না।

—তা হলে তুই মরতে রাজি আছিস?

সে ঘাড় নেড়ে জবাব দিল, হ্যাঁ।

—তা হলে নে, তৈরি হ। এই বলে সে এমন অনায়াসে ছোরাটা তুলল যে তারাচাঁদের জায়গায় আর কেউ হলে এই দৃশ্য দেখে সহ্য করতে পারত না।

অন্ধকারে পাছে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হতে পারে মনে করে গুপ্তেশ্বর আবার হাতটা নামিয়ে নিল। আর ঝটপট ইলেকট্রিকের আলোর সুইচটা

টিপে দিল। ঘর আলোয় আলো হয়ে উঠল। ওর উদ্দেশ্য ছিল যাতে তারাচাঁদ কিছুতেই বেঁচে না পালাতে পারে। এইজন্য সে ঘরের দরজার ছিটকিনি বন্ধ করে দিল।

আলোয় সে তারাচাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল, তারাচাঁদ কাঁপছে। হাত দিয়ে শার্ট আর কোটের বোতাম খুলে সে নিজের বুক খুলে দাঁড়িয়ে আছে।

তারাচাঁদের এই নির্ভীকতায় গুপ্তেশ্বর বেশ অবাক হয়ে গেল। যেন সে আগে থেকেই মরার জন্য তৈরি হয়ে এসেছিল। সে আবার ভাবল, বোধ হয় শয়তানটা আমার মন ভিজিয়ে জান বাঁচাবার চেষ্টা করছে।

সে আর দেরি করা উচিত বলে মনে করল না। ছুরিটা সে এমনভাবে তুলে ওর দিকে এগুলো যেন একবারেই সে কাজ হাসিল করে ফেলবে। কিন্তু ওর হাত বুক পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল না। তার দৃষ্টি তার আগেই তারাচাঁদের মুখের ওপর গিয়ে পড়ল।

তার হাত আগে এগুবার বদলে পিছনে হটে গেল। কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দেবার সময় তারাচাঁদের পাগড়িটা পড়ে গিয়েছিল আর কালো চশমার ডাটিটাও পাগড়ির সঙ্গে আটকে গিয়ে এক কান থেকে খসে পড়েছিল। গুপ্তেশ্বর তার দেহে হাত লাগিয়ে দেখল সে ঘেমে নেয়ে উঠেছে আর তার শরীর বরফের মত ঠাণ্ডা।

গুপ্তেশ্বর চিৎকার করে পিছনে হটে গেল। তার চোখের সামনেটা অন্ধকার ছেয়ে গেল। পরমুহূর্তেই ও এগিয়ে গিয়ে তারাচাঁদের চশমা নামিয়ে ভাল করে তার মুখটা দেখল। তার মুখ থেকে চিৎকারের মত সুর বেরুল—একি শ্যামদাসজী? গুপ্তেশ্বরের চোখের সামনে সারা ঘরটা ঘুরছিল। তার কাছে সমস্ত কিছু একটা ম্যাজিক খেলার মত মনে হচ্ছিল। কী জানি কতক্ষণ সে এভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার ওর ছোরাসুদ্ধ হাতটা ওপরে উঠল। কিন্তু কী মনে করে হাতটা আবার সে নামিয়ে ফেলল। ওর হাত থেকে ছোরাটা নীচে পড়ে গেল।

এবার গুপ্তেশ্বর তারাচাঁদকে জড়িয়ে ধরল— বাবা ও মেয়ের এ এক অদ্ভুত আশ্চর্য মিলন দৃশ্য।

শ্যামদাসবাবুও মেয়েকে জড়িয়ে ধরল। তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। সে বলল— ওরে শয়তান-বাপের হতভাগিনী মেয়ে, সুন্দরী তুই এখনও তোর কসাই বাবাকে বাঁচিয়ে রেখেছিস?

ঠিক এই সময় শ্যামদাসের নজর গিয়ে পড়ল মেঝের ওপর। সে ছুটে গিয়ে মেঝে থেকে ছোরাটা কুড়িয়ে নিল।

শ্যামদাস ছোরার ফলাটা নিজের বুকে ঠেকাল। ছোরাটা তার বুক চিরে একেবারে হাড়ের ভেতর ঢুকে যেত কিন্তু সুন্দরী প্রাণপণ শক্তিতে তার দুটো হাত দিয়ে শ্যামদাসের হাত চেপে ধরল। তার আগেই ছোরার ফলাটা শ্যামদাসের বুক ছুঁত। তার হাত থর থর করে কাঁপছিল যেমন ঝড়ের মুখে প্রদীপ শিখা কাঁপে সেই সঙ্গে সঙ্গে সে বলে উঠল, বাবা! ক্ষান্ত হোন। এ কাজ আর করবেন না। যা হবার তা হয়ে গেছে। তার গলার স্বর আজ দরদ ভরা।

শ্যামদাস তাকে বলল, মা, আমাকে শাস্তি দে। সুন্দরী, তোর এই দুষ্ট বাপকে তুই শাস্তি দে। কিন্তু বাঁচিয়ে রেখে নয়— মেরে ফেলে। আমার বেঁচে থাকা বিশেষ করে তোর চোখের সামনে বেঁচে থাকার চেয়ে আমার মরে যাওয়া অনেক ভাল। সেই জন্যই আমি আমার বেশ বদল করে তোর কাছে এসেছিলাম— যাতে করে তোর কাজে বিঘ্ন না ঘটে। সুন্দরী, তাড়াতাড়ি কর মা। এই অবস্থায় আমাকে বেঁচে থাকতে দিয়ে আমার পাপের বোঝা আর বাড়তে দিস না। তোর নিজের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর। ওই হতভাগিনী মায়ের আদেশ পালন কর। নয়তো তার আত্মা চিরকাল অসুখী থেকে যাবে—সেই পাপের বোঝা তখন তোকেই মাথায় করে নিতে হবে।

সুন্দরী (গুপ্তেশ্বর নয় সুন্দরী) তাকে গভীর সহানুভূতির সঙ্গে ওঠাল। তাকে চারপাইয়ের ওপর বসিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে সুন্দরী আবার বলল, বাবা, আমার প্রতিজ্ঞা পালন হয়ে গেছে বাবা! মা আমাকে যাকে মারার আদেশ দিয়েছিলেন সে আমার আঘাত হানার আগেই মরে গেছে। তার পাপ মন আর নোংরা প্রবৃত্তি সব এক এক করে নষ্ট হয়ে গেছে। তার জীবনের এখন রূপান্তর ঘটেছে। যে নরজীবন সে পেয়েছে তা মহাপুরুষের জীবন।

শ্যামদাসবাবু দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদছিল। সুন্দরী তার পাশে বসে গেল আর সস্নেহে তার মাথায় হাত বুলতে বুলতে বলল, বাবা! আপনি বেঁচে থাকুন। আপনাকে আমার যে এখন বড় দরকার।

বাবুর মুখ দিয়ে কোন কথা বার হল না। সুন্দরী আবার বলল, বাবা! উঠুন। আমাকে আদর করুন। আমি আপনার সুন্দরী ওঃ আমার বাপু, আমাকে সারাজীবন ধরে ভালবাসুন।

এরপরে অনেকক্ষণ ধরে দু-জনে দু-জনের দিকে তাকিয়ে রইল! যেন ওর সারা অঙ্গ আজ চোখের কাজ করছে। সুন্দরী বলল, বাউজী, আপনি আমাকে আগে থেকে চিনতে পেরেছিলেন? শ্যামদাস ততক্ষণ নিজেকে সামলে নিয়েছে। সে বলল, পুরোপুরি চিনতে পারি নি মা। তবে একটু সন্দেহ অবশ্য হয়েছিল। যখন তুই আমাকে রুমাল আনতে বললি, তখন আমার সন্দেহ একেবারে পাকা হয়ে গেল। এরপর যখন তুই আমার নাম ঠিকানা জানতে চাইলি, তখন আমি নিশ্চিন্ত হলাম যে গুপ্তেশ্বরই সুন্দরী, যখন আমি রুমাল দেখলাম তখন সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

সুন্দরীর মনে পড়ে গেল বচন সিং-এর ফাঁসি হয়ে গেলে সে বচন সিং-এর দেওয়া রুমালটির এক কোণে ছুঁচ সুতো দিয়ে একটি লাইন লিখেছিল, 'হতভাগিনী সুন্দরীর হারানো মুকুটের শেষ চিহ্ন।'

শ্যামদাসবাবু আবার বলতে শুরু করল—মা, আমি তোকে যখন স্টেশনে বিনে টিকিটে আসার অভিযোগে গ্রেফতার করি তখনই তোকে আমার চেনা চেনা মনে হচ্ছিল তোর চোখের দিকে তাকাতেই তোর মায়ের (গুরদেই) ছবি আমার সামনে ভেসে উঠেছিল। তার চোখ ঠিক তোর চোখের মত ছিল। অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয় কাল আঠোরো-উনিশ বছর পর আমি তোর মাকে তোর চোখের ভিতরে দেখি। কিন্তু অনেক সময় দু-জনের চেহারার মধ্যে এমনি মিল পাওয়া যায়। তাই আমি ও কথা নিয়ে আর বেশি ভাবি নি।

কিন্তু মা। তোর সারা জীবনকাহিনীতে তুই এই রুমালের কথা কোথাও উল্লেখ করিস নি।

সুন্দরী চোখ মুছে বলল, বাবা ! আমার বইতে আপনি শোনে নি যে যখন আমি রোড়ুর কুটিরে থাকতাম তখন একদিন ও এসেছিল। সেদিন থেকে আমার বাঁদরী জীবনের অবসান ঘটল। যখন আমি কাঁদতে লাগলাম তখন ও পকেট থেকে রুমাল বার করে আমার চোখ মুছিয়ে দিল। ওই রুমাল তখন থেকেই আমার কাছে ছিল। ব্যস এটাই তো ওর··· বলতে বলতে সুন্দরীর চোখে জল এসে গেল আর তার গলার আওজাটাও ভারী হয়ে এল।

বাবু ঠাণ্ডা নিশ্বাস নিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু মা ! তুই তো এই বইতে লিখেছিলি যে সুন্দরী নদীতে ডুবে গেছে।

—হ্যাঁ, ঠিকই আমি ডুবে গিয়েছিলাম। কিন্তু মরি নি। আমি শুধু স্রোতের টানে ভেসে গিয়েছিলাম। আমাকে দেখতে পেয়ে এক বুড়ো মাঝি নদী থেকে আমাকে তুলে প্রাণ বাঁচায়। লোকটি খুবই সজ্জন। ওর কথা এখনও আমার মনে হয়।

মা, তুই তা হলে আবার অমৃতসর এসেছিলি ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তুই নিজের বেশভূষা বদলালি কেন ?

এর অনেক কারণ। একে তো পুলিশের ভয় ছিল— কারণ আমি তিন তিনটে খুন করেছি। দ্বিতীয়ত ওর আদেশ ছিল যে ওর মাকে যেন দেখি। এইজন্য কিছু অর্থ উপার্জনেরও প্রয়োজন ছিল। তৃতীয়ত আমি চেয়েছিলাম, অন্যান্য বই ছাড়া, আত্মজীবনীর মধ্য দিয়ে সমাজের 'সাদা রক্তর কথা লিখে যাই।' এর ফলে পৃথিবীর উপকার হবে। আর চতুর্থ কাজ হল আপনাকে—বলতে বলতে সে কিছু থেমে গেল। ওর দৃষ্টি অবনত হয়ে পড়ল। শ্যামদাসবাবু তার মাথায় হাত বুলতে বুলতে বলল : তা মা, এবার তো তোর সব কাজ শেষ হয়েছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সুন্দরী বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার সব কাজ শেষ হয়ে গেছে। আমার সমস্ত দায়-দায়িত্ব থেকে আমি আজ মুক্ত।

এইবার তুই সব সময় আমার কাছে থাকবি তো ?

—হাঁ, বাবা। যতদিন বাঁচব ততদিন আপনার কাছেই থাকব।

শ্যামদাসবাবু আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলল, আমি যাই, আমার মেয়ের জন্য এখুনি শাড়ি কিনে নিয়ে আসি। তুই তোর এই পোশাকটা ছেড়ে ফেল্ মা।

—হ্যাঁ বাবা! আমি কালই আমার বেশভূষা বদলে নেব। আমার আসলরূপেই আপনি আমাকে দেখবেন।

—তোর ওই রূপ দেখে মনে যে কত শান্তি পাব মা।

—বাবা। আপনার তো খুশি হবারই কথা। আপনার মনে যদি আনন্দ নাও হয় তা হলেও আপনার খুশি হওয়া উচিত। কেননা, একে তো আমি সফল হয়েছি আর দ্বিতীয়ত আমাকে আপনি চিনতে পেরেছেন।

—বা রে বোকা মেয়ে! আমার মনে আনন্দ হবে না তো কী হবে?

—গুরু আপনার মনে যেন চিরদিন শান্তি দিন।

—হ্যাঁরে খুকী! এই পর্বের শেষ অংশটা?

—কাল সকালেই আপনি দেখতে পাবেন?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সুন্দরী বলল, বাবা, আপনি কিন্তু আপনার কথা কিছু বললেন না।

মা, আমার ব্যক্তিগত জীবন এত পাপ আর দুরাচারে ভরা যে সে-সব কথা আমি তোর সামনে বলতে পারব না। এটাই সৌভাগ্য যে তোকে সব কথা এখনও খুলে বলি নি, তোকে শুধু এটুকুই বলেছি যে যখন তোর মাকে মৃত্যুর মুখে ছেড়ে চলে আসি তখন কিছুদিন এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরির পর রেলওয়েতে একটা চাকরি পাই। ওটা একটা নেহাৎই যোগাযোগের ব্যাপার। সে-সময় রেল-কর্মচারীদের হরতাল চলছিল। ডাক গাড়ি ছাড়া সব গাড়ি বন্ধ। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ নিজেদের কাজ চালু রাখার জন্য লোক নিয়োগ করতে লাগল। আমিও সেই সময় চাকরি পেয়ে গেলাম। আমি আমার নাম বদলে ফেললাম। কেননা, আমার পিছনের প্রতারণা আর কুকর্মের জন্য আমার তখন যে-কোনও মুহূর্তে কোর্টঘর করার আশঙ্কা ছিল।

এরপর শ্যামদাসবাবু বাজারে গিয়ে সুন্দরীর জন্য কাপড় কিনে নিয়ে এলেন। দু-জনে অনেক রাত পর্যন্ত শুয়ে শুয়ে গল্প করতে লাগল।

সকালে যখন শ্যামদাস সুন্দরীর ঘরে গেল তখন সে দেখতে পেল সুন্দরী মেয়েদের মতই শাড়ি পরে উপুড় হয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। সে সুন্দরীকে ডাকল। একটু ঝাঁকুনি দিল। কিন্তু সুন্দরী কিছু জবাব দিল না, এমন-কি, নড়লও না। সে তার মুখ থেকে কাপড়টা সরিয়ে যা দেখল তাতে সে সঙ্গে সঙ্গে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। সুন্দরী চিরনিদ্রায় শায়িত। তার মুখ দিয়ে এক স্বর্গীয় কিরণ ফুটে বেরুচ্ছে —আর তার ঠোঁটে সাফল্যের হাসি। তার বুকের ওপর পড়ে কালকের সেই রুমালটি। যেমন করে একজন প্রেমিকা তার প্রেমিকের হাত ধরে থাকে ঠিক তেমনি করে সে রুমালটি হাত দিয়ে ধরে ছিল। রুমালের রঙ টকটকে লাল হয়ে গিয়েছিল। এইজন্য শ্যামদাসবাবু চট করে বুঝতে পারেন নি অন্য কোন জিনিস সেই লাল রঙকে আরও লাল করে দিয়েছে কিনা। রুমালের নীচে কালকের সেই ছোরাটির বাঁট দেখা যাচ্ছিল। তার ফলাটা সুন্দরীর বুকের মধ্যে। শ্যামদাসবাবুর বুকের ভেতর কে যেন একটা বর্শি বিঁধিয়ে দিয়েছিল। সে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। এই সময় তার নজর পড়ল টিপয়ের ওপর। সেখানে কিছু কাগজ পড়ে। সুন্দরীর শেষ চিঠি। চিঠিটা এই রকম :

মাননীয় বাবা,

আমি জানি আপনি ভীষণ ধৈর্যশীল তা ছাড়া আপনার আত্মিক জ্ঞানও লাভ করেছেন। আমি আপনার কাছ থেকে খুব তাড়াতাড়ি বিদায় নিচ্ছি। আমি জানি আপনি খুব দুঃখ পাবেন। কিন্তু বাবা, যদি আপনি আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারেন তা হলে হয়তো মনে মনে শান্তি পাবেন।

আপনি জানেন, আমি আমার প্রিয় মানুষকে ছেড়ে কীভাবে দিন কাটিয়েছি। শুধু তাঁর হুকুম পালনের জন্য, তাঁর আদেশের এমন একটি শক্তি ছিল যে আমি তাঁর কাছ থেকে আলাদা হয়েও বেঁচে

ছিলাম। তা না হলে তার বিরহে আমার এক মুহূর্ত বেঁচে থাকা সম্ভবপর ছিল না।

কিন্তু বাবা, এত কিছু হওয়ার পরও আমি কখনও কখনও একটা কথা ভীষণভাবে চিন্তা করি। আমি একটা মস্ত বড় পাপ করেছি— শুধু পাপই নয়, আমি আমার প্রভুর আদেশ পর্যন্ত অমান্য করেছি। গুরুজী এজন্য আমাকে সাজা দেবেন। কিন্তু আমার সবচেয়ে বড় ভয় আমার ইষ্টগুরু আমাকে ক্ষমা করবেন কিনা। আর সে পাপ হল পালা সিং আর তার বন্ধুদের জীবন নেওয়া। কিন্তু সে সময় আমি একেবারে যেন অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। ক্রোধ আর প্রতিহিংসা আমার শুভবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। যদিও ও (আমার স্বামী) আমাকে বোঝানোর অনেক চেষ্টা করেছিল। আমি ওর কথা বুঝেও ছিলাম। কিন্তু জানি না কীভাবে কী হয়ে গেল। আমি ভাবতে লাগলাম ওদের খুন করাই আমার একমাত্র প্রতিশোধ নেওয়ার রাস্তা। কিন্তু বাবা আপনাকে দেখে আজ আমার চোখ খুলে গেছে। আমি যেরকম করে আপনার ভুলের প্রতিশোধ নিলাম, এটাই সবচেয়ে উপযুক্ত প্রতিশোধ নেওয়ার রাস্তা। অর্থাৎ আমার লেখা পড়ে আপনার জীবনধারা বদলে গেল— সেইজন্যই আমার উচিত ছিল, লেখনীর মাধ্যমে খুনীর ও সমাজের মনে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা। হৃদয়ের বদলে মস্তিষ্ক দিয়ে আর ছুরির বদলে কলম নিয়ে যদি এগিয়ে যেতাম তা হলে তাদের জীবন পালটে দিতে পারতাম। তা হলে এখনও কিছু ভ্রান্ত মানুষকে ঠিক পথে নিয়ে আসতে পারতাম। কিন্তু কেটে যাওয়া সময় আর ফিরে আসবে না। আমার আদরের বাবা! আপনি ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করুন, তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন।

ও আমাকে বলে গিয়েছিল যে ওর মা যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন আমি যেন তাঁকে ছেড়ে আর কোথাও না যাই। যখন আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আমি চিরদিনের মত নিশ্চিন্ত হলাম। আজ থেকে এ দায়িত্ব আপনার।

এ ছাড়াও আমার মা আমাকে যে কাজগুলোর দায়িত্ব দিয়েছিলেন

আমি সেই-সব দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেছি। তাঁর আত্মা আপনার রক্ত নিয়ে শান্ত হতে চাইছিল এখন আপনার চোখের জলেই শান্ত হবে বলে আমি আশা করছি।

চতুর্থ কাজটা আমার নিজের জন্যই। আমার এই কাজ হল আমি আমার নিজের জীবনের এই-সব ঘটনা নিয়ে একটি উপন্যাস লিখে এই কঠোর ও নির্দয় সমাজকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলাম। সে কাজও শেষ হয়েছে। এখন আমি জীবনের সমস্ত কিছু সংকল্প পূর্ণ করে আমার জীবন দিয়ে এই সমাজের বুকে শেষ আঘাত হেনে আমার প্রিয়তমের শ্রীচরণে আশ্রয় নেব।

আমার প্রিয় পিতা! আপনি নিজেই তো কাল রাতে বলেছিলেন, 'মা, আমি তোকে আসল রূপে দেখলে আনন্দ পাব।' আমার আশা আপনি নিজের কথা রাখার জন্য অবশ্যই চেষ্টা করবেন আর আমাকে আমার এই আসল রূপে দেখে খুবই দুঃখ পাবেন।

যখন আমি বেঁচে ছিলাম তখন বাবার ছত্রচ্ছায়ায় থাকার আনন্দ আমি ভোগ করতে পারি নি। কিন্তু বাবা! আমার বেঁচে থাকাটা সুতো ছাড়া চরখা কাটার মত। ভগ্ন হৃদয় আর ভাঙা পেরেক কত আর আঘাত সহ্য করতে পারে।

সবচেয়ে বড় কথা, আমি একজন খুনী। ফাঁসিকাঠে মরার চেয়ে ছুরি দিয়ে আত্মহত্যা অনেক ভাল।

আমি আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যতদিন বাঁচব আপনার পাশে থাকব। দেখছেন তো আমি আমার সে কথা রেখেছি।

এ ছাড়া আপনি কয়েকবার এই উপন্যাসের অসমাপ্ত শেষ পর্বটি শেষ করার জন্য তাগিদ দিয়েছেন। আপনি কি জানেন, আমার বই আর আমার জীবন এ দুটোই আমার কাছে একসূত্রে গাঁথা। এই-জন্যই আজ আমার উপন্যাসের শেষ পর্বের বাকি অংশও শেষ হল। সেইসঙ্গে আমার জীবন-উপন্যাসের শেষ পর্বেরও শেষ।

আমার পূজনীয় বাবা! আশীর্বাদ করুন, আমি স্বর্গে গিয়ে আমার প্রিয়তমের গলা জড়িয়ে এই বিরাট বিচ্ছেদের দুঃখ ভুলে যাব আর অনন্তকাল ধরে আমার সেই জীবনদেবতার চরণে সেবা করে যাব।

আমার আদরের বাবা! আপনার মেয়ের শেষ প্রণাম গ্রহণ করুন। জীবনে এই প্রথম ও শেষবার ক্ষণিকের মিলনের পর আবার চিরকালের মত আপনাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আমি আজ বিচ্ছেদের সেই পথের পথিক।

আপনার সুন্দরী